শুভায় ভবতু

অবধূত

॥ মিত্রালয় ॥
● ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ●

॥ পাঁচ টাকা ॥

প্রথম সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৪
দ্বিতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৪
তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৪
চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৫
পঞ্চম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৫
ষষ্ঠ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬৫

এই লেখকের

ভুবি বৌদি (যন্ত্রস্থ)
মরুতীর্থ হিংলাজ
বশীকরণ
উদ্ধারণপুরের ঘাট
বহুব্রীহি
কলিতীর্থ কালীঘাট
মিড় গমক মূর্চ্ছনা

মিত্রালয় ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেস ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট কলি-৬ হইতে শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ উৎসর্গ ॥

সুখময়ী দেবীর একমাত্র সন্তান

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান অমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

॥ অয়মারম্ভঃ ॥

সেই হ'ল আরম্ভ।

আরম্ভটা আরম্ভ হয়েছিল নাকি মহাসমারোহে। তিনদিনের পথ নৌকায়, সেখানে মানুষ পাঠিয়ে পায়ের ধুলো আনানো হয়েছিল সার্বভৌম ঠাকুরের। ইঁদুরে-তোলা মাটি পাঠিয়ে সেই মাটি পায়ে ছুঁইয়ে আনা হয়েছিল। শুধু সার্বভৌমের নয়, আরও একাদশ জন বাছা বাছা ব্রাহ্মণের পদধূলি যোগাড় করা হয়েছিল। সেই ধূলি ঠেকানো হয়েছিল নবজাতকের কপালে। বড় আশায় এই সমস্ত করা হয়েছিল। দ্বাদশটি বাঘা ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কিছুতেই বিফল হবে না, এ সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তাঁদের মনে, যাঁরা এত কাণ্ড করেছিলেন ষেটেরা পুজোর দিন।

এসব কথা আমার জানার কথা নয়। ছ'দিন বয়সে কি হয়েছিল না হয়েছিল তা আর কে মনে রাখতে পারে? ছ'দিন বয়সে মন জন্মেছিল কিনা তা-ই এখন মনে নেই। কিন্তু দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ যে আমি গোল্লায় পাঠিয়েছি, এ কথাটি আমাকে দ্বাদশ লক্ষবার শুনতে হয়েছে গুরুজনদের মুখে। শুনে শুনে ওটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। এক রকম বিশ্বাসই হয়ে গেছে যে, আমার যা হওয়া উচিত ছিল তা যে হতে পারি নি, এজন্যে একমাত্র আমিই দায়ী।

দায় এড়াবার দায়ে পড়ে এ কাহিনী শোনাতে বসি নি আমি। কিংবা জবাবদিহি করতেও চাচ্ছি না কোনও কিছুর জন্যে। এমন কথাও বলছি না যে ষেটেরা পুজোর দিন থেকে অবিরাম যে আশীর্বাদধারা ঝরে পড়েছে আমার মাথায় সে আশীর্বাদগুলো নেহাতই জলো ছিল। বরং বলব শুভই হয়েছে। যা হয়েছে, তা আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গুরুজনদের মনের মত না হতে পারে, কিন্তু এ রকম ছাড়া অন্য রকম আমি হতামই বা কেমন করে? হওয়ার উপায় ছিল কোথায়? ইচ্ছে হয়েছে এক রকম,

সঙ্কল্প করেছি আর এক রকম, আর সে সঙ্কল্পটা কার ইচ্ছেয় বলতে পারি না, কাজে পরিণত হয়েছে আর এক রকম। কেন যে এ রকমটা হল, কি করে যে কি হয়ে গেল, তাই আজ ভাবছি বসে বসে।

জানি, আমার এই অনর্থক ভাবনা শুনে কারও লাভ-ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই বিন্দুমাত্রও। শুনতে শুনতে ব্যাজার ধরে যাবে হয়ত অনেকের। তাছাড়া আমি যে নিজেই ঠিক করতে পারছি না, কোথা থেকে আরম্ভ করব শোনাতে। ষেটেরা পূজোর দিন থেকে শোনাতে পারলে হয়ত শোনানোর মত শোনানো হত। কিন্তু সে ত সম্ভব নয় কিছুতেই। প্রথমতঃ, প্রথমের অনেকগুলো বছর অনর্থক অপচয়, তখন যে কি করেছি বা কি করি নি তা আজ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। দ্বিতীয়তঃ, লজ্জাও করছে কেমন একটু একটু। যখন উলঙ্গ থাকতাম অথবা উদম অবস্থার স্মৃতি, এ রকমের নাম দিয়ে একটা কাহিনী খাড়া করতে পারা যায় হয়ত, সে কাহিনীর মালমশলাও হয়ত জোটানো যায় অতি-বৃদ্ধা পিসী-মাসী যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকেন, তাঁদের খুঁজে বার করে। কিন্তু তাতে ফলটা হবে কি? উদম অবস্থায়, চোখ দিয়ে ভয়ানক পিঁচুটি পড়ত, ভয়ানক খোস-পাঁচড়া হত সর্বাঙ্গে, বা খাবার জিনিষ দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতাম, এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনার অতি গুহ্য তাৎপর্য শুনিয়ে খামকা কেন খেলো করতে যাব নিজেকে? তাই ত খুঁজে মরছি, আরম্ভটা আরম্ভ করব কোন্‌খান থেকে!

যাঁরা একান্ত আপন জন, অকপটে আমার মঙ্গল কামনা করেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে এক দল বলেন—রক্ষে কর এবার, আর তোমার নিজের কাহিনী শুনিও না বাপু। বড্ড একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া একটু লজ্জাও করে না তোমার! এভাবে নিজেকে সকলের সামনে খুলে মেলে ধরতে একটু ঘেন্নাও হয় না তোমার! আর এক দল, তাঁরা হয়ত আমার চেয়েও বেসরম, তাঁরা বাহবা দেন। বলেন—চালাও, আরও বলে যাও, কবে কোথায় কোন্ ফাঁকে কার সঙ্গে কি করেছিলে। কিছু ছেড়ো না, এক অক্ষরও বাদ দিও না, কি অধিকার আছে তোমার ফাঁকি দেবার?

দু-পক্ষের কথাই মাথা হেঁট করে শুনি। শুনি আর ভাবি, ভাবি

কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করা যায়, কতটুকু রাখা যায়, কতটুকুই বা বাদ দেওয়া যায়! যাঁরা বলেন, নিজের কাহিনী আর শুনিও না বাপু, তাঁদের জন্যে একটা জবাব মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি। কিন্তু বলতে সাহস হয় না। বললে বলতে পারতাম, কই এ পর্যন্ত নিজের কাহিনী ত' একটুও শোনাই নি কোথাও। অপরের কথাই ত' বলতে চেয়েছি, বলতে চেষ্টা করেছি তাদের কাহিনী যাদের আমি স্বচক্ষে দেখেছি; দেখার মত দেখার সুযোগ মিলেছে যাদের এ জীবনে। শুধু চোখের দেখা নয়, মনের দেখা দেখেছি যাদের। আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়; যাদের মন দেখতে পেয়েছি, তাদের কথাই ত' শোনাতে চেয়েছি এ পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে নিজেকে বাদ দিয়ে কারও কথাই যে শোনাতে পারি না। যাকে দেখেছি, তাকে কি অবস্থায় দেখেছি, কোন্‌খানে দেখেছি, এমন কি কি পেঁচালো পর্ব ঘটেছিল যার দরুণ তাদের মনের ছোঁয়াও পেয়েছি আমি, এ সমস্ত বলতে গেলে যে নিজের কথাও এসে পড়ে। চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, তা হয়ত রঙ-তুলি দিয়ে হুবহু আঁকা যায়। কিন্তু চোখ দিয়ে যা দেখা যায় না তা যে দেখতে হয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। সে ছবি রঙ-তুলিতে ফোটানো যায় কিনা, জানি না। কিন্তু কালি-কলমের সাহায্যে সে ছবি আঁকতে গেলে ঘটনাগুলোকেও যে অবিকৃত অবস্থায় ছুঁকে যেতে হয়—সে সময় আমি নামক হতভাগ্যটিকে বাদ দিই কেমন করে?

বাদ যদি দিতেই হয় নিজেকে, তাহলে যে সবটুকুই যায় বাদ পড়ে। সব কিছুই প্রাণ খুলে বলা যেমন সম্ভবও নয়, নিরাপদও নয়, তেমনি আমার-দেখা মানুষদের আমি দেখলাম কেমন করে, সেইটুকু না শোনাবার কায়দা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। এ রকম অবস্থায় এক করা যায়—রামবাবুর, শ্যামবাবুর মুখ থেকে যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনটি করে শোনানো। অর্থাৎ রামবাবু-শ্যামবাবুকে আমদানী করতে হয়। এটাও যে আগাপাস্তলা ফাঁকিবাজী। মুশকিল আর কাকে বলে! কোন্ পক্ষকে যে সন্তুষ্ট করি, কোন্‌খান থেকে যে আরম্ভ করি, কি দিয়েই বা করি আরম্ভ, এ এক মহাসমস্যা বটে!

অনেক দিন আগে এই রকমের এক ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলাম। এক দূর- সম্পর্কের দাদা চাকরি করতেন লাহোরে। মাইনেও পেতেন যেমন উপরিও ছিল তেমনি। মানে, দাদা বেশ শাঁসালো-গোছের ছিলেন। হঠাৎ তাঁর সখ চাপলো একটি বিয়ে করবার। বাঙলা দেশে পাত্রী দেখা আরম্ভ হয়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন সকলে চেষ্টা করতে লাগলেন সব-দিক-থেকে চমৎকার একটি পাত্রী জোটাবার। দাদা জানতেন যে আমি কলকাতায় থাকি। আমার কাছে চিঠি লিখলেন, অমুক ঠিকানায় গিয়ে অমুকের মেয়েটিকে দেখে পত্রপাঠ সকল সমাচার জানাও। চিঠির সঙ্গে পাত্রী দেখার খরচও এল। পরিমাণ আমার তখনকার তিন মাসের খাওয়া-পরার মোট খরচের চেয়ে ঢের বেশী।

এমন দাদার অনুরোধ ঠেলা যায় না। একদিন ছোট রেলে চেপে পাত্রী দেখতে রওয়ানা হলাম।

সকালেই গেলাম সেখানে। তাঁরা আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করলেন। পাত্রী দেখানো হবে বারবেলা বাদ দিয়ে সেই বিকেলে। দুপুরে বিশ্রাম করার জন্যে একখানা ঘরে বিছানা দেওয়া হল। আহারটা চাপগোছের হওয়ার দরুণ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ উঠে বসতে হল ধড়মড়িয়ে। দিনের আলোতে ঘুম হবে না বলে দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল। দিনের বেলা তাতেও যথেষ্ট আলো ছিল ঘরে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ডুরে-সাড়ীপরা একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার বিছানার পাশে।

হাঁ করে ছিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্যে। জিজ্ঞাসা আমায় করতে হল না। মেয়েটি ফিসফিস করে বললে—"পালান এখনই আপনি!"

সবিস্ময়ে বললাম, "তার মানে!"

খুব তাড়াতাড়ি খুব চাপা গলায় সে বললে—"আপনার দাদার জন্যে এ মেয়ে দেখবেন না।"

আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

সংক্ষিপ্ত জবাব হল—"এ মেয়ের পেটে বাচ্চা আছে।"

বলেই পাশের দরজা একটুখানি ফাঁক করে সরে পড়ল সে।

কি ফ্যাসাদেই যে পড়ে গেলাম, কি বলব। পালাব, না, থাকব, ভাবতে লাগলাম। পালিয়েই বা কি ভাল হবে আমার? তার চেয়ে যেমন মেয়ে দেখতে এসেছি, তেমনি মেয়ে দেখে চলে যাই। তারপর দাদাকে সব লিখে পাঠাব। ব্যস্—

যথানিয়মে মেয়ে দেখলাম। এবং মেয়ের বাঁ-গালের নীচের দিকে একটি তিল দেখলাম। তিলটি দেখেই মাথাটা কেমন ঘুরে গেল আমার। কিছুই বললাম না। জিজ্ঞাসাও করলাম না মেয়েটিকে কিছু। এমনিতেই কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারতাম না আমি। মেয়ে দেখতে গিয়ে কি জিজ্ঞাসা করা উচিত, তা জানা ছিল না তখন, সে বয়সও হয় নি তখন আমার।

তিলটির কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম। যে মেয়েটি অন্ধকার ঘরে আমায় পালাবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছিল তার গালেও ঠিক ঐ তিলটি দেখেছিলাম। মুখখানি ভাল করে দেখতে পাই নি, দেখেছিলাম শুধু তিলটি। কারণ বাঁ-গালের ঠিক সেই জায়গাটুকুতে এসে পড়েছিল টাকার মত গোল একটু আলো। বোধহয় কোন জানালায় বা অন্য কোথাও একটা গর্ত ছিল। সেই গর্ত দিয়ে এসেছিল ঐ আলোটুকু।

অনেক কথা ভাবতে হল আমায়। যে পালাতে বললে সে মেয়েটি কে? কি গরজ আছে তার যে আমাকে পালাতে বলতে এল। হিংসে হতে পারে, ভাংচি দেওয়া হতে পারে, জ্ঞাতিগুষ্টির শত্রুতাও হতে পারে। কত কি-ই না হতে পারে। সত্যিই একটা ভদ্রলোকের ছেলে একটা গর্ভবতী মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে, এটা সহ্য করতে না পেরেই হয়ত ঐ কুমারী মেয়েটি সাবধান করতে এসেছিল আমাকে। কিন্তু ঐ তিলটা! কি করে নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি। স্পষ্ট দেখেছিলাম শুধু তিলটাই, সেই টাকার মত গোল তীব্র আলোয়। কিছুতেই সেটা ভুল হতে পারে না! আবার সেই তিলটাই দেখলাম পাত্রীর গালের ঠিক সেই জায়গাটাতেই। ব্যাপার কি! ও বাড়ীর, বা ওই গ্রামের সব ক'টি আইবুড়ো মেয়ের বাঁ গালের নিচের দিকে ঐ রকম একটি করে তিল আছে নাকি?

ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম যে দাদাকে গর্ভ-টর্ভর কথা লিখে কি হবে? লিখে দিলাম—পাত্রী দেখেছি। একটুও পছন্দ হয় নি আমার। ভাবতেই

পারি না যে আমার সর্বগুণসম্পন্ন দাদার বৌ অতটা যা-তা হবে। চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কত মেয়েই ত' রয়েছে দেশে, করুন না দাদা আর একটাকে বিয়ে। কি দরকার ও রকম একটা বিশ্রী ব্যাপারে মাথা দেবার আমাদের। আর এমনই বা কি আহামরি মেয়ে যে এত মাথা ঘামাতে হবে, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে সত্যিই গর্ভ হয়েছে কি না। চুলোয় যাক্ গে!

কিন্তু চুলোয় গেল না ব্যাপারটা। মাস দুই পরে নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। তারপর দাদা নিজেই চলে এলেন কলকাতায়। বাড়ী ভাড়া করে খুব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। এবং বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাঁ গালের নীচের দিকে সেই তিলটি।

যথাসময়ে দাদা বৌ নিয়ে লাহোরে চলে গেলেন। বছরখানেক খোঁজ রাখলাম বৌদির ছেলেপুলে হল কি না। হল না শুনে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে দাদা-বৌদির কথা ভুলেই গেলাম।

তার বছরখানেক পরে আবার দাদাকে দেখলাম কলকাতায়। দাড়ি গোঁফ রুক্ষ চুল নানান্ জঞ্জাল জমিয়ে তুলেছেন নিজের মুখে-মাথায়। আবার কপালে লাগিয়েছেন এক মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, গলায়-হাতে বেঁধেছেন রুদ্রাক্ষের মালা। চাকরি ছেড়ে সাধন ভজন করছেন। কারণ বৌদিটি আত্মহত্যা করেছেন হঠাৎ।

আমায় দেখে দাদা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন—"হাঁ রে, তোকে যে বড্ড বিশ্বাস করতাম রে হতভাগা! শেষ পর্যন্ত তুই এই করলি!"

কি করেছি তা বুঝতে পারলাম যখন আমার হাতে একখানি চিঠি দিলেন দাদা। চিঠিখানি পড়ে বুঝলাম, সত্যিই কত বড় অন্যায় করেছিলাম আমি, পাত্রী দেখতে গিয়ে যা ঘটেছিল তা দাদাকে না জানিয়ে।

বৌদি আত্মহত্যা করার আগে চিঠিখানি দাদাকে লিখে গেছেন। লিখেছেন যে, বিয়ের আগেই তিনি জানতে পারেন যে দাদা মদ খান। জেনেছিলেন বলেই যে ছোকরা পাত্রী দেখতে গিয়েছিল তাকে বলেন যে পাত্রী গর্ভবতী। তাতেও বিয়ে বন্ধ হল না। বৌদির মা-বাপ জামাইয়ের টাকা দেখলেন। কিন্তু মাতাল স্বামী কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না

তিনি। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া পরিত্রাণ পাবার অন্য কোনও উপায় খুঁজে পেলেন না।

দাদা বললেন—"কেন তুই সব কথা জানালি না রে হতভাগা! কেন আমায় এতবড় দাগাটা দিলি?"

দাদা অবশ্য দাগার ঘা শুকিয়ে যেতেই আর একটি বিবাহ করলেন। সে বৌদির বাবা মদ খেতেন তাই তাঁর আত্মহত্যা করার প্রয়োজন ছিল না। দাদা দাড়ি গোঁফ কামিয়ে চুল ছেঁটে লাহোরে ফিরে গেলেন নতুন বৌ নিয়ে।

আমি রইলাম ভয়ানক মনমরা হয়ে। আগের তিলওয়ালা বৌদিটির আত্মহত্যার দরুণ নিজেকে দায়ী মনে হতে লাগল। সব কথা খুলে লিখলে কি ক্ষতিটা হত আমার? তারপরও যদি দাদা বিয়ে করতেন আর বৌদি আত্মহত্যা করতেন তাহলে এই বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম, আত্মহত্যার কপাল নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। কিন্তু তা ত' নয়, মোক্ষম চেষ্টা করেছিলেন বৌদি নিজেকে বাঁচাবার। কুমারী মেয়ের পক্ষে সব থেকে নিদারুণ কলঙ্কটা নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন নিজেকে। আমিই বাদ সাধলাম। সব কথা খোলসা করে লিখলাম না দাদাকে।

আচ্ছা, এই যে কাহিনীটি শোনালাম. এ থেকে আমি নামক আমিটিকে বাদ দেব কি করে? দাদা যদি আমায় পাত্রী দেখবার কথা না লিখতেন তা হলেই ত' হাঙ্গামা চুকে যেত। আমাকে জড়িয়ে—এ কাহিনী আমায় শোনাতে হত না। কেন—কলকাতায় নসু ছিল, ছোট পিসী ছিলেন, হরিশ কাকা ছিলেন, এঁদের কাউকে ত' পাত্রী দেখবার কথা লিখতে পারতেন দাদা। খামকা আমাকেই বা লিখতে গেলেন কেন? আর যখন বারণ করে পাঠালাম ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে, তখন বিয়েই বা করতে গেলেন কেন? সবচেয়ে কি ভাল হত না, যদি দাদা আমার কথা শুনে ঐ গালে তিলওয়ালা মেয়েটিকে বিয়ে না করতেন? যদি শুনবেনই না আমার কথা তবে আমার ওপর পছন্দ-অপছন্দর ভারই বা দিলেন কেন?

যাকগে, যা হবার ছিল, হয়ে গেল। ও রকম একটা উড়ো আপদে জড়িয়ে পড়া কপালে লেখা ছিল বলেই ঘটল। কিন্তু এ থেকে একটা কথা

আমি নির্ঘাত বুঝতে পারলাম, জড়িয়ে পড়ার দায় থেকে যতই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি না কেন, পালিয়ে বাঁচবার পথ কোনও দিকে এতটুকু খোলা নেই। যেটেরা পুজোর দিন থেকে 'শুভ হোক, মঙ্গল হোক' বলে যত আশীর্বাদ যিনি করেছেন, সব নিষ্ফল হয়ে গেল শুধু আমার দোষেই নয়। আমার কপালের সঙ্গে আর পাঁচজনের পাঁচখানা কপাল এক সুতোয় গাঁথা ছিল এবং আজও তাই আছে বলেই একা আমার শুভ হতে পারছে না। কল্যাণ কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছুঁই ছুঁই করেও ছুঁতে পারছে না। সেই কাহিনী শোনাতে গেলেই শুনতে হয়, "আর তোমার নিজের কেচ্ছা অত করে শুনিও না বাপু!" না হয় না-ই বা শোনালাম, কিন্তু পরের কথা শোনানোও তাহলে খতম করতে হয় যে। অনিবার্য আমি যে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছি আমার দেখা-শোনার সঙ্গে। সেই আমি-র হাত এড়াই কেমন করে!

আর এক বিপদ হচ্ছে, আমার আগাগোড়া সব দেখা শোনাই শোনাবার উপযুক্ত কি না, সে বিচার করা চাই। বিচার করতে গেলে দেখা যায়, সত্যিই কিছু নেই শোনাবার। জন্মেছি, বড় হয়েছি, পাঁচজনের আশীর্বাদে কোনও রকমে চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে শোনাবার কি আছে? কিছুই নেই, সত্যি কিছু নেই। আমি জন্মাবার আগেও এ জগৎ ছিল, আমি মরে যাবার পরেও থাকবে। এর দুঃখ-শোক, কান্না-হাসি, দেবত্ব-পিশাচত্ব সবই থাকবে, আগে যেমন ছিল। রোদ-বৃষ্টি, দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম, চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ এ সমস্তও ঠিক টিঁকে থাকবে যেমন টিঁকে আছে। থাকব না শুধু আমি, আর থাকবে না আমার মত কয়েকটি মানব-মানবী। তাই আমার শোনানোর গরজ এত তাদের কথা। আমার-দেখা মানব-মানবীরা যদি টিঁকে থাকত চিরকাল, তবে দায় পড়েছিল আমার তাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে। কিন্তু তারাও যে আমার মত টিঁকবে না এখানে। তাদের অনেকে ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে, অনেকে যাব-যাব করছে, বাকী সকলে যদিও টিঁকে আছে কোনমতে কিন্তু আছে একেবারে যাওয়ার পরের অবস্থায় অর্থাৎ মরে বেঁচে আছে। অথচ আমি জানি, আমি সাক্ষী আছি, তারা কেউ তাদের এই পরিণতির জন্যে দায়ী নয়।

শুভ তাদেরও হতে পারত, বেঁচে থাকার মত তারাও বেঁচে থাকতে পারত, যদি না খামকা কতকগুলো উটকো ফ্যাসাদ এসে জুটত সকলের কপালে।

উদম অবস্থার কাহিনী বা উৎপীড়িত হতাম যখন বা স্বপ্ন দেখার বছরগুলো এই তিন যুগ পেরিয়ে এসে আমি আরম্ভ করব। যখন থেকে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা সুরু হল তখন থেকেই না চলছে গোলমাল, জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব কিছুতে। তার আগের কথা থাক। ওটা আমারও যেমন, মাধু তেলীরও তেমনি। এমন কি, যে বলদটা চোখে ঠুলি পরে মাধুর ঘানিতে ঘুরছে, সেটাও যখন বাচ্ছা ছিল তখন মাঝে মাঝে মার-ধোর খেতো বটে, কিন্তু এভাবে অষ্টপ্রহর চোখে ঠুলি এঁটে মাধুর মর্জিতে ঘুরে মরতে হত না ওকে। বলদটার বাপ-মা গুরুজনেরা কে কি আশীর্বাদ করেছিল, বলা মুশকিল। কিন্তু ওটা একটা সর্বাঙ্গসুন্দর বলদ হোক, যাতে ওর মালিক দু'পয়সা পায় ওর বিনিময়ে, সেটুকু ওর মালিক নিশ্চয়ই কামনা করত। ওকে বেচে সে লোকটা কত পেয়েছে বা উচিত দাম পেয়েছে কি না, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ও যে চোখে ঠুলি এঁটে ঘানি টেনে মরছে সারাজীবন, এটা ত' চাক্ষুষ সত্য। কাজেই ওর কপালে শুভকামনা, মঙ্গলপ্রার্থনা কতটুকু ফলেছে সেইটুকুই বিচার্য।

আমার সেই লাহোরী দাদার গালে-তিলওয়ালা বৌটি স্বামীর মদ খাওয়া সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন। এজন্যে কে দায়ী হবে? সেই মেয়েটির ষেটেরা পুজোর দিন থেকে কতজনে কতভাবে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তা-ই বা কে বলতে পারে!

যাক, বৌদি কিন্তু আত্মহত্যাটা করেন নি। দাদা ওটাকে রটিয়েছিলেন কেন, দাদাই জানেন। বৌদি পালিয়েছিলেন। পালিয়ে তিনি বাঈজীও হন নি, সন্ন্যাসিনীও হন নি। এমন কি নার্স বা দেশ-উদ্ধারকারিণীও হন নি। একজনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। সে ভদ্রলোক পাঞ্জাবী। বিয়ে-করা স্ত্রী নিয়ে যেমন ঘর করতে হয় তেমনি সংসার করেছিলেন। কয়েকটি ছেলেমেয়ে সমেত ওঁদের স্বামী-স্ত্রীকে আমি দেখেছিলাম হরিদ্বারে। তখন

আমি স্বামিজী মহারাজ হয়ে গেছি অর্থাৎ বেটেরা পূজের দিন থেকে যত আশীর্বাদ যতভাবে ঝরে পড়েছে মাথার ওপর তার ফল ফলতে সুরু হয়েছে তখন। কাজেই চিনেও তাঁকে চিনলাম না। ওঁরা সাধুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

সবাই ঘরে ফিরে যাবার গরজে মরছে, আমার কিন্তু সে গরজ নেই। কারণ আমার ঘরই নেই।

কেন, কি করে ঘর হারালাম আমি, সেইটুকুই শোনাতে চাই। তাই দিয়েই আরম্ভ হবে আমার শোনানো।

॥ এক ॥

বছর ত্রিশেক আগেকার কথা।

কলকাতা শহর তখন মনুষ্যবাসের উপযুক্ত ছিল। সে সময় শহরের মানুষ যতক্ষণ খুশী, নিজের ঘর-বাড়ীর ভেতর শুয়ে-বসে থাকতে পেত, যতক্ষণ সম্ভব পথে পথে ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন হত না কারও। তখন শহর জুড়ে অনবরত সভা সম্মেলন বসত না। কোথাও একটা কিছু ঘটাতে পারলেই লাখ লাখ লোক জুটত না। সে সময় বক্তৃতা করবার মানুষও কম জুটত। একটা সভাপতি হলেই সভা করা চলত। একজনকে প্রধান-অতিথি হিসেবে ডেকে এনে সভাস্থ অন্য সকলকে অপ্রধান প্রতিপন্ন করার রেওয়াজটি চালু হয় নি তখনও। এবং সকলের অল্প বিস্তর চৈতন্য ছিল বলে চেতনা সঞ্চার করার জন্যে উদ্বোধক ডাকার প্রয়োজনই হত না।

কলকাতার রাস্তায় সবেমাত্র তখন উর্বশী-কিন্নরী-রম্ভা-ঘৃতাচী ইত্যাদি সব অপ্সরারা ঘুর-ঘুর করে ঘুরতে সুরু করেছেন। একদা পঞ্চনদীর তীরে শিরে বেণী পাকিয়ে যাঁরা সগৌরবে খুনোখুনি করতেন, তাঁরা কলকাতায় এসে নির্মম নির্ভীক চিত্তে অপ্সরাদের চালনা করতে লাগলেন। অবোধ্য ভাষার কলহ-কচকচিতে কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। মোড়ে মোড়ে ওঁরা চায়ের দোকান খুলেছেন। মস্ত বড় কড়ায় আধ ইঞ্চি পুরু সর পড়েছে দুধের ওপর। সেই দুধ আর সর দেওয়া চা এক গেলাস বা আধপোয়া দই আধপোয়া চিনি ঘোঁটা লস্যি এক ভাঁড় খেয়ে শহরের মানুষ ওঁদের গালমন্দ চোখরাঙানি হাসিমুখে সহ্য করছে। অপ্সরারা আড়াই ঘণ্টায় শ্যামবাজার থেকে খিদিরপুর পৌঁছত। প্রতিবাদে অতি-বিনীতভাবে কিছু নিবেদন করতে গেলে শুনতে হত— "ট্যাক্সিতে চলে যাও।" কিন্তু ট্যাঁকের সঙ্গে ট্যাক্সির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু চিন্তা করে সত্যিই কেউ ট্যাক্সি চেপে বসত না।

ট্যাঁকের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল, এখনকার মত তখন

শহরের মানুষের ট্যাঁকে নোট গিজগিজ করত না। মাত্র সাড়ে তিনটি টাকা ট্যাঁক থেকে বার করতে পারলেই এক মণ বাঁকতুলসী বা চামরমণি ঘরে গিয়ে পেঁ ছিত। পঁচিশ টাকার চাল দেখাতে কোন দোকানদার তখন সাহস করত না। সাত সিকে দিয়ে এক জোড়া লাট্টু পাড় কিনলেই লজ্জা-নিবারণের কাজটা চলে যেত। সাড়ে চার হাত গামছা কিনতে দু-ছুটো টাকা খসত না। চাঁদনির চাঁদমার্কা জামা শুধু চোদ্দ আনায় মিলত। চীনদেশে তখন আমরা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-কলা-কৃষ্টি দেখাবার জন্যে দলে দলে মানুষ পাঠাতে আরম্ভ করি নি বলে চীনেবাড়ীর জুতোর জন্যে "লে আও আলাই লুপেয়া" শুনতে পাওয়া যেত।

সে সময়ে লোককে দেখাবার জন্যে বা বক্তৃতা দেবার জন্যে কেউ সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য ইত্যাদি জিনিষগুলোকে ব্যবহার করত না। সমাজে মেলা-মেশা করার সময় ব্যবহার করত। পাড়ায় পাড়ায় তখন দশটা সর্বজনীন পুজো গজায় নি। কাজেই প্রতি দশজনের জন্যে এক একটি সমাজ গড়ে ওঠে নি। পাড়াসুদ্ধ মানুষ তখন একে অপরকে চিনত, পরস্পরের সুখ-দুঃখের সংবাদ রাখত। কারও বাড়ীতে কেউ ম'লে না-ডাকতেই দশ জনে গিয়ে জুটত। মড়া নিয়ে যাবার জন্যে হিন্দু সৎকার সমিতির আফিস খোলে নি তখনও। শ্মশানে মাত্র চোদ্দ সিকে খরচা হত। কিন্তু অত সস্তাতেও এখনকার মত এত মড়া পুড়ত না!

মড়া বেশী পুড়ত না—কারণ মাইক তখনও বাজারে ওঠে নি। বেঁচে থাকলে মাইকের গান, মাইকের বক্তৃতা শুনতেই হবে, এ ভয় ছিল না তখন। মাইক না থাকার দরুণ লোকে দুর্গা-সরস্বতী পুজোটুজোগুলো নিজেদের ঠাকুর-দালানে বা ঘরের ভেতর সেরে ফেলত। রাস্তার নর্দমার ধারে বা পোড়ো মাঠে ন্যাকড়া-কানি টাঙিয়ে পুজোরও ফাঁদ কাঁদত না। সে সময় বিসর্জনের দিন বিসর্জন দিত। বিসর্জনের শোকযাত্রায় ধেই ধেই করে কেউ স্ফূর্তিতে নাচত না। কারণ বিসর্জনের বাজনায় বিষাদের সুর শোনা যেত, হিন্দী সিনেমার গানের সুর শোনা যেত না।

সুর বললেই সঙ্গীত কথাটা এসে পড়ে। সে সময় উচ্চাঙ্গ-নিম্নাঙ্গ-রাগপ্রধান-কামপ্রধান-লোভপ্রধান ইত্যাদি নানা জাতের সঙ্গীত গাইত

না কেউ। রবি ঠাকুর তখনও রবীন্দ্রনাথ হন নি। লোকে রবি ঠাকুরের গান রবি ঠাকুরের মত করে গাইবার চেষ্টা করত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে বসে এখনকার মত নাকেকান্না আর হাঁপানি শুনতে হত না। সে সময় মানুষ, যখন যে সুরে গান গাওয়া উচিত, তা-ই গাইত। চাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে কেউ, "বালির শয্যায় কালীর নাম" গাইত না।

কালী ছিল তখন কালীঘাটে আর ঠন্‌ঠনেতে। সে সব জায়গায় হরদম পাঁঠা পড়ত। পাঁঠা তখন চার টাকায় এক জোড়া মিলত। কারণ শিক্ষিত-পাঁঠা সে সময় মিলত না।

আর এক কালী ছিল বরানগরের ওধারে। পাঁঠা সেখানে মোটেই পড়ত না। অনেকদিন আগে সেখানে ছিলেন এক পাগলা বামুন। মানুষে তাঁকে ভালবেসে নাম দিয়েছিল রামকেষ্ট ঠাকুর। ইনি বলিদান না-দিয়ে বহু শিক্ষিত-পাঁঠাকে একদম মানুষ করে দিয়ে যান। এঁরই চেলা ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই চেলাটির ঠেলায় শেষে দেশ থেকে পাঁঠামি উঠে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

কালি অবশ্য বাজারে পাওয়া যেত—কালো রঙের কুইনিনের বড়ির মত। এক পয়সায় দু-বড়ি মিলত। এখন এতটুকু একটি বেঁটে শিশিতে এক ছটাক গোলা কালির দাম পাঁচসিকে-দেড়টাকা। রবি ঠাকুর ঐ এক পয়সায় দু-বড়ি কালি গুলে এমন লেখাই লেখেন যে, সারা দুনিয়ায় তোলপাড় লেগে যায়। যার ফলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সম্মানটা তিনি ছিনিয়ে আনেন বাংলার জন্যে। কিন্তু সেই রবি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ পাঁচসিকে-দেড়টাকার এক ছটাক গোলা কালি কিনে লিখতে বাধ্য হন। আর সেইজন্যে বড় দুঃখেই লিখে যান—অমুক কালির কালিমা ঘোচবার নয়। কথাটা কত বড় সত্যি তা এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে। এক পয়সায়-দু-বড়ি কালি দিয়ে লেখা রবি ঠাকুরের কবিতা গান পড়ে আমরা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এখন রবীন্দ্রনাথের লেখা আমরা একেবারে পড়ি না। এবং তিনি মারা গেছেন, সুতরাং প্রতিবাদ করতে আসবেন না, এই সাহসে বছর বছর তাঁর জয়ন্তী উৎসব করে যা খুশী তাই বলে আসি।

রবি ঠাকুরের নাম করতে শরৎ চাটুয্যের নামটাও এসে পড়ে। শরৎ চাটুয্যেও তখন শরচ্চন্দ্র হন নি। মনোহরপুকুর কোথায়, তা তিনি জানতেন না। জানলেও সেখানে পেঁছিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তখন মনোহরপুকুরে যারা বাস করত—তারা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ন'মাসে ছ'মাসে নেহাত দরকার পড়লে কলকাতায় আসত। সাবিত্রীরা তখন বড়-জোর মেসের ঝি হত। এখনকার মত ফস্ ক'রে টালিগঞ্জে গিয়ে সিনেমার ছবি তুলত না।

পূর্ণ থিয়েটারে তখন আগে সিনেমা দেখিয়ে তারপর আধ ঘণ্টা ফাউ-হিসেবে থিয়েটার দেখাত। ছায়ার রামী হবার আগে কায়ার রামী সেখানে রোজ-তু'বার থিয়েটার করতেন। খুব ভিড় হত। চার আনার টিকিট পাঁচ আনায়, আট আনার টিকিট ন' আনায় কিনতে হত। কিন্তু এখনকার মত তখন বাপ-বেটা, মাষ্টার-ছাত্র একসঙ্গে বসে সিনেমা-থিয়েটার দেখত না।

গ্লোবে তখন শনিবার-বুধবার ইংরেজী ছবি বদলাত। বিলেতী কায়দায় প্রেম-ডাকাতি-নারীহরণ-জালিয়াতি যারা দেখতে ভালবাসত, তারা মরিয়া হয়ে ছুটত সেখানে। চার আনার টিকিট কিনতে জামা জুতো গেঞ্জি খুলে রেখে যা করতে হত—এখন তা কেউ জ্যান্ত স্টারকে ছোঁবার জন্যেও করতে রাজী হবে না। তারপর কপালজোরে টিকিট পেলে তিন লাফে তেতলায় উঠে তৎক্ষণাৎ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হত। নয়ত দম ফেটে মারা পড়বার ভয় ছিল, গ্রেটা গার্বোর প্রেম-করা আর দেখতে হত না।

দেশী-বিলেতী প্রেমের ছবি দেখা ছাড়া জলজ্যান্ত প্রেমে পড়বার একদম উপায় ছিল না তখন। দাদার শালী বা দিদির ননদ, এঁরাও লোকচক্ষুর অন্তরালে দশে পেঁছে, মাথায় সিঁদুর লেপে শ্বশুর-বাড়ী চলে যেতেন। বাজারে তখন এত রকমের ছিট মিলত না। বাটা কোম্পানীও খোলে নি, কাজেই মনের মানুষের মনের মত ছিট বা শ্রীচরণের সোনালী পাদুকা কেনবার জন্য কেউ হন্যে হয়ে উঠত না। তা ছাড়া পাশের বাড়ীর ক্ষেন্তীকেও কোনও কিছু লুকিয়ে দিতে গেলে মহা অনর্থ বেধে

যেত। আগে সে জিভ ভেংচে পা তুলে লাথি দেখাত। তারপর তার বাপ-মাকে বলে দিত।

তা বলে প্রেমের বই যে বাজারে মিলত না, তা নয়। ভাল ভাল প্রেমের বই চিৎপুরে গরাণহাটার মোড়ের দোকানে পাওয়া যেত। সে সব বইয়ের মলাট হত টকটকে লাল রঙের। সোনালী অক্ষরে জ্বলজ্বল করত বইয়ের নাম মলাটের ওপর। মলাটের ভেতর থাকত তুলো। বিয়ের সময় নতুন বৌ সে-সব বই পেত। বইয়ের ভেতরে থাকত দশ-বিশখানা ছবি। মত্তপ স্বামী তার সুন্দরী বৌকে, লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে, তার গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গরাণহাটার ওদিকে রওয়ানা হচ্ছে—এই জাতের ছবি থাকত। সেই ছবি দেখতে দেখতে নতুন বৌ বেচারা খুব কাঁদত। সেই চোখের জল শোষবার জন্তেই মলাটের মধ্যে তুলো দেবার রেওয়াজ ছিল। এখনকার খুব নামজাদা লেখকের বই পড়েও কারও চোখে জল আসে না। তাই মলাটের ভেতর তুলো দেওয়ার আর চল নেই।

কিন্তু একথা মনে করা ভুল হবে, তুলো-দেওয়া মলাটের ভেতরের স্বামীদের মত তখনকার সব স্বামীই স্ত্রীকে লাথি মেরে, গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ী থেকে চলে যেত। বরং এর উল্‌টোটাই ঘটত খুব বেশী। প্রেমে পড়বার উপায় ছিল না বলে লোকে খপ্ করে বিয়ে করে ফেলত। বিয়ে করেই নিজের সেই কচি বউয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়ত। তার ফলে জন্মাত ছেলেপুলে। আর তখন লোকে চাকরির চেষ্টায় লেগে যেত।

তেত্রিশ টাকায় তখন বি. এন. আর. অফিসে লোক নেওয়া হত। পঁয়তাল্লিশ টাকায় নেওয়া হত পোর্ট-কমিশনার অফিসে। 'গর্মেণ্টে'র আপিসে ঢুকত 'গর্মেণ্টে'র লোকের ছেলে-পুলেরা, পুলিশে ঢুকত পুলিশের শালা-ভগ্নীপতি। পশ্চিমের মানুষ কলকাতায় আসত পোষ্ট অফিসের পিয়ন আর রাস্তার জমাদার-সাহেব হবার জন্তে। অন্য সব অফিসে সাহেবরা বড়বাবুদের কথায় লোক নিতেন। বড়বাবুদের নজর ছিল খুব বড়, তাঁদের দিয়ে সাহেবকে কিছু শোনাতে হলে বড় ব্যাপার করতে হত। ছোট কিছু তাঁদের নজরে ধরত না।

কোনও দিকে কোন কিছুর সুরাহা করতে পারত না যারা, তারা বার্ড

কোম্পানীর অফিসে নাম লেখাত। তারপর খিদিরপুরের দিকে গিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজত।

খিদিরপুর ডকে জাহাজ থাকলে আর জাহাজে মাল ওঠানামা করলে কাজ মিলত। সারা-দিন কাজ করলে বার আনা, রাত-ভোর কাজ করলে এক টাকা। শনিবার বার্ড কোম্পানীর অফিসে গিয়ে দাঁড়ালে সপ্তাহের রোজগার এক সঙ্গে হাতে গুণে দিত। কাজও এমন কিছু নয়। সারা-দিন বা সারা-রাত ছুটোছুটির কাজ। জাহাজ থেকে দেশ-বিদেশের মাল নামছে—তার প্রতিটি বাক্স, গাঁট, বাণ্ডিলের গায়ে মার্কা, নম্বর দেওয়া আছে। পশ্চিমের মানুষে হাতে-ঠেলা গাড়ীতে তুলে মাল গুদামের ভেতর নিয়ে আসছে। গাড়ীর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাদের দেখিয়ে দিতে হবে, কোথায় কোন মালটি রাখবে। বাক্স-গাঁট-বাণ্ডিলের মার্কা-নম্বর, মিলিয়ে, ঠিক জায়গায় মালটি ঠিক-ভাবে যাতে রাখে, তাই দেখা হচ্ছে কাজ। এই পদটির মর্যাদা ছিল। পশ্চিমের মানুষে বাবু বলে ডাকত, বার্ড কোম্পানীর মাইনে-করা আবলুস-জিনিয়াবর্ণ সুপারভাইজার সাহেব ডাকতেন 'টিন্‌ডেল্‌' বলে। কখনও গায়ে হাতটা তুলতেন না, বড়-জোর 'শালা হারামীকো বাচ্ছা' বলে আদর করতেন।

ভূকৈলাস রাজবাড়ীর চতুর্দিকে গড় ছিল। গড়ের ভেতর, রাজবাড়ীর বাইরে, চাকর-খানসামা-সহিস-কোচোয়ানদের জন্যে বেঁটে বেঁটে এক সার ঘর ছিল। ঘরগুলো নেহাত নীচু ছিল না। ভিত মাটির সঙ্গে সমান ছিল বলে বেঁটে দেখাত। রাজাদের বুড়ো সহিস ছোলেমান গড়ের বাইরে বিবি নিয়ে থাকত। তার ঘরখানা আড়াই টাকায় আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। আড়াই টাকার সবটা ছোলেমান পেত না। আট আনা গোমস্তা হলধর হালদার মেরে দিত।

আমরা—মানে আমরা তিনজন। নেপেনদা', গোমেশ আর আমি। আমরা তিনজনই বার্ড কোম্পানীর খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম

নেপেনদা'র বয়স হয়েছিল। মেসোপোটেমিয়ায় গিয়েছিল ফ্লুট বাঁশী বাজাবার কাজ করতে। যুদ্ধে গিয়ে কেউ বাঁশী বাজাবার কাজ পায় তা'

জেনে আশ্চর্য হয়েছিলাম তখন। নেপেনদা' কিন্তু সত্যিই বাঁশী বাজাতে পারত। যুদ্ধ চিরকাল চলল না বলে কাজটি যায়। তখন এসে বার্ড কোম্পানীতে নাম লেখায়। বাঁশী বাজানো ছাড়তে হয়েছিল নেপেনদা'কে। যুদ্ধে কি একটা বদ্ জাতের গ্যাস নেপেনদা'র ফুস্ফুসে গিয়ে ঢোকে। ফলে নেপেনদা'র ওপর-টান উঠত। টান উঠত বলে পিনিক টানা ধরেছিল। পিনিক হচ্ছে চরস। আফিমের মত আঁটাল জিনিস। মটরের মাপে, ছোট একটা ডেলা দেশলাই-এর কাঠির মাথায় লাগিয়ে আর একটা কাঠি জ্বেলে তাতে আগুন ধরাতে হয়। দপ করে জ্বলে উঠলেই নিভিয়ে দাও। চরসের রসটুকু গেল মরে। তখন সেটুকু, হাতের চেটোয়, বিড়ির তামাকের সঙ্গে বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে বিড়িতে পুরে টানতে হবে। লোকে দেখবে বিড়ি টানতে, আসলে টানা হচ্ছে চরস। আঁশ-পোড়া গন্ধ বেরোয়। গন্ধটা লুকনো যায় না। পিনিক না টানলে নেপেনদা' দম টানতে পারত না, সারা-রাত হেঁটে কাটাত।

গোমেশের ঠাকুরদা'র বাবা মাদারিপুরের লোক। ঠাকুরদা'র বাবার নাম জানত গোমেশ। বলত 'দ্যাট্ ওল্ড ফেলা দীনবন্ধু ঘাউস।' মাদারিপুরের দীনবন্ধু ঘোষের ছেলে অখিলবন্ধু ঘোষ বাপের দই-দুধের কারবার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। পালিয়ে গেল বরিশাল সহরে। স্টিমারে কয়লা দেবার কাজ জুটিয়ে নিয়ে কলকাতায় চলে এল। কলকাতায় এসে দরিয়ার জাহাজে উঠল কয়লা দিতে। ঘুরে এল দুনিয়া। 'সফর কেমিয়ে' দেশে ফিরে দেখলে, জাত গেছে। ঘরে বিয়ে-করা বউ ছিল, তাকে কেড়ে নিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। যাওয়া-জাতটাকে আরও ভাল করে যাওয়াবার জন্যে উকিল গোমেশ হয়ে গেল। ছেলে হতে নাম রাখলে অগাষ্টাইন গোমেশ। অগাষ্টাইন বিয়ে করলে ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়ে। মেল ট্রেণ চালাত। ট্রেণ উলটে পড়ার দরুণ বেচারা মারা গেল সময় না হতেই।

গোমেশ বলত—"পুয়োর ড্যাডী যখন পাস করে গেল আমি এইটুকু কিডি।" কিডি নিয়ে গোমেশের মা খুবই মুস্কিলে দিন কাটাতে লাগলেন। কিডিকে তের-চোদ্দ বছরের চ্যাপ তৈরী করে দিয়ে তিনিও

চোখ বুজলেন। গোমেশের ভাষায়, "হার সোল" শান্তিতে রেষ্ট নিতে লাগল।

চোদ্দ বছরের ছেলেকে পেটের ধান্দায় পথে নামতে হল। কাজ জুটল শেয়ালদার ওধারে এক মুসলমানী হোটেলে। খেতে দিত তারা, দু'টাকা মাইনেও দিত। কিন্তু মারধোর করত খুব বেশী রকম। হোটেলওয়ালাকে একদিন পুলিশে ধরে নিয়ে গেল পকেটমারদের মাল সামলাতো বলে। গোমেশের চাকরিটি গেল। তারপর বহু কষ্টে গোমেশ কাজ পেল পার্ক সার্কাসের এক মেম-সাহেবের বাড়ী। বার্ড কোম্পানীর এক সাহেব সেখানে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়তেন। গোমেশ তাঁকে যত্ন করে ফিটনে তুলে তাঁর ঘরে পৌঁছে দিত। কোনও দিন সাহেবের পকেট থেকে ব্যাগ বা অন্য কিছু খোয়া যায় নি। সাহেব ছোকরাকে চিনে ফেললেন। বার্ড কোম্পানীর খাতায় নাম তুলে দিলেন। আর একটু বয়স বাড়লে, আরও যাচ্ছে তাই মুখ খারাপ করতে শিখলে, আর মদ খাওয়া ধরলে গোমেশও কোম্পানীর সুপারভাইজার হবে—এ আমরা জানতাম।

কিন্তু সে যখন হবে, তখন হবে। সে সময় কিন্তু সময়টা আমাদের খুবই অসময় যাচ্ছিল। সপ্তাহে দু'রাত বা দু'দিনের বেশী কাজ জুটত না কারও। সপ্তাহে তিনজনের একুনে আয় হত ছ'টাকার নিচে। তার মধ্যেই সব সারতে হত। সকাল হলেই নেপেনদা'র চাই পিনিক আর চা, গোমেশের ব্রেকফাষ্টের জন্যে নেড়ে-বিস্কুট আর চা, আমার চাই ভেজানো-ছোলা আর গুড়। তার ওপর টুকিটাকি খরচ ত' আছেই। এই সমস্ত চালিয়ে দু'বেলা ডাল-ভাত খাওয়াটা এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠল। পাইস সিষ্টেমে গিয়েও পাত্তা পাওয়া গেল না। চার পয়সার ভাত, দু'পয়সার ডাল, দু'পয়সার তরকারি নিলেও পেটের এক কোণ ভরে না। এতে এক-বেলায় তিন জনের লাগে ছ'আনা। দেখা গেল আমাদের যা আয় তাতে একজনেরই পাইস হোটেলে খাওয়া চলে, বাকী দু'জনকে তখন ঘরে শুয়ে মাকড়সার জাল বোনবার কায়দাকানুন পর্যবেক্ষণ করতে হয়। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের আইন অনুযায়ী

আমরা কেউ কাউকে ফেলে অন্নগ্রহণ করতে রাজী ছিলাম না। ফলে সেই ঘরের মধ্যেই আমরা ত্বপুরের লাঞ্চ, রাত্রের ডিনার সারতে লাগলাম ছাতু-লঙ্কা-লবণ সহযোগে। ব্যাপারটা খুবই সঙ্গোপনে চালাতে হত। কারণ আমাদের হুকুমে যারা মাল নিয়ে ঠেলাঠেলি করত, ওই সুখাদ্যটি ছিল তাদের একচেটিয়া। আমরা টিণ্ডেলবাবু তাদের খাদ্য খাচ্ছি, এটা জানাজানি হয়, তা সহ্য করি কি করে!

সঙ্গোপনটা সহ্য হলেও খাদ্যটা অসহ্য হয়ে উঠল। এই রকম বিপদাপদের সময় আমরা নেপেনদা'র ওপর নির্ভর করতাম। যুদ্ধে গিয়েও যে-মাথা স্কন্ধচ্যুত হয় নি, সে মাথার কদর আমরা জানতাম। অতএব ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তলে তলে নেপেনদা' একটা কিছু ব্যবস্থা করছেই—এ বিশ্বাসটুকু ছিল।

নেপেনদা' ঘুরতে লাগল টো টো করে। কোথায় যায়, কি করে তা জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল না। সে রেওয়াজও ছিল না। আমাদের সংসারে নিয়ম ছিল, যে যখন যেমন পারবে আমদানী করবে। কি করে কে কি জোটাচ্ছে, এ জানবার কারও সখও ছিল না। এই সব অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে উলটো ফল হত। জবাবের বদলে গালমন্দ মুখখিস্তির ঝড় বয়ে যেত।

নেপেনদা' ঘুরছে! সকালে পিনিক টেনে চা খেয়ে বেরোচ্ছে আর সেই সন্ধ্যায় ফিরছে। এইভাবে সাত দিন গেল। সাত দিনে সাত-সাতে উনপঞ্চাশ বার গোমেশ বলল—"ডিস্‌ঘাসটিং!" শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বলল, বসে-বসে হাতের আঙ্গুলগুলো মটকাতে-মটকাতে বলল, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মেঝের ওপর পা ঠুকে বলল। রাত্রে ঘুমতে-ঘুমতেও মাঝে-মাঝে বলল—"ডিস্‌ঘাসটিং!" বলে মাথা উঁচু করে খানিক থুতু ফেলল দেওয়ালের গায়ে। ঠিক ধরতে পারলাম না, কাকে ও বলছে ঐ ভয়ানক জোরাল বাক্যটি। কিন্তু এটুকু বুঝলাম যে, ওর পেটের ভেতর অন্য কোনও পদার্থ না-পড়া পর্যন্ত অনবরত ঐ 'ডিস্‌ঘাসটিং' বেরোতেই থাকবে।

অবশেষে আট দিনের দিন সন্ধ্যার আগে নেপেনদা' ঘুরে এসে ঘোষণা করলে, কেল্লা ফতে। একসঙ্গে ন'টি টাকার সংস্থান হলেই রোজ রাত্ত

দশটার পর পেট-ভরা ভাত-ডাল-মাছ-মাংস-পোলাও-কালিয়া পর্যন্ত জুটতে পারে। কিন্তু টাকা ন'টি চাই এক সঙ্গে এবং দাখিল করতে হবে খেতে যাবার আগে। নয়ত এ সম্বন্ধে আর এতটুকু এগনো চলবে না।

শুনেই আমরা নাকে পোলাও-কালিয়ার গন্ধ পেলাম। সেই গন্ধ নাকে নিয়ে ছাতুর ডেলা গিলে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে আমার আর গোমেশের ঘুম হল না। ন'টি টাকা এক সঙ্গে এক করবার দুশ্চিন্তায় উঠে বসে বাইরে বেরিয়ে রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে ঘন ঘন 'ডিস্‌ঘাসটিং' বলতে লাগল গোমেশ। তারপর আটটা-ন'টা নাগাদ উধাও হল। ফিরল সেই বেলা চারটের পর। দোমড়ানো-মোচড়ানো-দলাপাকানো আস্ত একখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে মারলে নেপেনদা'র বুকের ওপর। মেরে স্নান করতে গেল শিব-পুকুরে। একটু পরে নেপেনদা'ও বেরিয়ে গেল নোটখানি নিয়ে।

যথাসময়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। নেপেনদা'র ছাতু-জল একধারে চাপা দেওয়া রইল। রাত বাড়তে লাগল। রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে এগারোটা ঘা পড়ল। কান পেতে মটকা মেরে পড়ে রইলাম। নেপেনদা' ফিরবেই। রাতে কখনও বাইরে থাকে না কোম্পানীর কাজে না গেলে। নেপেনদা'র ভাষায় রাতে বাইরে ঘোরে 'পেঁচা আর বাদুড়'।

রাত বারটা পার করে ফিরল নেপেনদা'। ঘরে ঢুকেই ঘুমন্ত আমাদের শুনিয়ে দিলে, পরদিন রাত দশটায় বেরোতে হবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসতে সাড়ে-এগারটা বারটা হবেই। তা হোক, ভাল করে বোঝাই নিয়ে ফিরলে চব্বিশ ঘণ্টার দায়ে নিশ্চিন্ত। শালিক-ছানার মত ছাতু গিলে মরতে হবে না আর। ঘুমতে-ঘুমতেই গোমেশ বলে উঠল, "ডিস্‌ঘাসটিং!" কিন্তু মাথা উঁচু করে থুতুটা আর ফেললে না।

নায়ক-সান্নিধ্যে নায়িকার অভিসারযাত্রা—নায়িকার বুক ঢিপ-ঢিপ করছে, পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, পাছে দেখে ফেলে কেউ এই ভয়ে বারবার চারিদিকে ত্রস্ত দৃষ্টি ফেলছে, ইত্যাদি কত রকমের সব কাণ্ড-কারখানা— কথক ঠাকুররা শোনান। শুনতে বেশ মজাও লাগে। কিন্তু প্রথম দিন

রাত দশটায় যখন আমরা শুভযাত্রা করলাম, নায়িকার উদ্দেশ্যে নয়, ভাত-ডাল-মাছ-তরকারি আর সম্ভব হলে পোলাও-কালিয়ার উদ্দেশ্যে, তখন সেই কথক ঠাকুরদের কথামত বুক টিপ-টিপ করতে লাগল। পায়ে-পায়ে জড়িয়ে না গেলেও দু'একটা হোঁচট খেলাম। ত্রস্ত-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে না তাকালেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মনের ভেতর বেশ খচ্‌খচ্‌ করছিল। অর্ধেক রাত্রে এভাবে ভাত খেতে যাওয়াটা কেন যেন বেশ সহজভাবে কেউ বরদাস্ত করতে পারছিলাম না।

নেপেনদা' আমাদের তালিম দিয়েছিল, খেতে গিয়ে টুঁ শব্দটি করা চলবে না। যাবে, যা দেবে খাবে, চলে আসবে। কে খাওয়াচ্ছে, কি খাওয়াচ্ছে, কেন মাত্র তিনটি টাকায় এক মাস খাওয়াচ্ছে, ইত্যাদি অনাবশ্যক প্রশ্ন করার একদম অধিকার নেই। কপালে জুটছে, খাচ্ছি। যতদিন জুটবে খাব। যেদিন জুটবে না, সেদিনও চুপচাপ মুখ বুজে ফিরে আসব—এইসব অঙ্গীকার করিয়ে নিয়ে তবে নেপেনদা' আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ভূকৈলাস থেকে বেরিয়ে খিদিরপুর ট্রাম-ডিপোর পাশের রাস্তা ধরলাম। আধ ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছলাম ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটে। ওয়াটগঞ্জ দিয়ে খানিক এগিয়ে ফের বাঁ-হাতি ঘুরতে হল। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম খিদিরপুর খালের ধারে। ইট-চুন-বালি-সুরকির এক গোলা। গোলার পাশ দিয়ে ইট-বাঁধানো অন্ধকার গলি। নেপেনদা'র পিছু পিছু ঢুকলাম গলিতে। কয়েক পা এগোতেই শেষ হলো গলি, সামান্য একটু খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। মনে হলো, তিনদিকে টিনের ঘর, মাঝে সামান্য একটু উঠোন। নেপেনদা' চাপা গলায় কাকে উদ্দেশ্য করে বলল—"খুড়ো, এসে গেছে নাকি গো।"

অন্ধকারের অন্তরাল থেকে জবাব এল—"এস বাবাজী, বস দাওয়ায় উঠে। এখনও পৌঁছয় নি সে, এই এল বলে!" কাশি শুরু হয়ে গেল —খক্ খক্ খক্ খক্! বক্তা প্রাণপণে কাশি সামলাতে লাগল।

কাশির শব্দ লক্ষ্য করে আমরা বাঁ ধারের বারান্দায় উঠে বসলাম। বিড়ি ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বালালে নেপেনদা'। সেই আলোয় দেখলাম, আরও গুটি দুই প্রাণী বারান্দার ও-প্রান্তে উবু হয়ে বসে আছে।

এক সময় কাশি থামল। সাঁই সাঁই আওয়াজ কিন্তু থামল না। তার মাঝে স্পষ্ট শোনা গেল পুঁ-উ-উ সঙ্গীত। নতুন তিনটি রক্তের থলি আমদানী হওয়ায় মশারা উল্লাসে ঐকতান তুলেছে। গোমেশ চুপি চুপি উচ্চারণ করলে—"ডিস্‌ঘাসটিং!" নেপেনদা' চটাস করে এক চড় কসালে, বোধ করি নিজের কপালেই পড়ল চড়টা। ইট-বাঁধানো গলির মুখে একটি ধূমায়মান কেরোসিনের আলো এগিয়ে আসছে, দেখা গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম আলোটার দিকে।

ধীরে সুস্থে আলোটা এসে পৌঁছল উঠোনের মাঝখানে। দেখা গেল আলোর পিছনে এক অন্ধকার মূর্তিও আছে। একটি মস্ত গামলা চক্‌চক্ করছে তার কাঁধের ওপর। বাঁ হাতে কাঁধের ওপর ধরে আছে গামলাটা, ডান হাতে আলোটা ধরে আছে বুকের কাছে। আলো, গামলা সব নামানো হল আমাদের সামনেই। বুঝতে পারলাম, সে মূর্তি একটি নারীর। নিঃশব্দে কাজকর্ম চলতে লাগল। সাঁই সাঁই আওয়াজ বার হচ্ছিল যার বুক থেকে সে উঠে এল একটা ঘটি হাতে নিয়ে। তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলে। হাত ধুয়ে দাওয়ায় উঠে তিনি দরজার তালা খুললেন। আলো, গামলা ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন। একটু পরে বেরিয়ে এলেন খানকতক শালপাতা হাতে করে। তারপর শালপাতা পেতে পরিবেশন সুরু হল। আলোটা বসানো রইল দরজার চৌকাঠের ওপর। অন্ধকারেই আমাদের পাঁচ জনের মুখ, হাত চলতে লাগল। অসুবিধে বিশেষ কিছুই হল না। ভাতটা একটু কড়কড়ে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাছের মাথার ডাল আর পাঁচ রকম তরকারি-সহযোগে অতি উপাদেয় লাগল। অন্ধকারে মুখে তুলছি আর বুঝতে পারছি, কি কি পদার্থ চলেছে পেটের ভেতর। আলু-পটল-মাছ সবই ভাঙ্গা, ঘাঁটা। তা হোক, কিন্তু সত্যিকারের যাকে বলে কালিয়া—তাই! শেষ-পাতে আমের চাটনিও পড়ল। বহুদিন পরে পেট ভরে খাওয়া গেল। অসুবিধা হল শুধু জলের। মাত্র এক-ঘটি জল বসানো রইল আমাদের সামনে। খেতে খেতে আমরা কেউ সে ঘটির দিকে হাত বাড়ালাম না।

খাওয়া শেষ হলে পাতা ক'খানি হাতে করে নেমে এলাম দাওয়া

থেকে। তারপর সেই গলি দিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। রাস্তাটা পার হয়ে নামলাম গিয়ে সামনের খালে। সেখানে পাতা ক'খানি বিসর্জন দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে উঠে এলাম। এবং সোজা রওয়ানা হলাম নিজেদের আস্তানার দিকে। অন্ধকার গলিটার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে দেখলাম —জন-প্রাণীর নাম-গন্ধ নেই সেখানে। নিজেদের পেট ভরিয়ে ঐ গলিটার ভেতর থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এলাম—এ যেন বিশ্বাসই করতে পারলাম না।

হপ্তাখানেক পর জাহাজ ঢুকল ডকে, জুটল আমার কপালে রাতের কাজ। জাহাজটার খোলে আগুন লেগেছিল। জলে-ভেজা আধপোড়া পাটের গাঁট, চামড়া আর হরতুকীর বস্তা নামতে লাগল জাহাজ থেকে। আমার কাজ হল মার্কা-নম্বর মিলিয়ে সেগুলোর হিসেব রাখা। গোমেশ আর নেপেনদা'র কপালে জুটল না সে কাজ। মার্কা-নম্বর পড়তে পারত না ওরা। তাতেও কিছু এসে গেল না। আমি একাই আড়াই জনের রোজগার করতে লাগলাম। এই কাজটির নাম টালি-করা। টালি-করার মজুরি সারা-রাতের জন্যে আড়াই টাকা পাওয়া যেত।

রাতের অভিসার বন্ধ হয়ে গেল আমার। কাজ করতে করতে এক ফাঁকে ছুটে গিয়ে, কাফিখানায় দু'খানা হাতে-চাপড়ানো চাপাটি আর কোয়ার্টার প্লেট মাংস খেয়ে রাত কাটাতে লাগলাম। দিনের বেলা নেপেনদা' দই চিঁড়ের ব্যবস্থা করলে। শরীরটা একটু ঠাণ্ডা না রাখলে সারা রাত কাজ করব কি করে?

গোমেশের কাছে গল্প শুনতাম, আগের দিন রাতে কি কি খেয়েছে ওরা। একদিন শুনলাম শুধু লুচি আর বেগুনভাজা খেয়ে এসেছে পেট ভরে। আর একদিন বললে, ভাত, চাটনি আর পাঁপরভাজা খেতে পেয়েছে আগের দিন রাতে। শেষপাতে দইয়ের সঙ্গে সন্দেশ চটকানো এক দলা পেয়েছিল। নানা রকম সুখাদ্যের গল্প শুনতে শুনতে জিভে জল এসে পড়ত। কিন্তু আগুন-লাগা জাহাজের খোল যতদিনে না নিঃশেষে খালি

হচ্ছে—ততদিন আমার খোলে ওই সব ভাল মন্দ দ্রব্যের এতটুকু ঢোকার উপায় নেই—এই চিন্তায় মনমরা হয়ে থাকতাম।

হঠাৎ নেপেনদা'র আর গোমেশের দিনের কাজ জুটে গেল। সকালে আস্তানায় ফিরে ওদের দেখতে পেতাম না আমি, সন্ধ্যায় ওরা যখন ফিরত তখন আমায় দেখতে পেত না। রাতে খাতা-পেন্সিল হাতে যখন বসে থাকতাম আগুন-লাগা জাহাজের সামনে, ওরা তখন যেত খালের ধারে রাজভোগ খেতে। আমার কপালে দিনে চিঁড়ে-দই আর রাতে নাম-না-জানা জীবের মাংস দিয়ে চাপাটি চিবনো। চটে গেলাম বিশ্ব-সংসারের ওপর। ঠিক করলাম রাতের কাজ ছেড়ে দেব। সাহস হল না। একবার কাজ ছাড়লে, কাজ আর আমায় নাও ধরতে পারে। সারা-দিনটা একলা ঘরে কাটাতাম। ঘুমিয়ে আর কতক্ষণ কাটানো যায়! গোমেশ থাকলে ওদের খাওয়া-দাওয়ার গল্প শোনা যেত। সে গুড়েও বালি। সারাটা দিন শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ঐ এক চিন্তা—খালধারের সেই অন্ধকার গলি, গলির মুখে হঠাৎ একটি কেরোসিনের আলোর আবির্ভাব, সেই চকচকে গামলাটা। গামলায় কি যে এল, মুখে দেবার আগে পর্যন্ত তা না-জানার রহস্য, অন্ধকারে চোখ বুজে না-জানা খাবার মুখে পুরে রসনা যখন জানিয়ে দিল কি খাচ্ছি—তখন সেই অপূর্ব রোমাঞ্চ এবং সব থেকে বড় কথা, সেই টিনের বাড়ীর বন্ধ-দরজা ঘরগুলোর মধ্যে কে আছে, কি আছে, তা আন্দাজ করার মাদকতা, এই সব নিয়ে সারাটা দিন জেগে কাটাতাম। রাতের ঘুম কেড়ে নিল আগুন-লাগা জাহাজে, দিনের ঘুম পালিয়ে গেল খালধারের সেই সরু গলির মধ্যে। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে!

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না। খালধারের সেই ইট-বাঁধানো সরু গলিটা লম্বা হতে হতে একেবারে পৌঁছে গেল আমার ঘরের ভেতর। পৌঁছে জড়িয়ে ধরলে গলা। টেনে বার করে নিয়ে এল আমায় রাস্তায়। হঠাৎ এক সময় দেখি, পৌঁছে গেছি সেই গলির মুখে। সুরকির কলটা চলছে। বিকট আওয়াজ হচ্ছে। বোঝাই হচ্ছে খানকতক গরুর গাড়ী। নাকে দড়ি পরানো গরুগুলো গলির মুখে দাঁড়িয়ে মুখ নাড়ছে আর

লেজের ঝাপটায় মাছি তাড়াচ্ছে। গোলার মধ্যে গাড়োয়ানরা গাড়োয়ানী ভাষায় বাক্যালাপ করছে। দুপুর রোদে আর কেউ কোথাও নেই।

মহা-চিন্তায় পড়ে গেলাম। গলিটার মধ্যে ঢুকব, না আবার ফিরে যাব যেখানকার মানুষ সেখানে, তা ঠিক করতে পারলাম না। বেশীক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েও থাকা যায় না গলির মুখে। হঠাৎ কেউ বেরিয়ে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবই বা কি! গলির ভেতর ঢুকেই বা করব কি! পৌঁছব ত' গিয়ে সেই উঠোনের মাঝখানে, দেখব তিন-দিকের টিনের ঘরগুলো বন্ধ। জন প্রাণী নেই।

আচ্ছা—এমনও ত' হতে পারে, দিনেরবেলা সেখানে মানুষ-জন থাকে। অন্ততঃ সেই বুড়োটা, যে অনবরত খক খক করে কাশে আর গামলা এসে পেঁ ছলেই উঠে গিয়ে জল ঢেলে দের হাতে, সেই বুড়োটা নিশ্চয়ই আছে বারান্দার কোণে বসে। তাহলেই ত' মুস্কিল! বুড়োটা চিনতে পারবে আমায়, জিজ্ঞাসা করবে—দিনেরবেলা ওখানে মরতে গিয়েছ কেন। তাহলেই সেরেছে। রাতে নেপেনদা' আর গোমেশ যখন খেতে আসবে তখন বলে দেবে ওদের কাছে আমার কথা। তারপর গোমেশের বাক্য-যন্ত্রণায় টিঁকতে হবে না আর।

গলির ভেতর পা বাড়াতে সাহস হল না। রাস্তা পার হয়ে খাল-ধারে গাছের তলায় বসলাম একখানা ইট পেতে। এই রোদে যখন এসেছি এতটা পথ, তখন একটু বসেই যাই। খাল হলে কি হয়, বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। বসে আর চট করে উঠতে ইচ্ছে হল না। একটি বিড়ি ধরালাম।

পড়ন্ত বেলায় মরন্ত খালের ধারে বসে জ্বলন্ত বিড়ি টানতে টানতে দেখছি—কতকগুলো হাবাতে কাক ওপারের কালো কাদার মধ্যে প্রচণ্ড সমারোহে কি খুঁজছে। দেখবার মত একটা কাণ্ড বটে! উড়ছে প্রায় সকলেই আর চেঁচাচ্ছে প্রত্যেকেই প্রাণপণে। ওরই মাঝে অনেকগুলো এক সঙ্গে ঝপাঝপ পড়ছে কাদার মধ্যে, পড়েই আবার উড়ছে। অনেক-গুলো তৎক্ষণাৎ করছে এদের পেছনে তাড়া। ততক্ষণে আর একদল পড়ছে, উড়ছে আর তাড়া খাচ্ছে। মনে হল, দারুণ ঝগড়া-মারামারি

হচ্ছে বুঝি। ভাল করে দেখে বুঝলাম, মোটেই তা হচ্ছে না। খাল থেকে জল নেমে যাওয়ায় কাদার মধ্যে ছোট ছোট মাছ আটকা পড়েছে। কাকগুলো এসেছে সেই মাছ খেতে। এসেছে বটে, কিন্তু খাওয়া হচ্ছে না প্রায় কারও। হত, যদি বকের মত সকলে শান্ত-ভাবে পা টিপে টিপে ঐ কাদায় বেড়িয়ে একটি একটি করে মাছ ধরত আর খেত। তা'ত নয়, ঝপ করে পড়ছে, ধরছেও হয়ত একটা ছোট্ট মাছ ঠোঁটে, সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচটা কাকে করছে তাকে তাড়া। মাছটা গলা দিয়ে গলবার ফুরসত পাচ্ছে না। হয় পড়ছে ঠোঁট ফসকে কাদার মধ্যে, কিংবা কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে আর কেউ। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেল। সাধে কি আর ব্যাটাদের কাক বলে! কাকের মত খেয়োখেয়ি করা কাকে বলে, তা দেখতে দেখতে মনটা বিশ্রী রকম খিঁচড়ে গেল।

যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে খালের ওপারটাই দেখা যাচ্ছিল শুধু। তাও ঐ কাদা পর্যন্তই। জল তখন বোধহয় ছিল না খালে, থাকলেও এত অল্প জল বইছিল খালের মাঝখান দিয়ে যে তা আমার নজরে আসছিল না। একবার মনে করলাম উঠে আরও খানিকটা এগিয়ে একেবারে কিনারায় বসে দেখি এধারে কাদার মধ্যে কি হচ্ছে। তারপর ঠিক করলাম দূর ছাই কে আবার ওঠে! কি-ই বা এমন দেখার আছে, ঐ ওপারের মতই কুৎসিত নোংরা কাদাই ত' দেখব শুধু। তার চেয়ে বেশ বসে আছি।

হঠাৎ আরও প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে উঠল সব ক'টা কাক। মনে হল কোনও কারণে ওরা যেন ভয় পেয়েছে। সাঁ সাঁ করে রাশি রাশি কাক উঠে গেল আকাশে। উঠেই চোঁ চাঁ—সবই উড়ে গেল উত্তর দিকে। হঠাৎ কি ঘটল দেখবার জন্যে আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে খালের দিকে চাইলাম। একি! এর মধ্যে এত জল এল কোথা থেকে! কাদা প্রায় ঢেকে গেছে জলে। দেখতে দেখতে জল-কাদা ছাপিয়ে ঘাসের গায়ে এসে ঠেকল। ঢাকা পড়ে গেল মরন্ত ঘাসের কদর্য রূপ। টলটল করে বয়ে চলল ধোঁয়া রঙের ঘোলা জল ওপর দিকে। হোক ঘোলা, তবু চোখ জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণ পরে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

সেই মুহূর্তে নজরে পড়ল, ডানদিকে হাত পাঁচ-সাত দূরে, কিনারায় উঠে নীচু হয়ে একজন তার ভিজে কাপড় পায়ের গোছের ওপর থেকে টেনে নামাচ্ছে। সামনের পেছনের কাপড় টেনেটুনে যতটা সম্ভব নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘাড়টা যতটা সম্ভব পেছনে ঘুরিয়ে পেছনটা দেখে নিলে। বুকের ওপর গামছাখানা আরও একটু টানটান করে মেলে দিলে। ওপাশ থেকে সদ্য-মাজা চকচকে বাসনের বোঝা তুলে নিলে হাতে। ডান হাতের চেটোয় বাসনের বোঝা নিয়ে হাতখানা তুলে ধরলে কাঁধের ওপর। বাঁ হাত দিয়ে মুখের ওপরের ভিজে চুলগুলো সরিয়ে পা বাড়াল।

দু'পা এগিয়েই মুখ ফেরাল এদিকে। তখন নজর পড়ল আমার ওপর, তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিলে। আরও একটু বেড়ে গেল গতিবেগ। কিন্তু ভিজে শাড়া জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। ফলে বেশ একটু সময় লাগল রাস্তাটা পার হতে। রাস্তা পেরিয়ে সরু গলিটার মুখে ঢুকল। আর একবার টপ করে তাকাল পেছন ফিরে। আর একবার দেখতে পেলাম তার মুখখানি। মুখখানি নয়, দেখলাম শুধু তার নাকটির বাঁ পাশে ছোট্ট একটি নাকছাবি। গাঢ় সবুজ একখানি পাথর আটকে রয়েছে নাকের বাঁ পাশটিতে, অদ্ভুত ব্যাপার বটে! ওটা যেন নাকেরই একটা অংশ। সে নাক-মুখের রঙও যেন ফিকে সবুজ। ফিকে সবুজের ওপর গাঢ় এক ফোঁটা সবুজ। মোটেই বেমানান হয় নি। বেশ মিলে গেছে। এমন আচমকা আর এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল সব ব্যাপারটা যে, থতমত খেয়ে গেলাম। খানিকটা সময় লাগল সামলাতে। মরা খালে জোয়ার এল, ও কি ভেসে এল নাকি বাসন ক'খানা নিয়ে জোয়ারের সঙ্গে! একটু আগেও ত' টের পাই নি, একজন ঠিক আমার সামনে কয়েক হাত নীচুতে বসে বাসন মাজছে, গা-ধুচ্ছে। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ওপারে কাকের খেয়ো-খেয়ি দেখছিলাম। এপারেও যে দেখবার মত কিছু থাকতে পারে তা কেন মাথায় আসে নি! একটু রেগেই গেলাম নিজের ওপর। ক্ষুণ্ণ মনে চেয়ে রইলাম গলিটার দিকে, যে গলির ভেতর এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

চেয়ে থাকতে থাকতে কি রকম যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। গলিটাকে মনে হল একটা অজগর সাপ। এইমাত্র সাপটার মুখের

ভেতর আমার চোখের সামনে ঢুকে গেল একটি জীবন্ত প্রাণী। ফিকে সবুজ রঙের এক হরিণী। হরিণী না হলেও হরিণীর মতই হালকা রোগা আর চঞ্চলা। প্রাণীটির দুই আঁখিতে ছিল সন্ত্রাস। সন্ত্রাস নয় —অবিশ্বাস; অবিশ্বাসও নয় ঠিক, ওটা হল 'এ আবার কে জ্বালাতে এল'-গোছের ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়। অথবা এও হতে পারে, হ্যাংলার মত ওর দিকে চেয়েছিলাম বলে ও রেগে গিয়েছিল। অতি সামান্যক্ষণ, মাত্র এক পলক সে চেয়েছিল আমার দিকে, সে চাউনিতে হয়ত এমন কিছুই ছিল না যা নিয়ে সত্যিই মাথা ঘামানো যায়। কিন্তু সে চাউনির এক ঝাপটায় এমনই নাড়া দিয়েছিল আমার মাথার মধ্যে যে, কি রকম যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। বসে বসে বাজে ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাতে লাগলাম।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ কানের কাছে কে বললে—"ছবি আঁকেন বুঝি মশাই?" চমকে উঠে ডানধারে মুখ ফেরালাম। তৎক্ষণাৎ বাঁ কানে কে বললে—"শিংওয়ালা বুনো শুয়োর একটা এঁকেছে ধুলোর ওপর।" বাঁ দিকে একবারটি চেয়েই মাটির দিকে তাকালাম। সত্যিই কি একটা এঁকে ফেলেছি ধুলোয়। কাঠিটা তখনও ধরা রয়েছে দু'আঙুলের ফাঁকে। তাড়াতাড়ি সেটা ফেলে দিয়ে ঘসা দিলাম সামনের ধূলোয়। শিং-ওয়ালা শুয়োর নয়, বন-হরিণীটা মুছে গেল। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম একটি হেঁচকা টান। দু'ধার থেকে আমার দুই বগলের নীচে চেপে ধরে এক ঝটকায় আমাকে খাড়া করা হল। তারপর চক্ষের নিমেষে পৌঁছে গেলাম সেই গলির মুখে। তখন মাটিতে ঠেকল পা, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে গেল—"টুঁ শব্দটি করেছ কি জাহান্নামে চলে যাবে!" টুঁ শব্দটি না-করেই ধাক্কা খেতে খেতে এসে পৌঁছলাম সেই ছোট্ট উঠোনটির মাঝখানে এবং আর গুটি দুয়েক ধাক্কা খেয়ে, রোয়াক পার হয়ে একটা দরজা টপকে টিনের ঘরে ঢুকে পড়লাম হুড়মুড় করে।

কানে গেল—"বেশী মারধোর করিস নি তো রে?"

পেছন থেকে উৎফুল্ল কণ্ঠে জবাব হল—"না, সে রকম দরকারই হল না। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এলাম।"

জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—“বেশ, বেশ, বোস দাদা বোস, দু'টো আলাপ করবার জন্যে তোমায় আনালাম এখানে, বুঝলে !”

বুঝি না-বুঝি, ততক্ষণে ঘরের ভেতরের অন্ধকার চোখে সহ্য হয়ে গিয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সব। ছোট্ট ঘরখানির চতুর্দিকে টিনের দেওয়াল। সামনে গলা-সমান উঁচুতে দু'টো ছোট জানালা। তাতেই যেটুকু আলো আসছে ঘরে। বাঁ ধারে ছোট্ট একখানি তক্তাপোশ, তাতে কি পাতা রয়েছে বোঝা গেল না। সেই তক্তাপোশে এক মূর্তি শুয়ে আছে গলা পর্যন্ত চাদর চাপা দিয়ে। যেটুকু আলো ছিল তাতে মুখখানা ভাল করে দেখা গেল না। এটুকু বুঝতে পারলাম, চুলে দাড়িতে জংলা হয়ে আছে মুখটা। একটা ধাক্কা খেলাম চোখ দু'টোর দিকে চেয়ে। সেই দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে জ্বলছে দু'টো চোখ। আলো ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে চোখ দু'টো থেকে। তাতেই যেন অনেকটা আঁধার কেটে গেছে ঘরের। কি রকম হয়ে গেলাম, বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম সেই জ্বলন্ত চোখ দু'টোর দিকে। সেই চোখ দু'টি কথা কয়ে উঠল—“যা তোরা, যা দিকি ঘর থেকে। একটু চা দিতে বল এখানে। এস ভাই,বোস এই বিছানার ধারে।”

আহ্বান এসেছিল সেই অদ্ভুত চোখ দু'টি থেকে। ভুলে গেলাম, এইমাত্র আমাকে নেহাত ছোটলোকের মত ধরে আনা হয়েছে। একবারও মনে হল না, ধরে আনার মধ্যে কোনও বদ মতলব থাকতে পারে। ভয়, অবিশ্বাস, সন্দেহ এতটুকু উদয় হল না মনে। সে চোখে এমন কিছু ছিল যা আমাকে সবই ভুলিয়ে দিলে। শুধু এইটুকু জ্ঞান রইল যে, ঐ চোখ যার, তার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। শুধু পরিচয়ই নয়—ওই চোখ যার সে আমার একান্ত আত্মজন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চাপা-গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, “অসুখ করেছে বুঝি আপনার ?”

উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় থাক তুমি ভাই ? কি কাজ-কর্ম কর ?”

ব্যস—গড়গড় করে বলতে সুরু করলাম। লেখাপড়া শিখতে পারি নি। কারণ শেখাবে কে ! কাজেই কাজ-কর্ম ভাল পাব কোথায় ? অগত্যা বার্ড কোম্পানীতে নাম লিখিয়ে ডকে কাজ করি। সব-দিক

জোটে না কাজ, থাকি সেই ভূকৈলাসে। গত দু'মাস একটি পয়সাও পাঠাতে পারি নি বাড়ীতে।

দুঃখের কাহিনী শোনাবার উপযুক্ত কান জুটলে মানুষ আত্মহারা হয়ে ব'কে যায়। মুশকিলের আসান হোক বা না হোক তাতে কিছুই যায় আসে না, সে আশা করেও সবসময় একজন অপরকে নিজের দুর্দশার ফিরিস্তি শোনাতে বসে না। অতশত বিবেচনার ফুরসতও হয় না। দৈবাৎ যদি তেমন সুরে কখনও কেউ ডাক দিয়ে বলে—"কেমন চলছে হে আজকাল?" তখন নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ হয় না। শুনিয়ে ফল কিছু হোক না হোক, অন্ততঃ হালকা হওয়া যায় অনেকটা। এ সুযোগই বা জীবনে ক'বার মেলে!

সেদিন সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের মাঝে অতি জীবন্ত চক্ষু দু'টিতে এমন একটি মৌন মিনতি ছিল যা তৎক্ষণাৎ খসিয়ে দিলে আমার মনের অতি ঠুনকো আগড়টা। ভুলিয়ে দিলে স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি ব্যাপারগুলো। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সব কিছু বলে গেলাম। কয়েকদিন আগে অর্ধেক রাত্রে এ বাড়ীতে চোরের মত ঢুকে চুপি চুপি যা যা খেয়ে গেছি, তা শোনাতেও ভুললাম না।

শুনতে শুনতে হঠাৎ তিনি একটু চেঁচিয়ে ডাক দিলেন—"দুরি, এধারে শুনে যাও একবার!"

চমকে উঠলাম কথার মাঝখানে আচমকা এভাবে বাধা পড়ায়। তৎক্ষণাৎ দরজার দিকে আওয়াজ হওয়ায় পিছন ফিরতে হল। তখনই প্রথম খেয়াল হল, যারা আমায় ধরে এনেছিল তারা দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে গেছে। দরজার শেকল খোলবার শব্দ পেলাম। একজন ঘরে ঢুকল। এবং তৎক্ষণাৎ জানি না কেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমি টপ করে নেমে দাঁড়ালাম বিছানা থেকে। দাঁড়িয়ে—বোকার মত নিশ্চয়েই—হাঁ করে চেয়ে রইলাম, ঘরে যে ঢুকল তার মুখের দিকে।

পেছনে যিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন, তিনি বললেন—"প্রণাম কর ভাই, তোমার বৌদি ইনি, দুরি বৌদি।"

তাঁর কথাটা শেষ হবার আগেই দুরি বৌদি এগিয়ে এসে আমার

হাতটা ধরে ফেললেন। অসম্ভব রকম ছেলেমানুষী শোনাল তাঁর গলা। বললেন—"বাঃ বেশ ত' তবে ওভাবে খালের ধারে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলে কেন?"

আমতা আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করেছিলাম। আমার কৈফিয়ত, মানে প্রথম কথাগুলো তিনি শুনলেনও না। আমাকে নীচু হয়ে প্রণামও করতে দিলেন না। হিড়হিড় করে টানতে টানতে অন্ধকার ঘর থেকে বার করে আনলেন। তাঁর কথাগুলিই তখন আমি শুনছি।

"কি লক্ষ্মীছাড়া চেহারা রে বাবা! কতকাল স্নান কর নি বল ত' ভাই? দরজায় এসে ওভাবে ইট পেতে বসে থাকতে হয়? মা গো মা, ওখানটায় সকলে নোংরা ফেলে যে! আঁস্তাকুড়ের মাঝখানে বসে আছ গ্যাঁট হয়ে, ছি ছি ছি ছি ছি—"

পেছন থেকে আবার শুনতে পেলাম সেই ধীর শান্ত নিরুদ্বেগ স্বর —"পেট ভরে খাইয়ে এখানে পাঠিয়ে দাও। আরও কিছু কথা আছে আমার।" ছুরি বৌদির টানের চোটে তখন পাশের ঘরে ঢুকে পড়েছি।

সন্ধ্যা হবার আগেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন। ছুরি বৌদি পরোটা আর ডিমের তরকারি খাইয়ে দিয়েছিলেন পেট ভরে। তাঁর ঘরে তখনও বসেছিল যম-সদৃশ তাঁর দু'টি ভাই, তারা আমার সঙ্গে একটিও কথা বলে নি। দু'জনে দু'খানা মোটা বই চোখের সামনে খুলে সেই আলো-আঁধারিতে মুখ বুজে এক কোণে বসে রইল। তাদের দিকে আড়-চোখে দু'একবার আমি তাকিয়েছিলাম। মনে হল, দুটো শিকারী কুকুর —ওত পেতে আছে। ভান করে আছে যেন কিছুই দেখছে না, শুনছে না। কিন্তু সামান্য মাত্র ইশারায় চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে পড়বে আমার ঘাড়ে, একটুও ইতস্তত করবে না।

ছুরি বৌদি তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জেলে পরোটা ভাজলেন। তরকারীটা করাই ছিল। আমার হাতে এক টুকরো সাবান দিয়ে আবার আমায় বাইরে নিয়ে এলেন। নিজে জল ঢেলে দিলেন আমার হাতে। কনুই পর্যন্ত

সাবান দিয়ে ধুইয়ে ছাড়লেন। তারপর ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। সব ব্যাপারটাই এমন সহজ ভাবে ঘটে গেল যে আমি টেরই পেলাম না। মানে ছুরি বৌদিকে যে সেদিনই প্রথম দেখলাম এটা ভুলেই গেলাম বেবাক। খেতে খেতে অনেক কথা হল। ছুরি বৌদিই অনবরত বকে গেলেন খলখল-কলকল করে। বললেন শেষে, রোয়াকের দিকের একটা ছোট্ট জানালা দেখিয়ে—"অন্ধকারে তোমরা আমায় দেখতে পেতে না। আমি ঐ জানলায় চোখ রেখে তোমাদের স্পষ্ট দেখতে পেতাম। আর ঘেন্নায় ওয়াক্ উঠে আসত। হোটেলের ঝি পাত কুড়িয়ে যা এনে দেয়—তাই তোমরা গেলো বসে বসে। ছি ছি ছি ছি ছি।"

কথার শেষে ছুরি বৌদির পাঁচটা করে ছি থাকবেই। ছি পাঁচটা নানান সুরে বেরোয় দেখলাম তাঁর গলা দিয়ে। সত্যিকারের ঘৃণায় কখনও বেরোয় হয়ত। কিন্তু আমি দেখলাম ছি ছি পাঁচটা প্রায়ই বেরচ্ছে কৌতুক মিশ্রিত হয়ে। মানে সব ব্যাপারই যেন ছুরি বৌদির কাছে নিছক মজার ব্যাপার। মজা পান বলেই তিনি ঐ ছি ছি ছি ছি ছি গুলো ও-ভাবে বলতে পারেন।

খাওয়া শেষ হলে আবার এ ঘরে এলাম। ছুরি বৌদিই নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। এনে বললেন—"দেখ ভাই, একটা কথা ভুল না কিন্তু, কেউ যদি জানতে পারে যে তুমি আমাদের চেন, কারও কাছে যদি গল্প কর আমাদের কথা, তাহলে তোমার এই দাদাকে আর বাঁচাতে পারব না। দেখছ ত' উনি শয্যাশায়ী, এখন একটু নড়াচড়া করতে গেলেই—" ছুরি বৌদির গলায় কথাটা আটকে গেল এমন ভাবে, যেন কে খপ করে তাঁর মুখটা চেপে ধরল।

শয্যাশায়ী দাদা অকপট প্রশান্ত সুরে বললেন—"না না, সে ভাবনা নেই আর তোমার। এ ভাইটি আমাদের মানুষের মত মানুষ। না খেতে পাওয়াটা যে কত বড় ব্যাপার, এ হাড়ে-হাড়ে জানে যে। ও কি কখনও নিজেকে ঠকাতে পারে। যাও তুমি, এবার আমাকে একটু চা দাও।"

টপ করে পেছন ফিরে ছুরি বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে বাইরে থেকে আবার শিকল দেবার আওয়াজ পেলাম।

কিন্তু শিকল নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেলাম না। দাদা ডাক দিলেন। বললেন—"এস ভাই, বোস এখানে, দু'টো কথা বলে নি এই ফাঁকে। চা আনলে তুমি যেও।"

বসলুম তাঁর পাশে। উল্লেখযোগ্য কথা একটিও হল না। দাদা বললেন—"মন-টন খারাপ হলে এখানে চলে এস। সন্ধ্যার পর এস না যেন। এই ঘরের দরজা ঠেলবে। এখানে যে আস, তা আর কোথাও গল্প করার দরকার কি? নিজেদের কথা পরকে শোনাতে যাবে কেন? আমাদের দুঃখ আমরাই সইব। আমাদেরই বইতে হবে আমাদের বেদনার বোঝা। পরকে বলে শুধু নিজেকে খানিক খেলো করা—"

খুবই হালকা ভাবে দাদা বলেছিলেন কথাগুলি, কথাগুলোর তেমন কোনও মূল্যই নেই যেন। কিন্তু কথা ক'টা আসন গেড়ে বসল আমার বুকের মধ্যে। ঐ কথা ক'টাই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিন সে ঘর থেকে। আমার সমস্ত রক্তের মধ্যে কি জানি কি করে মিশে গেল যে আমি এঁদের পর নই। নিজেদের কথা অন্য কাউকে বলব কেন? এত দামী আপনারজনের কথা কি কোথাও গল্প করতে আছে? ছি ছি ছি ছি ছি।

চা দুরি বৌদি আনেন নি। এনেছিল সেই ষণ্ডা দু'জনের এক জন।

দরজা খুলতেই দাদা বললেন—"এস ভাই আজ। তোমার কাজে যাওয়ার দেরি হয়ে যাবে আবার।"

সেদিন রাত্রে পোড়া জাহাজের পোড়া-পেট থেকে যে সব পোড়া-মাল নেমেছিল, তার হিসেব আমি ঠিক ভাবে রাখতে পেরেছিলাম কি না, তা সঠিক বলতে পারব না। খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে ক্রেনের তলায় দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম সারা রাত। কি স্বপ্ন দেখেছিলাম তাও ঠিক মনে নেই। হুড়হুড় গড়গড় করে ঠেলা-গাড়ীগুলো গুদমের ভেতরে যাওয়া-আসা করছিল আমার চার পাশ দিয়ে। জাহাজের ওপরে খোলের মুখে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম টিণ্ডেল বাঁশ-চেরা গলায় তালে তালে চেঁচাচ্ছিল 'আড়িয়া-হাবিস্', 'আড়িয়া-হাবিস্'। জাহাজের পেছনে গাধা-বোঠে ডেরিক মাল

নামিয়ে দিচ্ছিল অতি দ্রুত, অতি বিকট ঝট্ ঝট্ ঝট্ ঝট্ ঝড়াং আওয়াজ তুলে। তিন-তলা উঁচুতে ক্রেনের ঘরের মধ্যে বসে ড্রাইভার তুলসীরাম "কহেতুয়া কবীরাইয়া" ভাঁজছিল হেঁড়ে গলায়। সুপারভাইজার গার্দানী সাহেব তুমুল মুখখিস্তি করছিলেন সর্দারদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সবই ঠিকঠাক যথাযথ চলছিল, রোজ যেমন চলে থাকে ডকে। আমিই যেন কেমন বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়েছিলাম। কেমন যেন একটা ঘোর লেগেছিল আমার চোখে। জেগে দাঁড়িয়ে থেকেও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম।

যা কোনও দিন হয় নি, তাই হচ্ছিল। বাড়ার জন্যে বেশ মন কেমন করছিল তখন আমার। কয়েকটা টাকা, তা সে যত কমই হোক, বাড়ীতে পাঠান একান্ত উচিত। মা আর ছোট বোনটা ত' জানবে যে আমি তাদের ভুলে যাই নি। বোনটা টাকা যেতে দেখলে অযথা উত্তেজিত হয়ে পাড়াময় ছুটে বেড়াবে আর আমার নামে বড় বড় কথা বলে আসবে সকলকে, এ আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম। দশটা টাকা পাঠালেও মা তা থেকে ঠিক ষোল আনা কালীবাড়ীতে পুজো দেবে, এও নির্ঘাত জানতে পারছিলাম। তার সঙ্গে আলাদা দু'টো টাকা যদি ছোটঠাকুর্দা'কে পাঠাতে পারি, তাহলে তিনি টাকা দু'টো নিয়ে কি করবেন তাও বেশ বুঝতে পারছিলাম। টাকা দু'টো তিনি মাধু তেলীর মায়ের হাতে দিয়ে খাঁটী সরষের তেল কিনবেন বেগুন পোড়ায় মাখাবার জন্যে। দশ দশটা টাকা একসঙ্গে যেতে দেখলে গ্রামে যে কি সোরগোল উঠবে তা যেন আমি চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিলাম।

এ সপ্তাহটা পুরোপুরি কাজ চললে সাত দিনে মোট সাড়ে সতেরো টাকা পাব হাতে। সাড়ে সাতটা রেখে দশটা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেব বাড়ীতে। কাজ এবার সাত দিনই আছে। জলে-ভেজা, গাঁট-ছেঁড়া পাট নামানো সহজ কথা নয়। জাহাজের খোলের মধ্যে বড় বড় বাণ্ডিল বাঁধতে হচ্ছে, তবে পাট উঠে আসছে খোলের বাইরে। বিস্তর সময় লাগছে তাই। লাগুক, অন্ততঃ দশটা দিন আরও চলুক কাজটা, তাহলে অনেকটা সামলে নিতে পারব।

পাত-কুড়নো লুচি-পোলাও নাই বা খেতে পেলাম রাতে। ও জন্যে

আর একটুও মাথা-ব্যথা নেই আমার। মাঝে মধ্যে এক আধ দিন দুপুর বেলা যাব সেখানে। ছুরি বৌদি, দাদা আর সেই ষণ্ডা দু'টোকে দেখে আসব। কিছু একটা, যেমন ধর, কমলা, বেদানা বা এমনই কিছু হাতে করে নিয়ে গেলেই হবে। দাদার অসুখ যখন।

আচ্ছা, কি অসুখ ওঁর!

অসুখটা যাই হোক, ওভাবে দরজায় শিকল দিয়ে রাখছে কেন ওঁকে? আমাকেই বা খামকা ধরে নিয়ে গেল কেন হোঁতকা দুটো হঠাৎ।

ও রকম ভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে বললেই বা কি এমন দরকারী কথা আমায়!

সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, ও রকম একটা নোংরা জায়গায় ছুরি বৌদিকে নিয়ে থাকেনই বা কেন ওঁরা?

যদি ঐ নাকছাবিটা না থাকতো ছুরি বৌদির নাকে তাহলে ওঁকে ত' ভবানীপুর শ্যামবাজার বা যে কোনও ভদ্র পাড়ায় বেশ মানায়।

নাকছাবিটা আর ঐ লালে সবুজে মেশানো হতভাগা শাড়ীখানা। কি চোখ জ্বলুনে রঙ রে বাবা! শাড়ীর রঙের চোটে মানুষটার রঙও যেন লালে সবুজে মিশিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছে। ঐ শাড়ী আর ঐ নাকছাবি বাদ দিলে ছুরি বৌদিকে আমি সোজা আমাদের বাড়ীতে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে পারি। কি আর এমন হত তাতে? মা বলত, আমার বড় মেয়ে এল শ্বশুরবাড়ী থেকে। দিদিটা যদি ও-ভাবে না মরত বিয়ের আগে তাহলে নিশ্চয়ই সে মাঝে মাঝে আসত শ্বশুরবাড়ী থেকে। কি হত তাতে? হত কি? আরও টানাটানিতে চলত আমাদের সংসার। তা বলে দিদিকে ত' আর শ্বশুরবাড়ী থেকে অন্ততঃ বছরে একবার না আনলে চলত না। ছুরি বৌদি যদি রাজী হয় দেশে যেতে আর মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে ঐ নাকছাবি আর শাড়ী ছেড়ে, তাহলে চলে যাবেই এক রকম করে যখন ধানটা চালটা ঘরে আছে। বেশীর মধ্যে যা লাগবে তার জন্যে আমি ত' রইলুম। টালি ক্লার্ক যখন হচ্ছি মাঝে মাঝে, তখন টালি ক্লার্কের চাকরী একটা জুটেও যেতে পারে চিরকালের মত। তাহলে আর অভাবটা থাকে কোথায়?

কিন্তু ছুরি বৌদি কি যাবে ঐ রুগ্ন দাদাকে ছেড়ে? তখন দাদাকেও নিয়ে যেতে হবে জোর করে। কিন্তু রোগটা যে কি তা'ত ছাই এখনও জানা হয় নি আমার! কালই একবার যাব, ভাল করে জেনে-শুনে আসতে হবে সব। করতেই হবে কিছু একটা বিহিত ওদের, ও-ভাবে ঐ লক্ষ্মীছাড়া জায়গায় ছুরি বৌদিকে কিছুতে ফেলে রাখা যায় না আর। হলই বা দাদার অসুখ, অসুখ হয়েছে বলেই মানুষকে ওখানে গিয়ে উঠতে হবে নাকি বৌ নিয়ে। যত সব—

আচম্বিতে জাহাজের ওধারে বহু মানুষ প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। ক্রেন, ডেরিক, ঠেলাগাড়ী, গালমন্দ সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে বজ্রাঘাতের মত বিকট একটা আওয়াজ হল। সে আওয়াজটা ডুবিয়ে হাহাকার করে উঠল সকলে। মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল সব। যে যেখানে যেভাবে ছিল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছুটলাম! সবাই ছুটল হাতের কাজ ফেলে। ছুটতে হল জাহাজটার ডগা থেকে লেজ পর্যন্ত। ব্যাপারটা ঘটেছে ওধারের শেষ ক্রেনটায়। জাহাজের শেষ হ্যাচ থেকে লোহা নামানো হচ্ছিল। পঁচিশ ত্রিশ ফুট লম্বা গণ্ডা পাঁচেক লোহার এঙ্গেলের এক মাথায় লোহার চেন জড়ানো হয় জাহাজের খোলের মধ্যে। চেরা কাঠ দু'তিনটে হাতুড়ি পিটিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয় সেই চেন জড়ানো লোহাগুলোর মধ্যে। নয়ত টাইট হয় না। তারপর 'হাবিস'। হ্যাচের মুখে জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে টিণ্ডেল আকাশের দিকে হাত তুলে আঙ্গুল ঘোরাতে থাকে। ক্রেন ড্রাইভার ঠেলা দেয় তার হাতলে। আস্তে আস্তে ত্রিশ ফুট লম্বা লোহার ঝাঁটা জাহাজের খোল থেকে বেরিয়ে সোজা আকাশে উঠে যায়। ক্রেন ঘোরে ডাঙার দিকে সেই ঝাঁটা নিয়ে। তখন ডাঙ্গার টিণ্ডেল দু'খানা কাঁচি গাড়ী আর লোকজন নিয়ে তৈরী হয় সেই মাল নেবার জন্যে। 'আড়িয়া আড়িয়া' হাঁক দেয় ডাঙ্গার টিণ্ডেল, যখন সে দেখে ক্রেনের মাথা কাঁচি গাড়ী দু'খানার ওপর এসে পৌঁছেচে। আর একটা হাতলে ঠেলা দেয় ক্রেন ড্রাইভার। নামতে থাকে মাল। নীচের মানুষের নাগালের মধ্যে এলে তারা নীচের মাথাটা ধরে ঠেলতে ঠেলতে এক ধারে নিয়ে যায়। সেই ঝাঁটা তখন কাঁচির মধ্যে

পড়েছে। কাঁচি গাড়ী দু'টোকে ঠিক জায়গায় ঠেলে ধরে রাখতে হয়, পাছে একদিক ভারী হয়ে উলটে পড়ে। সব ঠিকঠাক হলে আবার—'আড়িয়া' শোনা যায়। ক্রেন ড্রাইভার শেষ বারের মত চেপে ধরে তার যন্ত্র। সেই লোহার ঝাঁটা তখন স্থির হয়ে শুয়ে পড়ে কাঁচি গাড়ীর মধ্যে।

কিন্তু আকাশে যখন ঝুলতে থাকে সেই শয়তানের ঝাঁটা, তখন যদি সেই নিরীহ কাঠের টুকুরো দু'খানা পিছলে যায় লোহার শিকলের প্যাঁচ থেকে, তাহলে কি ফল দাঁড়ায় ?

যা হয়, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলে অতি বড় দামাল দস্যুরও দাঁতে দাঁত লেগে যাবে!

দূর থেকে দেখতে পেলাম। পুলিশে আর গুর্খায় ঘিরে ফেলেছে জায়গাটা। দমকলের মানুষ এসে গেছে তাদের হালকা কুড়ুল নিয়ে। একজন সাদা সাহেব হুকুম দিলেন কুড়ুল চালাবার। দু'টো লোক দু'দিক থেকে কুড়ুল চালাতে লাগল। একখানা এঙ্গেল একটা মানুষের ডান কাঁধের ভেতর দিয়ে ঢুকে বাঁ কোমরের নীচু দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কাজেই কুড়ুল চালিয়ে লোকটার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত চিরে ফেলে তবে তাকে ছাড়িয়ে আনতে হল।

তৎক্ষণাৎ হোস-পাইপ দিয়ে ধুয়ে ফেলা হল জায়গাটা। গোটা সাতেক মানুষকে হাসপাতালের গাড়ীতে ঢোকান হল। তাদের মধ্যে অনেকেরই চোট লাগে নি, দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল দৃশ্যটি দেখে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মত বন্ধ রইল কাজ। তারপর "আড়িয়া হাবিস" "হাবিস আড়িয়া" চলতে লাগল নিয়ম মাফিক।

গার্দানী সাহেব তাঁর টেবিলের ভেতর থেকে ছোট্ট একটি বোতল বার করে নিজের গলায় উবুড় করলেন এবং তার নিজস্ব বাবু ক'জনকে ডেকে বললেন—"গো, ইউ হুরামিকো বাচ্চা-লোক, ঘর চলা যাও আভি। ড্যাম উইথ্ ইয়োর টালি বিজনেস্।"

অসময়ে ছুটি পেয়ে গেলাম। যে লোকটার কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত কুড়ুল চালিয়ে চিরতে হল—তার ওপর কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল। জোরসে পা চালালাম ভূকৈলাসের দিকে রাত দু'টোর সময়।

গোটা তিনেক গুদম পার হয়ে এলাম কোনও দিকে না চেয়ে। সব ক'টাতে জাহাজ আছে, কাজ হচ্ছে। তার পরের গুদামটা বন্ধ, জাহাজ একখানা দাঁড়িয়ে আছে বটে গুদামের সামনে—তবে কাজ হচ্ছে না। আলো নেই, লোকজনও নেই কেউ ডাঙ্গায়। দু'একটা নেপালী গার্ড এধার থেকে ওধারে হাঁটছে মন্থর গতিতে। জাহাজটা খালি হয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। গ্যাঙ্-ওয়ে, মানে জাহাজে ওঠার সিঁড়ি এমন ভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে যে সেটা দিয়ে জাহাজে ওঠা-নামার চিন্তা করাও যায় না। জাহাজ যত বোঝাই হবে ততই ডুববে জলের মধ্যে। অনেকটা না ডুবলে ও গ্যাঙ্-ওয়ে সাধারণ মানুষে ব্যবহার করতে পারে না। খালাসী সারেংরা পারে আর পারে জাহাজের সাহেবরা, যাদের নাম সেলার। তারা মদ খেয়ে চুর হয়েও ওঠা-নামা করে ঐ রকম গ্যাঙ্-ওয়ে দিয়ে।

ঘুমন্ত জাহাজটার গ্যাঙ্-ওয়ের সামনে পেঁ।ছে শুনতে পেলাম কি রকম যেন একটা গোলমাল হচ্ছে গ্যাঙ্-ওয়ের মাথায় জাহাজের ডেকে। মাতালের হৈ-হৈ-হল্লা শুনলাম, তার সঙ্গে কানে গেল কান্নার শব্দ। কান্নাটা মেয়েলী গলার। থমকে দাঁড়িয়ে আরও একটু কান পেতে শুনলাম। গোটা কতক সেলার এক সঙ্গে স্ফূর্তি করছে, আর গোটা কতক মেয়ে কাঁদছে—মানে কাকুতি মিনতি করছে। নীচে থেকে ব্যাপারটা দেখা গেল না। এক পাশে একটা ক্রেনের তলায় অন্ধকারে দাঁড়ালাম।

খানিক পরেই আবার শোনা গেল একটা মেয়েলী গলার চাপা আর্তনাদ। মনে হল যেন তার মুখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। তারপর রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে দেখতে লাগলাম একটা অমানুষিক কাণ্ড। গ্যাঙ্-ওয়েতে কোনও ধাপ থাকে না। এক হাত অন্তর আড়াই ইঞ্চি পুরু একখানা করে কাঠ পেরেক দিয়ে আটকানো থাকে। সেই কাঠে পা আটকে এক পাশের লোহার পাইপ ধরে ওঠা-নামা করতে হয়। সেই ধাপ-হীন গ্যাঙ্-ওয়ে দিয়ে বুকে সাড়ী বেঁধে শুধু সায়া পরা একটা মেয়েমানুষকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ওপর থেকে। শাড়ীখানা শেষ পর্যন্ত পেঁ।ছল না। জাহাজের ওপর যারা ধরেছিল তারা ছেড়ে ছিল। মেয়েমানুষটা প্রায় আট-দশ হাত

ওপর থেকে গ্যাঙ্-ওয়ের গা বেয়ে পিছলে এসে ধপাস করে পড়ল নীচে। ডেকের ওপর কতকগুলো মাতাল অট্টহাস্য করে উঠল।

নীচে যে পড়ল তার দিকে নজর দেবার অবকাশ পেলাম না। ততক্ষণে ওপরে আর একজনকে ঐ ভাবে নামাবার তোড়জোড় সুরু হয়েছে। সেটার বোধহয় মুখ বাঁধাতে পারে নি, কাজেই চিলের মত চেঁচাচ্ছে। চেঁচালে কি হবে, তাকেও ঠেলে ফেলা হল ওপর থেকে সেইভাবে শাড়ীতে বেঁধে। ঠিক অর্ধেকটা গ্যাঙ্-ওয়ে পর্যন্ত পৌঁছে সে লাগল ঝুলতে। মাতালগুলোর বোধহয় সখ হল খানিক ঝুলিয়ে রেখে মজা দেখার। অর্ধেক গ্যাঙ্-ওয়েতে একটা প্রাণী ঝুলছে—আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে কোন মাতালের না স্ফূর্তি হয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ স্ফূর্তি করার ফুরসত মিলল না তাদের। হঠাৎ আমার কানের কাছে কে বললে—"ওয়াট্—মাই ঘড্!" মুখ ফিরিয়ে দেখলাম গোমেশ। গোমেশ বলল—"ধরত আমার জামাটা।" বলে শার্টটা মাথা গলিয়ে খুলে আমার কাঁধে ফেলে দিয়ে খালি গায়ে ছুটল। গ্যাঙ্-ওয়ের ডান ধারের রেলিংটা ডান হাতে ধরে তরতর করে উঠে গেল ওপরে। ঝুলন্ত মেয়েমানুষটার কাছাকাছি পৌঁছতেই ওপরের তারা দিল শাড়ী ছেড়ে। মেয়েমানুষটা নীচে এসে পড়ল। গোমেশ গুঁড়ি মেরে উঠে গেল ওপরে। ওপরে তখন শোনা যাচ্ছে মাতালদের অট্টহাসি। সেই অট্টহাসির মধ্যেই একটা লোক ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গ্যাঙ্-ওয়ের ওপর। তারপর তিনটে ঠক্কর খেয়ে ঠিকরে গিয়ে পড়ল গ্যাঙ-ওয়ে থেকে সাত হাত দূরে। তার পেছনেই আর একটা লোক ঠিক ঐ ভাবে এসে আছড়ে পড়ল নীচে। পর মুহূর্তে শিকারী কুকুরের মত গোমেশ তীরবেগে নেমে এল। আমার কাছে পৌঁছবার আগেই বলল—"দৌড় এবার।" প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম তার পিছুতে। গোটা কতক রেললাইন টপকে পাহাড় প্রমাণ কয়লার পেছনে গিয়ে পৌঁছলাম। গোমেশ বলল—"সাবধান, মাথা নীচু করে আয়। এই গাড়ীগুলো পার হয়ে যাই।" এক সার নয়, কয়েক সার মাল-গাড়ীর তলা দিয়ে হামাগুড়ি দিলাম। আরও অনেকটা মুখ বুজে ছুটতে হল। শেষে দেখি কাঁটাপুকুরের ভেতর

পৌঁছে গেছি। তখন ধীরে সুস্থে রাত-চৌকিদারদের নজর এড়িয়ে কাঁটাপুকুরের লম্বা লম্বা গুদমের আড়াল দিয়ে অন্ধকারে হাঁটতে লাগলাম। মাঝখানে গোমেশ একবার আমার কানের কাছে মুখ দিয়ে বললে—"খুব সাবধান ভাই, শালারা কেউ দেখতে পেলে গুলি করবে। আমি ইশারা করলেই টপ করে শুয়ে পড়বি।"

বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। চললাম মুখ টিপে ওর পাশে পাশে। কাঁটাপুকুরের শেষ গুদমটা শেষ হল। রাজবাড়ীর গড়ের মধ্যে যখন নামলাম দু'জনে, তখন পূবের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে।

নেপেনদা' জেগে ছিল। হাঁটছিল ঘরের সামনে। দূর থেকে হেঁকে বললে—"তাহলে অক্কা পাস নি এ যাত্রা।" কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। খপ্ করে আমার চুলের মুঠি ধরে বার কতক ঝাঁকানি দিলে সজোরে। দিতে দিতে বললে—"ফের যদি কখনও টালি করতে যাবি ত' ছিঁড়ে ফেলব মাথাটা। শালার পয়সার মুখে লাগাই ঝাড়ু। ক্রেনের তলায় দাঁড়িয়ে খাতায় পেন্সিল ঘষার মজা টের পাবি যেদিন ক্রেন ছিঁড়ে এক গাদা মাল পড়বে ঘাড়ের ওপর, চিঁড়ে-চেপটা হয়ে যাবি শালার পয়সার জন্য। ওর চেয়ে ঢের ভাল বাবা গুদমে ছুটোছুটি করে মাল সাজিয়ে রাখা।"

জড়িয়ে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল আমাদের দু'জনকে। জামা খুলিয়ে ভাল করে দেখে নিলে যে সত্যিই আমি চোট খাই নি। তারপর ঘরের কোণের উনুনে কাঠ জ্বেলে চায়ের জল গরম করতে বসল।

তখন আমি শুনলাম যে কয়েকটা মানুষ রাত্রেই পালিয়ে এসেছিল ভূকৈলাসে—ডকের সেই দুর্ঘটনার পর। তাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে গোমেশ ছুটেছিল আমার খোঁজে। তার পরে যা ঘটল আর একটা জাহাজের সামনে, সে ঘটনাটুকু নেপেনদা'কে তখন শোনালাম আমরা। শুনে নেপেনদা' রায় দিলে—"বেশ করেছিস দু'শালাকে নিকেশ করে। কাল আর কেউ যাস্ নি ডকে। শুয়ে ঘুম মার কষে ঘরের ভেতর। হালচালটা জেনে আসব আমি আগে।"

চা খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম দু'জনে। ঘুম যখন ভাঙল আমার, তখন রাজবাড়ীর পেটা ঘড়িতে দিনের এগারো ঘা পড়ল। জেগে উঠে গোমেশকে দেখতে পেলাম না। মনে করলাম, বোধহয় স্নানটান করতে গেছে।

আধ ঘণ্টা কাটল। গোটা তিনেক বিড়ি শেষ হয়ে গেল পুড়ে। বিরক্ত হয়ে উঠলাম গোমেশটার ওপর। গেল কোথায়, গোঁয়ার গোবিন্দটা! কাজে চলে গেল নাকি আবার ঘুম থেকে উঠে! না ব্রেক-ফাষ্ট করতে গিয়ে কাফিখানায় বসে 'ডিস্‌ঘাসটিং' ঝাড়ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! নেপেনদা'র কথা ঠেলে ডকে যাবে, এ ত' বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে গেল কোথায় সাহেবের সুমুন্দী!

চমকে উঠলাম, ঢং ঢং শব্দ শুনে। পেটা ঘড়িতে বার ঘা পড়ল। শুনে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। এবার আমারও স্নান করা দরকার। কিছু খাওয়ার জোগাড়ও করতে হবে। এধার ওধার চেয়ে দেখলাম, গোমেশের পাত্তা নেই। তখন চললাম শিবপুকুরে। স্নানটা ত' করে নি আগে।

আপাদ-মস্তক বোরকা ঢাকা দেওয়া এক মূর্তি ছোলেমান সাহেবের ছোট মেয়েটার হাত ধরে সামনে এসে দাঁড়াল পথ জুড়ে। চাপা গলায় বললে—"পালা, এখুনি পালা, গোমেশকে ধরেছে রাস্তায়। রাজবাড়ীর ভেতর ঢোকবার জন্যে ম্যানেজারবাবুর কাছে হুকুম নিতে গেছে। আমি ছোলেমানের ঘরে লুকিয়ে ছিলাম।" এইটুকু বলেই সটান সেই মেয়ের হাত ধরে আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ঘরের দিকে চেয়ে। এক মিনিট পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে একটা বস্তা হাতে করে। বস্তার পেট বেশ মোটা। বুঝলাম সবই যাচ্ছে আমাদের ঐ বস্তায়। পাশ দিয়ে যাবার সময় বোরকার ভেতর থেকে একটা হাত বেরিয়ে আমার গায়ে একটা জামা ফেলে দিলে। বললে—"পকেটে কয়েকটা টাকা আছে। সোজা শেয়ালদা গিয়ে গাড়ীতে ওঠ আগে। যা—" বলেই এক হাতে বস্তা ঝুলিয়ে আর এক হাতে মেয়েটার হাত ধরে ছোলেমানের বউয়ের মতই একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল

গেটের দিকে। জানি না কে আমায় বুদ্ধি দিলে বুকের ভেতর বসে, আমি উল্টো দিকে শিব মন্দিরের পেছনের বাগানের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

তারপর কোথা দিয়ে কি ভাবে যে বেরিয়ে গিয়েছিলাম গড়ের বাইরে তা ঠিক বলতে পারব না। পালানো ব্যাপারটার মধ্যে শুধু যে বুক ধড়ফড়ানি আর দুঃখভোগ থাকে, এ মনে করা ভুল। ঐ দুটো ত' থাকেই, তার সঙ্গে আর একটা এমন বস্তু থাকে যার মাদকতা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। যে পালাচ্ছে আর যারা তাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে—এই উভয় পক্ষের মধ্যে থাকে দারুণ রেষারেষি। খানিকটা বুক ধড়ফড়ানি, খানিকটা কষ্টভোগ সহ্য হবার পর পলাতকের মনে জন্মায় একটা জিদ্। ধরা পড়লে লাঞ্ছনা শাস্তি—ইত্যাদি যা যা ভোগ করতে হবে তার হিসেব ভুলে গিয়ে পলাতকের মনে তখন হার-জিতের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। ওটাকে অনেকটা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিও বলা চলে। আচ্ছা, ধরুক দেখি কোন ব্যাটা ধরতে পারে আমায়—এই জাতের একটা মজা করার মত মর্জিতে পেয়ে বসে তখন।

সেই মজায় পাওয়া পলাতক সেদিন যখন খিদিরপুরের পুলটা দ্বিতীয়বার পেরিয়ে এপারেই আবার ফিরে এল, তখন তার মনে মাত্র একটি চিন্তাই ছিল। চিন্তাটি হচ্ছে—শিয়ালদায় গাড়ী চড়বার আগে ছুরি বৌদিকে একটিবার মাত্র দেখে যাওয়া। আলিপুরের চিড়িয়াখানার দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে আলিপুরের পুলটা পার হবার সময় খালের দিকে চেয়ে হঠাৎ মাথায় এসে গেল খেয়ালটা। পুল পার হয়ে ওপারে গেলাম, তারপর ঘুরলাম বাঁ দিকে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের ধার দিয়ে হেঁটে এসে উঠলাম খিদিরপুরের পুলে। আবার পুল পার হয়ে পৌছলাম রামধন পালের দোকানের সামনে। দোকানের পাশ দিয়ে নেমে গেলাম মুন্সিগঞ্জে। ফিরে আসা, খিদিরপুরের পুল আর একবার ডিঙানো এবং মুন্সিগঞ্জে ঢোকা এতটা সময়ের মধ্যে একটি বারের জন্যেও বুক টিপটিপ করল না, বা এধার-ওধার দেখবার প্রয়োজন বোধ হল না। খেয়ালও হয় নি একবার যে পেছনে কেউ তাড়া করে আসছে। একটি মাত্র চিন্তা, না চিন্তা ঠিক নয়, একখানি মাত্র মুখ আগাগোড়া আমার চোখের ওপর

ভেসে ছিল। দুটি চোখ আমি বরাবর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। চোখ দুটিতে কৌতুক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কানে শুনছি অদ্ভুত একটা সুর—ছি-ছি-ছি-ছি-ছি। আমার পালাবার কারণটা শুনলে দুরি বৌদির চোখ দুটি ভয়ানক রকম হেসে উঠবে মজায় আর মুখ দিয়ে অপরূপ সুরে বেরুবে ছি-ছি-ছি-ছি-ছি। সেই চোখ দুটির হাসি আর সেই ছি-ছি-ছি-ছি-ছি আর একটিবার শোনার লোভেই সেদিন সব ভুলে গিয়ে মুন্সিগঞ্জে আবার ঢুকে পড়লাম।

গোঁ ভরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলে দেখি কয়েক হাত সামনেই দুই লাল পাগড়ির সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট এগিয়ে আসছে। তারা কেন আসছিল তা জানবার মোটেই প্রয়োজন হল না আমার। টপ করে ডান ধারে ঘুরে ঢুকে পড়লাম একরাশ কাদা মাখা বাঁশের ভেতর। বাঁশগুলো ডিঙ্গিয়ে খালে গিয়ে নামতে তিন মিনিটও লাগল না। জলে জলে এগিয়ে চললাম পশ্চিম দিকে। আশা ছিল ঠিক চিনতে পারব দুরি বৌদিদের ঘরটা। বারবার বাঁ দিকের উঁচু পাড় লক্ষ্য করতে করতে এগিয়ে চলেছি। অদ্ভুত কাণ্ড! সব পাড়টাই জল থেকে এক রকম দেখাচ্ছে। বেজায়গায় উঠে উঁকি দিতে সাহস হল না। শেষে দেখি পৌঁছে গেছি হেষ্টিংস পুলের কাছাকাছি। তখন আবার সেই ভাবে ফিরে চললাম জলে জলে।

খানিকটা এগিয়ে নজরে পড়ল একখানা খুব লম্বা আর খুব সরু মেছো নৌকা। একটু আগে যাবার সময় কিন্তু দেখি নি নৌকাখানা। যেতে হলে নৌকাটার পাশ দিয়ে যেতে হয়। যাওয়া উচিত কি-না, তাই ভাবতে লাগলাম কোমর জলে দাঁড়িয়ে। কয়লার মত রঙ, আদুর গা, লাল টকটকে গামছা কাঁধে একজন বেরিয়ে এল ছইয়ের ভেতর থেকে হাতে একটা চামড়ার সুটকেশ নিয়ে। বেরিয়ে এসে এধার-ওধার চাইতেই নজর পড়ল আমার ওপর। তৎক্ষণাৎ টপ করে নীচু হয়ে ঢুকে পড়ল আবার ছইয়ের ভেতর। একটু পরে খুব জোয়ান, খুব চওড়া সেই রকম কালো আধ বুড়ো গোছের একজন বেরিয়ে এল। নৌকার পাশ থেকে একখানা লম্বা লগি টেনে বার করলে। তারপর একটি খোঁচায় নৌকা এসে দাঁড়াল ঠিক

আমার পাশে। নিমেষের মধ্যে ঘটল ঘটনাটা, কোন দিক নড়বার সুযোগই পেলাম না। নিমেষের জন্যে যেন দেখলাম লোকটার হাতের লগিখানা উঠল আকাশের দিকে তারপর সব আঁধার হয়ে গেল।

সেদিন এই মাথাটায় লগির ঘা দেবার পর যদি নৌকা ছেড়ে চলে যেত তারা তাদের কাজটুকু সেরে, তাহলে এ কাহিনী লেখার আর সুযোগই হত না আমার, দরকারও হত না। কিন্তু কি জানি কার ইঙ্গিতে সুন্দরবনের সেই নমঃশূদ্র মেছোরা আমায় জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে পেঁ ৗছে দিয়েছিল এমন এক জায়গায়, এমন একজনের জিম্মায় রেখে গিয়েছিল আমায় তারা—যে হুঁশ ফিরে পেয়ে প্রথমেই যা দেখলাম তাতে পরম তৃপ্তিতে আবার আমার চোখের পাতা বুজে এল। পরম শান্তিতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও-পাশ ফিরে শুয়ে আবার চোখ বুজলাম।

কানে গেল—"দেখ, জ্ঞান হয়েছে, পাশ ফিরে শু'ল।"

"ভাল করে জ্ঞান হয় নি এখনও। চোটটা বেশ জোরেই লেগেছে। আর একটু ব্র্যাণ্ডি দাও।"

তাড়াতাড়ি এ-পাশ ফিরে চোখ চেয়ে বহু কষ্টে বললাম—"না, বেশ সেরে গেছি।"

শুরু হল সেই হাসি। খিলখিল করে নয়, কলকল করে উঠল ছুরি বৌদির গলা, যেন এত বড় মজা জীবনে আর তিনি দেখেন নি। এক রাশ কথা এক সঙ্গে বলে গেলেন—"বেশ করেছ, সেরে গেছ। তা ঠিক দুপুরে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে খালের ভেতর করছিলে কি শুনি? ওখানে এসে জুটেছিলে কখন? বলতেই হবে তোমায় সব, বল কি হয়েছিল! পাজী ছেলে কোথাকার—ছি ছি ছি ছি ছি—"

দাদা বললেন—"আঃ, থাক না এখন, আগে একটু ব্র্যাণ্ডি আর দুধ খাওয়াও।"

হাতের কাছেই তৈরী ছিল সব। ছুরি বৌদি একটা গেলাস ধরলেন আমার মুখের কাছে। বহু কষ্টে মাথাটা তুলে সেটুকু খেলাম। নিজের

আঁচল দিয়েই মনে হল, আমার মুখ মুছিয়ে নিয়ে তিনি নেমে গেলেন তক্তপোষের ওপর থেকে।

তখন নজর করে দেখলাম, মানে তখনই প্রথম টের পেলাম যে হুরি বৌদি ফর্সা ধবধবে একখানা কাপড় পরে আছেন, নাকে সেই উল্কি নাক-ছাবিটাও নেই, সেই রকম বিশ্রী করে কপালে চুল নামিয়ে চুলও বাঁধেন নি তিনি এবং আর একটি অতি বদখত জিনিষও দেখতে পেলাম না তাঁর মুখের ওপর, মানে কপালের সেই মস্ত বড় কালো রঙের টিপটা। তার বদলে এক রাশ কালো কুচকুচে চুল গলার দু'পাশ দিয়ে এসে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর। দুধ, ব্র্যাণ্ডি খেতে খেতেই এ-সব আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু লক্ষ্য করা আর নজরে পড়া দুটো আলাদা ব্যাপার! হুরি বৌদি তক্তপোষ থেকে নেমে যাবার পর যা লক্ষ্য করেছিলাম তা নজরে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ একেবারে ঠিক করে ফেললাম যে এ বেশে হুরি বৌদিকে সোজা নিয়ে গিয়ে তোলা যায় আমার মায়ের কাছে। মা বলবেন, তাঁর বড় মেয়ে এল শ্বশুরবাড়ী থেকে। বেশ হবে।

হয়ত আরও অনেক কিছুই মনে মনে তৈরী করেছিলাম সেই ফাঁকে, আরও অনেক দূর পর্যন্ত হয়ত এগিয়ে যেতাম মনে মনে, যদি না দাদা সেই সময় কথা বলে উঠতেন।

"খামকা মারটা খেতে গেলি ভাই। ও-রকম অবস্থায় জলের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলে সন্দেহ ত' হবেই মানুষের।"

শুনে বহু কষ্টে মুখ ঘুরিয়ে মাথার দিকে চাইলাম। দাদার সেই অদ্ভুত চোখ দু'টির সঙ্গে চোখ মিলল। কিন্তু এ কি! সেই রুগ্ন মুখ, সেই চুল দাড়ির জঙ্গল গেল কোথায়? চোখ দু'টি না দেখলে আর গলার আওয়াজ না শুনলে চিন্তেই পারতাম না দাদাকে। কিন্তু একটা রাত্রির ভেতর অমন রোগটা সেরে গেল কি করে! বড় বেশী রকম সুস্থ দেখাচ্ছে যে ওঁকে। কস্মিনকালেও এ মানুষের কোনও অসুখ করেছিল, তা'ত মনে হচ্ছে না!

চকচক করছে চওড়া কপালটা, অনেক খাড়া তীক্ষ্ণ একটি নাক; নাকের দু'ধারে টানাটানা চোখ দু'টি, পরস্পর মেশানো টেপা ঠোঁট দু'খানি, সরু

থুৎনিটা—সব মিলিয়ে সেই লম্বা ধাঁচের মুখখানিতে রোগ, আলস্য, জড়তা, দুর্বলতা বা বোকামির চিহ্ন মাত্র নেই। রোগ ত' দূরের কথা, ঐ মুখ যে কখনও কোনও কারণে অপ্রস্তুত হতে পারে তা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না। দেখলেই মনে হয়, যত রকমের ঝড় ঝাপটা বিপদাপদ আসুক না কেন, ঐ মুখে, ঐ চাউনিতে আর ঐ স্থির নিস্পৃহ নিষ্কম্প গলার আওয়াজে ধাক্কা খেয়ে ফিরবেই। কোন কারণেই কখনও ও মুখের কোথাও কোঁচকাবে না একটু। অনেকক্ষণ ওঁর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম—"মিছিমিছি ওরা মারলেই বা কেন আমায়?"

"মিছিমিছি তুমি দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন ওখানে?"

"মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকব কেন! জানেন না ত' কি বিপদে পড়েছি কাল রাত থেকে। আমাকে ধরবে বলে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরতে পারলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। গোমেশটার যে কি হয়েছে এতক্ষণে—" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলাম। কথা বলার সত্যিই শক্তি ছিল না তখন।

মিনিট দুই চুপ করে রইলেন দাদা। বুঝতে পারলাম তাঁর হাত এসে পড়ল আমার মাথার ওপর। আমার চুলের মধ্যে তাঁর আঙ্গুলগুলো চলতে লাগল। সেই নিঃশব্দ আঙ্গুল চালনা অনেক কিছুই জানিয়ে দিলে আমাকে। সর্বাগ্রে এই কথাটাই ভাল করে বুঝিয়ে দিলে যে, কোনও পুলিশের সাধ্য নেই দাদার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাবার। আর একটা কথা-ও বললে সেই আঙ্গুলগুলো খুব চুপি চুপি, যে এরপর থেকে আর আমি একা নই। ডকে বার্ড কোম্পানীর টিণ্ডেলগিরি করি বলে অন্য যে কেউ ছোট ভাবে ভাবুক—এঁরা তা ভাবেন না। আপনার মানুষ গরীব বলে তাকে ছোটলোক ভাববার লোক নন এঁরা।

আরও অনেকক্ষণ পরে যেন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন কথাটা সেই সুরে বললেন দাদা—"কত নম্বরে যেন তোমার সেই আগুনলাগা জাহাজটা কাজ করছে?"

গুদমের নম্বরটা বললাম। দাদা একটু উঁচু গলায় ডাক দিলেন—"হুরি!"

বৌদি সাড়া দেবার আগেই বললেন যা বলার—"বানোয়ারীলালকে খবর পাঠাও ত' একবার! দোকান বন্ধ করে আসে না যেন।"

পাশের ঘর থেকে জবাব এল—"আচ্ছা।"

চুপ করে পড়ে রইলাম। চুলের মধ্যে আঙুল চলতে লাগল সমানে। আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না তিনি।

প্রায় মিনিট দশেক পরে বৌদির গলা শুনলাম। বললেন—"সে এসেছে।"

দাদা উঠে গেলেন আমার মাথার কাছ থেকে। দরজা খোলার শব্দও শুনলাম। তারপর আর কিছুই শুনতে পাই নি। দুর্বলতার জন্যেই হক, বা ক্লান্তির জন্যেই হক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলাম।

সকালে ঘুম ভাঙল ছুরি বৌদির ছি ছি শুনতে শুনতে। বকেই যাচ্ছেন তিনি সমানে। চোখ খোলবার আগেই কানে গেল—"ছি ছি ছি ছি ছি —এত ঘুমতেও মানুষ পারে রে বাবা! এই ছেলে আবার চাকরি করে খায়। সাহেব ঠেঙিয়ে এসে এখন আরামে নাক ডাকাচ্ছে ঘরে শুয়ে। কি যে হবে এদের, তাই ভেবে মরি। ছি ছি ছি ছি ছি!"

দু'বার দু'রকম সুরের ছি ছি শুনে চোখ খুললাম। ঘরের ভেতর দু' ফালি রোদ এসে পড়েছে ছোট জানালা দুটো দিয়ে। তখন মনে পড়ল, এর আগে যখন একটু হুঁশ হয়েছিল তখন কি দেখেছিলাম, কি বলেছিলাম। খেয়াল হল যে ঘরে আলো জ্বলছিল তখন। দাদার মুখখানাও মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি মাথার দিকে তাকালাম। মাথার কাছটা ফাঁকা। তাকালাম ছুরি বৌদির দিকে। তিনি মশারি তুলছেন।

দেখেই পিত্তি জ্বলে উঠল। সেই কালো টিপটা, সেই সবুজ নাকছাবিটা, আর সেই চক্ষুশূল-রঙের শাড়ীখানা সব ঠিক আছে। শুধু চুলটা তখনও সেই রকম বিশ্রী ভাবে কপালের ওপর নামিয়ে বাঁধবার সময় পান নি।

কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে।

"আবার তুমি ওইগুলো পরে বেড়াচ্ছ ?"

মশারি তোলা থামিয়ে বৌদি থতমত খেয়ে একটু চেয়ে রইলেন আমার চোখের দিকে। তারপর সেই মজার হাসি চকচকিয়ে উঠল তাঁর চোখ দু'টিতে। বললেন—"কি পরে আসতে হবে শুনি তবে ?"

ঝাঁঝালো গলার জবাব দিলাম—"কেন, কাল রাতে যা পরেছিলে, সেই সাদা কাপড়খানা গেল কোথায় ? ঐ টিপটা, আর ঐ নাকছাবিটা কে পরতে বলেছে তোমায় ? ছিঃ !"

গোটা পাঁচেক ছি ছি বললেই ছিল ভাল। কিন্তু মাত্র একটা ছি বেরল মুখ থেকে।

দুরি বৌদির মুখ থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল পাঁচ-পাঁচটা ছি ছি ছি ছি ছি।

হাসিতে কাঁপতে লাগলেন তিনি একেবারে।

"ছি ছি ছি ছি ছি, ওমা কি ঘেন্নার কথা গো ! এতটুকু ছেলের কাছ থেকে মতামত নিতে হবে কি পরব না-পরব। ছি ছি ছি ছি ছি।"

রাগে জ্বলে উঠল পিত্তি—মুখ ফিরিয়ে নিলাম ওধারে।

হঠাৎ বৌদির হাসি গেল উবে। সত্যিই যেন উবে গেল তাঁর গলার সেই ছলছল কলকল সুর। খুব শান্ত গলায় খুবই যেন ভাবতে ভাবতে তিনি বললেন—"এ সব পরে থাকলে কি মনে হয় ভাই তোমার ?"

এধারে মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলাম—"সে কথা জেনে আপনার লাভ ? আমি যখন ছোট ছেলে, আমার মতামতের দাম কি ?"

"কিন্তু ভাল কাপড়-চোপড় পরে থাকলে যে আমার চলে না ভাই, যার পাঁচটা দুরন্ত ভাই আছে তোমার মত, তাকে ত' সব সামলে চলতে হবে। তোমরা খুনোখুনি করে এলে তোমাদের লুকিয়ে রাখতে হয় যে আমাকে। আমি যে তোমাদের দিদি, তোমাদের দুরি বৌদি যে আমি। আমার ভদ্দরলোক সেজে থাকা পোষায় কি করে বল ?"

শুনতে শুনতে কখন যে উঠে বসেছি তা টের পাই নি। উঠে বসে হাঁ করে চেয়ে আছি দুরি বৌদির মুখের দিকে। সেই কালো টিপ, সেই নাকছাবি, সেই শাড়ী সবই ঠিক আছে। শুধু বদলে গেছে মানুষটা।

খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে আসল জাত-সাপটা। ফোঁসফোঁসানি নেই, ফণা ধরার দরকারই করে না, এই অবস্থাতেই এতটুকু উত্তেজিত না হয়ে এই সাপ ছোবলাতে পারে চক্ষের নিমেষে, ঢেলে দিতে পারে কালকূট। তারপর নীলে নীল হয়ে যায় যাকে ছোবল মারে, অন্য কোনও রঙের খেলা চলতেই পারে না এর সঙ্গে। একমাত্র নীল রঙ ছাড়া।

বিছানা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাই আমি আরও দু'টো ব্যাপার লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। কথা বলতে বলতে ধক করে জ্বলে উঠেছিল নীল আলো তাঁর দুই চোখে, আর কপালের ওপর দাঁড়িয়ে উঠেছিল একটা নীল শিরা সোজা হয়ে। দেখে আতঙ্কে ছেয়ে গিয়েছিল আমার মন—যা-তা বকে মরেছিলাম তোতলাতে তোতলাতে।

"না না বৌদি, যা পরে থাকেন তাতেই বেশ মানায় আপনাকে—"

মাত্র দু'টি মুহূর্ত লাগল আপনাকে সামলে নিতে হুরি বৌদির। তারপরই আবার উছলে উঠল ছি ছি ছি ছি ছি তাঁর গলায়।

ছি ছি ছি ছি ছি—ওমা তুমি বলতে বলতে আবার আপনি আরম্ভ হল যে! মাথায় এক ঘা খেয়েই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ভাই। ছি ছি ছি ছি ছি।"

ব্যস্—হুরি বৌদিকে ষোল আনা মজায় পেয়ে বসল আবার। হাঁ করে চেয়ে রইলাম মুখের দিকে। কোনটা বৌদির আসল রূপ তা ভেবে পেলাম না।

"নাও, এখন ওঠ, নাম বিছানা ছেড়ে। আর একটা সাহেব ঠেঙিয়ে এসে, আবার না হয় ঘুমিও দু'দিন ধরে—"

এবার সত্যিই গেলাম চটে। বললাম—"কে বললে যে আমি সাহেব ঠেঙিয়ে এসেছি?"

নেহাৎ ভাল মানুষের মত হুরি বৌদি বললেন—"কে আবার বলবে, সাহেবরাই বলেছে পোর্ট পুলিশের কাছে যে, তোমরা দু'জনে চুরি করতে উঠেছিলে জাহাজে। সাক্ষী দিয়েছে সেই মেয়েমানুষগুলো যাদের দুরবস্থা দেখে তোমরা মরিয়া হয়ে উঠেছিলে—"

প্রায় চিৎকার করে উঠলাম—"তারা সাক্ষী দিলে! যাদের

জানোয়ারের মত ঝুলিয়ে ওরা স্ফূর্তি করছিল তারা দিলে সাক্ষী ওদের হয়ে ?"

আস্তে আস্তে সবটুকু তরলতা উবে গেল ছুরি বৌদির গলা থেকে। খুব সাদা গলায় তিনি বলতে লাগলেন—"তারা দেবে না ত' কি আমি গিয়ে সাক্ষী দেব! কি আপদ—সাহেবরা হল ওদের খদ্দের। ওদের দেশ কোথায় জান ? সেই রাজস্থান থেকে ওরা এসেছে কলকাতায়, ওদের দেশে ওদের পোড়া-পেটের দানা জোটে না। ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে রাজা-মহারাজারা লাট-বেলাটদের সঙ্গে নেচে বেড়ায়। পুরুষগুলো জন মজুর খাটে বড়লোকদের দরজায়, তাতে তাদেরই পেট চলে না। তাই ওরা চলে এসেছে ঘর বাড়ী ছেড়ে। রাতের অন্ধকারে মা-মাসী-মেয়ে সবাই এক সঙ্গে জাহাজে ওঠে। তাও আবার যা রোজগার করে, তার সবটা পায় নাকি নিজেরা! অর্ধেকটা নেয় ঠিকাদারে। জাহাজের ঠিকাদারই আমদানী করে কি না ওদের। তোমরা গিয়েছিলে ওদের রোজগারে বাধা দিতে, কাজেই ওরা ক্ষেপে গেছে তোমাদের ওপর।"

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এর মধ্যে এত কথা আপনি জানলেন কি করে! তারা আমাদের চিনতে পারল কেমন করে!"

গল্প বলার মত বলে গেলেন বৌদি—"আমি জানতে পারলাম দাদার কাছ থেকে। কাল রাতেই দাদা এ সব খবর জানতে পেরেছেন। ভোর বেলা তিনি বেরিয়েছেন তোমার সেই বন্ধু গোমেশকে খুঁজতে। হতভাগা ছোঁড়াটা কেন যে, তার মার্কামারা বার্ড কোম্পানীর জুতো জোড়া রেখে গেল ক্রেনের তলায় তা সে-ই জানে। ঐ বার্ড কোম্পানীর জুতো, বার্ড কোম্পানীই দেয় তাদের ফিরিঙ্গী সাহেবদের। তোমার বন্ধু ঐ পুরনো জুতো জোড়া বাগিয়েছিল আর এক সাহেবের কাছ থেকে মাত্র একটা টাকা দিয়ে। পুলিশ ঐ জুতোর জন্যে তোমার বন্ধুকে ধরে ফেলে কাফিখানায়। পুলিশ অবশ্য তার গায়ে হাত দেয় নি। সন্ধ্যে পর্যন্ত বন্ধ রেখে রাতে জাহাজে তুলে দিয়ে আসে সেই মাতাল সেলারদের হাতে। তারা সারারাত ওকে নিয়ে স্ফূর্তি করে শেষে ওর দেহটা কোথায় যে ফেলে দিয়েছে, তাই এখন খুঁজছেন তোমার দাদা—"

একান্ত সাদা গলায় সব বলে গেলেন বৌদি, যেন এ রকম ব্যাপার হামেশা হলেও ওঁর কিছুমাত্র যায় আসে না। শুনতে শুনতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। পুলিশ গোমেশকে জাহাজে দিয়ে এসেছে সেই নরপশুদের হাতে! তার মানে—

আর ভাবতে পারলাম না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বোধহয় ফুঁপিয়ে কেঁদেই উঠেছিলাম।

ছুরি বৌদির গলায় আবার সেই মজার সুর বেজে উঠল—"আরে কাঁদতে বসলে যে! ছি ছি ছি ছি ছি—এ্যাঁ—পুরুষ মানুষ না তুমি? আর পুলিশ ত' তোমায় খুঁজছে না। মিছিমিছি শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছ।"

বাইরে কে গলা খাঁকারি দিলে। চাপা গলায় দরজার ওধার থেকে কে বললে—"দিদিজী—"

ছুরি বৌদি গিয়ে দরজা একটু ফাঁক করলেন। একখানি কাগজ নিলেন সেই ফাঁক দিয়ে। জানালার কাছে সরে এসে আধ মিনিটের মধ্যে পড়ে ফেললেন যা লেখা ছিল তাতে। আরও গম্ভীর শোনাল তাঁর গলা—"তোমার বন্ধুকে পাওয়া গেছে ডকের একটা খালি মালগাড়ীর ভেতর। চল, এখনই বেরতে হবে আমাদের।"—বলে আবার গেলেন দরজার কাছে। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি বললেন শুনতে পেলাম না। পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম, বাইরে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে চলে গেল।

বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়লাম। গোমেশ কই? এধার ওধার তাকাতে লাগলাম। কই গোমেশ! বিছানায় যাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, তার মুখের দিকে একটিবার মাত্র চেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে গোমেশকে খুঁজতে লাগলাম ঘরটার চারিদিকে।

যে মানুষটা বিছানায় পড়ে আছে তার মুখখানাই শুধু দেখা যাচ্ছে, যদি অবশ্য সেই বীভৎস মাংসপিণ্ডটাকে মানুষের মুখ বলা চলে। নাক নেই, চোখ দু'টো নেই, ঠোঁট দু'খানাও নেই বললেই চলে। এমন অসম্ভব রকম ফুলে গেছে মুখখানা যে চোখ দু'টো গেছে বুজে, নাকটা থেবড়ে

গেছে, বা গাল ছ'টো, ঠোঁট ছ'খানা অস্বাভাবিক ফোলার দরুণ নাকটার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে দেখবার প্রবৃত্তি হল না সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। গোমেশ কই! তবে যে এরা বললে গোমেশ এই ঘরেই আছে?

খুট্ করে আওয়াজ হল পেছনে। ফিরে চাইলাম। ঘরে ঢুকলেন যিনি তাঁর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে না থেকে পারে না কেউ। লোকটির ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটার রূপই যেন বদলে গেল। সাদা চুল, সাদা দাড়ি—কপালের ওপর এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পর পর তিনটে সাদা চন্দনের রেখা, গলায় এক গোছা রুদ্রাক্ষ আর স্ফটিকের মালা, গাওয়া-ঘি রঙের দীর্ঘ দেহ, ছুধে গরদ পরনে সেই মূর্তি ঘরে ঢুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। দাঁড়ালেন এসে কদর্যমুখ বেহুঁস জীবটার মাথার কাছে।

তাঁর হাত ছ'টি এতক্ষণ পেছনে ছিল, এবার সামনে আনলেন। সোনার ফ্রেমের চশমা ছিল হাতে। চশমা চোখে দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে দেখতে লাগলেন সেই কুৎসিত মুখটা। দেখতে দেখতে প্রায় চুপি চুপি যেন নিজেকেই নিজে বললেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্ঞান হবে। তারা—মা ব্রহ্মময়ী—"

তারপর থেমে থেমে যেন বেশ ভেবে চিন্তে একই সুরে বলতে লাগলেন—"পাতাগুলো বেটে একটু পুরু করে লাগিয়ে দাও চোখে-মুখে-নাকে। জ্ঞান হলে একটা বড়ি খাইয়ে দিও আতপ চাল ভেজানো জলের সঙ্গে মেড়ে। মলদ্বার বেশী ফুলে থাকলে ডুশ দেবার চেষ্টা করে কাজ নেই। মলম পাঠিয়ে দিচ্ছি, বার ছ'তিন লাগিয়ে দিও। সন্ধ্যে পর্যন্ত যদি প্রস্রাব না হয় তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।"

আমার পেছন থেকে কে বললে—"জ্ঞান হলে খাওয়াব কি?"

ঝট্ করে চাইলাম পেছন দিকে এবং ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। সেই হোঁৎকা ছ'জন, যারা আমায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল খালের ধার থেকে প্রথম দিন। কেঁপে উঠল বুকের ভেতরটা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার তাকাতে হল সামনের দিকে। কান গেল—"ঐ বড়ি আর আতপ চালের জল ছাড়া কিছুই খাওয়াবে না। খাবে কে? মলদ্বার, মলনালী পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব ফুলে গেছে। মা তারা—ব্রহ্মময়ী—"

চশমাটা খুললেন, হাত দু'খানা আবার পেছন দিকে এক করলেন, তারপর সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। হোঁৎকা দু'জনের একজন গেল তাঁর পিছু পিছু। আর একজন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, "তাহলে আপনি এখন নিচে যান দাদা। বৌদি আছেন, একটু চা-টা খেয়ে আসুন।"

দেখতে হোঁৎকা হলে কি হয়, গলার আওয়াজ নেহাত ভদ্রলোকের ছেলের মত। একটু সাহস পেয়ে বললাম, "কিন্তু গোমেশ কই! আমি যে শুনে এলাম গোমেশ এখানে আছে!"

কাঠ গোঁয়ার মূর্তির ভেতর থেকে অন্য মানুষ একজন বেরিয়ে এল। লোহার মত একখানা হাত এসে পড়ল আমার কাঁধের ওপর। শক্ত করে ধরল আমার একটা কাঁধ। চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "সাবধান, চেঁচাবেন না, একটু আওয়াজ হলে ও হার্টফেল করবে। ঐ আপনার বন্ধু—সাবধান—"

না, চেঁচাই নি আমি, একটুও আওয়াজ বেরোয় নি আমার মুখ দিয়ে শুধু দু'হাতে চেপে ধরেছিলাম নিজের মুখটা। তারপর সেই লোহার হাতটা আমাকে টেনে এনেছিল দরজার কাছে। দরজা খুলে ঘর থেকে বার করে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। আর আমি দু'হাতে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে রইলাম বন্ধ দরজার সামনে।

ওই গোমেশ!

দুরি বৌদির কথাগুলো, সেই যে একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে গল্প বলার ঢঙে তিনি শুনিয়েছিলেন—সারা রাত স্ফূর্তি করে শেষে ওর দেহটা কোথায় যে ফেলে দিয়েছে—সেই কথাগুলো, সারা রাতের স্ফূর্তির ফল চাক্ষুষ দেখে—ভয়ে নয়, গোমেশের ওপর মায়াতেও নয়, শুধু ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলাম। গোমেশের অমন সুন্দর কোঁকড়ানো চুল তাও প্রায় গেছে—ছিঁড়ে উপড়ে ফেলা হয়েছে ওর মাথা থেকে। মুখ থেকে হাত সরিয়ে খামচে ধরলাম নিজের মাথার দু'দিকের চুল। নিজেই টানতে লাগলাম প্রাণপণে। ছিঁড়ে এল না একটাও, তখন কামড়ে ধরলাম ডান হাতের পেছনটা। তাতেও বেরোল না এক ফোঁটা রক্ত। তখন মরিয়া হয়ে

ছুটলাম। তরতর করে নেমে গেলাম সেই বাড়ী থেকে। শুনতে পেলাম দোতলা থেকে ছুরি বৌদি ডাকলেন। পেছন ফিরে তাকালামও না। বাড়ী থেকে বেরিয়েই বাঁ-ধারে ঘাট-বাঁধানো পুকুর। যাবার সময় লক্ষ্য করেছিলাম পুকুরটা। তারপরই রাস্তা। বাগানের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা। একবারও চিন্তা করলাম না ডান ধারে, না বাঁ-ধারে ঘুরব। এক ধারে ঘুরে ছুটতে লাগলাম। কঞ্চিতে লেগে কাপড় ছিঁড়ল, পা ফালা ফালা হয়ে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। এক সময় দেখি বেরিয়ে এসেছি বাগান থেকে, গরুর গাড়ী চলা, দাঁত বার-করা এক রাস্তায় থামতে হল। এ কি হল! খালটা গেল কোথায়? এইমাত্র যে ঘাটটায় পার হলাম সে ঘাটটাই বা কই! সামনেই এক মন্দির, পাশে একখানা দোকান। বাঁশের বেড়া, খড়ের চাল। দোকানের সামনে বাঁশের বেঞ্চি। বেঞ্চিতে বসে একজন লোক বিড়ি টানছে। তার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ জায়গায়টার নাম কি? ও মন্দির কার!"

বিড়িটা মুখ থেকে না নামিয়ে জবাব দিল সে—"আজ্ঞে বাবু, ওটা করুণাময়ীর মন্দির,—এ জায়গাটাকে পুঁটুরে বলে।

ধমকে উঠলাম তাকে—"তাহলে খালটা গেল কোথায়? যে খালটা খিদিরপুর থেকে কালীঘাট হয়ে এখানে এসেছে।"

বিড়িটা তখনও মুখ থেকে নামাল না মানুষটা! সেইভাবে একেবারে নেহাৎ চাষার মত জবাব দিলে—"আজ্ঞে যান না বাবু, ঐ মন্দিরের ধার দিয়ে নেমে যান। খাল পাবেন। কিন্তু খালে কি আর জল পাবেন এখন? তার চেয়ে এই বাগানের ভেতরে ঘাট বাঁধানো পুকুর আছে বাবুদের—"

আর কান দিলাম না তার কথায়। লোকটা মনে করেছে আমি স্নান-টান করতে চাই। তাই বললে ঘাট বাঁধানো পুকুরের কথা। গোল্লায় যাক ওর ঘাট বাঁধানো পুকুর। করুণাময়ীর মন্দির ঘুরে আরও খানিকটা উঁচু-নীচু জমি, তারপর খাল। নামলাম গিয়ে খালে, ভাটা আরম্ভ হয়ে গেছে তখন। আমরা জোয়ারে এসেছি। যাক্, এই খাল ধরে ভাটার সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলেই পাব কালীঘাট। কালীঘাট থেকে খিদিরপুর পৌঁছব ট্রামে। ব্যাস আর পথ ভুলের সম্ভাবনা নেই।

পা চালালাম। কয়েক পা এগিয়ে বুঝতে পারলাম সহজ নয় এ ভাবে কালীঘাট পৌঁছনো। দিন পাঁচ সাত লাগবে এ ভাবে কাদার ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে গেলে। আবার মাঝে মাঝে নালা দিয়ে জল এসে পড়ছে খালে। সে নালাগুলো পার হবার জন্যে খালের ভেতরে গিয়ে নামতে হয়। অগত্যা আবার উঠতে হল পাড়ের ওপর। উঠতেই আবার দেখা হয়ে গেল সেই বিড়িমুখো কোঁচার খুঁট জড়ানো চাষার সঙ্গে। দেখা হতেই সে হেসে ফেললে। হাড় বার-করা মুখ, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ দাড়ি, গোটা কতক চুল মাথার মাঝখানে, মস্ত বড় 'ব'-এর মত একটা হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে লম্বা গলা থেকে, একেবারে হাড়-লক্ষ্মীছাড়া চেহারা মানুষটার। সেই মুখের হাসি বোঝা গেল শুধু তার ময়লা দাঁতগুলো দেখে। দাঁতগুলো যেমন লম্বা তেমনি কালো। বিড়িটি কিন্তু ঠিক আছে দাঁতের ফাঁকে। জিজ্ঞাসা করলে—

"বাবু মশায়ের যাওয়া হবেন কোথায়?"

ততক্ষণে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে আমার মাথা। ঠাণ্ডা গলায় বললাম —"যাব কালীঘাট। কোন রাস্তায় গেলে সোজা হবে বলতে পার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আর পারব না কেন বাবুমশাই। এ দেশেই আমাদের জন্ম-কম্ম। তাই ত' আপনাদের মত ভদ্দর লোকে আমাদের দোক্নো বলেন। তা আসুন না, রাস্তা ধরিয়ে দিচ্ছি আজ্ঞে।"

মিনিট তিনেক পরে আবার এসে উঠলাম সেই দাঁত বার-করা রাস্তায়। লোকটা তখন বেশ করে বুঝিয়ে দিলে—"চলে যান এই পথ ধরে সোজা। দু'ধারে ধানের কল দেখবেন। তারপর ডান দিকে ঘুরলেই পুল। এই খাল পার হবেন। তারপর একটু হাঁটলেই ট্রাম পাবেন। যে ট্রাম টালিগঞ্জ থেকে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে তাতে চেপে বসবেন। তারপর বাবুমশায়ের কালীঘাট পৌঁছতে আর কতটা সময় লাগবে।"—বলে আবার সেই নোংরা দাঁতগুলো দেখিয়ে দিলে।

ধন্যবাদ দূরে থাক, একটা মিষ্টি কথাও শোনালাম না লোকটাকে। তৎক্ষণাৎ পা চালালাম। বেহদ্দ চাষাটা দাঁড়িয়ে রইল, না, কোন দিকে চলে গেল তা ফিরেও দেখলাম না।

অনেকটা এগিয়ে গিয়ে পেছনে শুনলাম সাইকেলের ঘণ্টা। পাশ দিয়ে ঠোকর খেতে খেতে সাইকেল চালিয়ে এক রুগ্ন কাবুলিওয়ালা চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে পার হলুম পুল। আরও খানিকটা পথ কাদা আর গরুর গাড়ীর মাঝখান দিয়ে চলে পেলাম ট্রাম-রাস্তা। উঠলাম পেছনের গাড়ীতে। ট্রাম ছেড়ে দিতে মনে হল যেন সেই রুগ্ন কাবুলিওয়ালাটা দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠল সামনের গাড়ীতে।

সোজা ফিরে যাব ভূকৈলাসে। নিশ্চয়ই নেপেনদা' এখন বাসায় আছে। তারপর দু'জনে যাব সেই জাহাজে। জাহাজখানা মাল বোঝাই করবে নিশ্চয়ই। কাজেই আরও সাত আট দিন সময় পাওয়া যাবে। কিছুতেই জাহাজের সেই জানোয়ারদের এক জনকেও ফিরতে দেব না দেশে। নেপেনদা'কে একবার পাওয়া দরকার। নেপেনদা'কে চাই আগে। যুদ্ধে গিয়েছিল সেই মেসোপটেমিয়ায়। নেপেনদা' ঠিক পারবে। শুধু তাকে বলতে হবে গোমেশের অবস্থাটা। ব্যাস—

রাজাদের কোচোয়ান ছোলেমান ছায়েব খান্দানী আদমী। আমরা ছিলাম তাঁর প্রজা, তাঁর একান্ত আশ্রিত জীব। আমাদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের জন্যে তিনি ছিলেন অনেকটা দায়ী। ছায়েব একটু বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। ও বয়সে ঘর সংসার করতে গেলে ওটা সেটা দাওয়াই-তাবিজ লাগেই। দাওয়াই-তাবিজ, জড়ি-বুটি সমস্ত ব্যাপারে নেপেনদা' ছিল এলেমদার মানুষ। ছোলেমান ছায়েব নেপেনদা'কে বিশ্বাস করতেন। তাঁর বিবিও খুব খাতির করতেন। গড়ের ভেতর কোচোয়ানদের ঘরে থাকলে বিবির ইজ্জত থাকবে না, এই জন্যে বিবি নিয়ে গড়ের বাইরে গৃহস্থ পাড়ায় খোলার ঘরে সংসার পেতেছিলেন ছোলেমান ছায়েব। সেখানে একখানা ঘরের মাঝখানে বেড়া দিয়ে সদর মহল, জেনানা মহলও বানিয়েছিলেন। নেপেনদা'র জেনানা মহলে ঢোকার অধিকার ছিল। আমরা গেলে সদর-মহলেও উঠতে পেতাম না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা সেরে ফিরে আসতে হত।

নেপেনদা'র খোঁজে ছোলেমান ছায়েবের দরজায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। "বাপজান ঘরে নেই"—বললে তাঁর চার বছরের মেয়েটি। শুনে ফিরলাম। কয়েক পা যেতে পেছনের কাপড়ে টান পড়ল। ফিরে দেখি ছোট মেয়েটি হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে যা বললে, তা থেকে বুঝলাম আমায় ফিরে যেতে হবে। আশ্চর্য হয়ে ফিরলাম আবার এবং সেই প্রথম বেড়ার এ পাশে ছোলেমান ছায়েবের সদর মহলে ঢুকে বসতে পেলাম। শুধু তাই নয়, বেড়ার ওপাশ থেকে গলা খাটো করে বিবি ছায়েব কথায় বললেন। বললেন—"চা খান, ছায়েব আসা পর্যন্ত বসুন। আপনি বা গোমেশ যদি আসেন তাহলে আপনাদের বসিয়ে রাখতে হবে এই হুকুম দিয়ে গেছেন ছায়েব।"

সুতরাং চেপে বসলাম খাটিয়ার ওপর। ছোট মেয়েটি একখানা সানকিতে মুড়ি আর পিঁয়াজ-কুঁচো দিয়ে গেল। চায়ের বাটিটা নিজেই হাত বাড়িয়ে বেড়ার এধারে রাখলেন বিবি ছায়েব। চা-মুড়ি খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। সেই ভোর বেলা একবার চা খেয়েছিলাম, চা খেয়েই বেরিয়ে ছিলাম ছুরি বৌদির সঙ্গে। তারপর এখন পর্যন্ত মুখে আর জল পড়ে নি।

বসে থাকতে থাকতে ঢুলিনি এসে গেল। ঢুলতে ঢুলতে দেখি গোমেশ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। দাঁড়িয়ে বললে—"এখানে বসে ঢুলছিস আর আমি তোকে খুঁজছি সারা দিনটা—ডিস্‌ঘাসটিং।"—বলেই এক খেবড়া থুতু ফেললে ঠিক আমার পাশে। পাছে থুতুটা আমার গায়ে পড়ে এই ভয়ে ঝট করে সরে বসতে গেলাম। ঢুলুনিটা ছুটে গেল। চোখ চেয়ে দেখলাম মুখের খুব কাছেই ছোলেমান ছায়েবের মোগলাই দাড়ি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"ছালাম আলেকুম।"

ছোলেমান 'আলেকুম ছালাম' বলতেও ভুলে গেল। দু'হাতে আমার মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে বিজবিজ করে আল্লার দোয়া প্রার্থনা করতে লাগল।

সুরু হল খানদানী কায়দায় আদর আপ্যায়ন। হোটেল থেকে ভাত এল, মাংস এল, চাপাটি এল, মেঠাই এল। মেঝের ওপর মাদুর পেতে তার ওপর চাদর বিছিয়ে খেতে বসতে হল। যতবার জিজ্ঞাসা করলাম

নেপেনদা'র কথা, ছোলেমান এক উত্তর দিলে—"হবে, হবে, ঠিক সময়ে নিয়ে যাব আমি তার কাছে। খোদার দোয়ায় যখন তোমায় ফিরে পেয়েছি, তখন সেই ফিরিঙ্গী ছোকরাকেও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ওস্তাদ মরিয়া হয়ে উঠেছে সেই ফিরিঙ্গীটার জন্যে। আমরা ভেবেছিলাম যে দেশে চলে গেছ তুমি। তুমি যখন হঠাৎ ফিরে এলে সেও ঠিক ফিরবে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?" ওস্তাদ মানে নেপেনদা'। ছোলেমান নেপেনদা'কে খাতির করে ওস্তাদ বলে।

কাজেই ব্যস্ত হলাম না। খানদানী চালচলনে ব্যস্ততা নিষিদ্ধ। কিন্তু গোমেশের সংবাদটা চেপে গেলাম। শোনাতে গেলে ছুরি বৌদিদের কথাও এসে পড়বে। ওঁরা, মানে ছুরি বৌদিরা ত' বলেই দিয়েছেন যে ওঁদের কথা যেন পাঁচ কানে না যায়। পাঁচ কানে অবশ্য আমিও বলতে যাচ্ছি না, কিন্তু নেপেনদা'কে ত' বলতেই হবে গোমেশ কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে। যারা গোমেশের ওই অবস্থার জন্যে দায়ী, তাদের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে যে। জাহাজ ছেড়ে যাবার আগেই করতে হবে ব্যবস্থাটা। নেপেনদা' ঠিক পারবে। নেপেনদা'র সঙ্গে দেখাটা একবার হলে হয়।

দেখা হল আরও খানিক রাতে। নেপেনদা' ফিরে এল তিন জন মার্কা মারা সারেং সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে। রঙ-বেরঙের লুঙ্গি, গোলাপী গেঞ্জি, ফুল-তোলা পাতলা পাঞ্জাবি আর ভয়ানক খুব্‌সুরত গলায় বাঁধা সিল্কের রুমাল দেখে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম যে সবে মাত্র 'সফর কেমিয়ে' ফিরেছেন তাঁরা। আমাকে দেখে নেপেনদা' চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"তাহলে পালাস নি তুই এখনও! যাক্ ভালই হল—"

বললাম—"গোমেশ এখন কোথায়, তুমি জান নেপেনদা'?"

নেপেনদা' বললে—"জানি, বহু কষ্টে এঁরা এনেছেন সেই খবর। সেই জাহাজেই এঁরা কাজ করেন। পুলিশ গোমেশকে ধরে জাহাজে তুলে দিয়ে আসে। সারা রাত সেই শুয়োররা তাকে নিয়ে স্ফুর্তি করে। স্ফুর্তির চোটে গোমেশ মরেছে, দেহটা ওরা লুকিয়ে রেখেছে। ডকের

জলে ফেলবার সাহস নেই। ডকের জলে ভেসে উঠতে পারে বা ডুবুরী লাগিয়ে তুলতে পারে। তারা চেষ্টায় আছে লোকটাকে জাহাজের বয়লারে ঢুকিয়ে দেবার। তা যদি না পারে, জাহাজ গঙ্গায় বেরলে তখন জলে ফেলে দেবে।”

শুনতে শুনতে গলার কাছে ঠেলে এল অনেকগুলো কথা। বলতে পারলাম না কিছুই। সারেং তিনজন এবং ছোলেমান সামনেই রয়েছে।

বলবার দরকারও হল না আর। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। সারেং সাহেবরা কিছু মাল এনেছেন, সেটা যদি উপযুক্ত মূল্যে তাঁরা বেচতে পারেন তাহলে তাঁরাই সেলার ক'টার জন্যে যা করা দরকার, তা করতে রাজী আছেন। দর-দস্তুর ঠিক হয়ে গেল মালের। একটি হোমিওপ্যাথি শিশিতে মালের নমুনা দিলেন সারেং সাহেবরা। ছোলেমান সেটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, মাল যদি পছন্দ হয় এক ঘণ্টার মধ্যে টাকা নিয়ে আসছে।

যাবার সময় ছোলেমান বোধহয় হোটেলে বলে গিয়েছিল। হোটেলের ছোঁড়া চা আর শিক্-কাবাব দিয়ে গেল! নেপেনদা' সে সমস্ত ছুঁলেও না।—একটার পর একটা বিড়ি টানতে লাগল। সারেং সাহেবেরা খেলেন। খেয়ে সস্তা সিগারেট পোড়াতে লাগলেন।

এক ঘণ্টা লাগল না, ছোলেমান ফিরে এল। নগদ দু'শ টাকা গুণে দিলে তাদের। বললে—“মাল সব দিয়ে বাকী টাকাটা কাল এই সময় নেবেন। কিন্তু আগে আমরা জানতে চাই যে সেই হারামী-বাচ্ছাদের জন্যে কি ব্যবস্থা করছেন আপনারা?”

খোদার দোয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে, জানিয়ে তাঁরা বিদেয় নিলেন। নেপেনদা'কে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। নেপেনদা' ছোলেমানকে বলে গেল আমার শোবার বন্দোবস্ত করতে। আমায় বলে গেল যে, সে না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন এক পা না নড়ি। সে রাত্রিটা ছোলেমানের গেরস্ত-পাড়াতেই থাকতে হল আমাকে। ছোলেমান তার বাইরের মহলের খাটিয়ার ওপর আমায় শোয়ালে। নিজে গেল বেড়ার ওপাশে অন্দর-মহলে শুতে।

শুয়ে ভাবতে লাগলাম সেই মালের কথা। একটি ছোট হোমিওপ্যাথি শিশিতে কি এমন জিনিষ ওরা দেখালে যার জন্যে অগ্রিম দু'শটা টাকা জুটিয়ে আনলে ছোলেমান! এত সহজে যে এমন মহামূল্য জিনিষ বিক্রি হয় তা ত' জানতাম না। দু'শ টাকা বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলে ওদের হাতে, কিন্তু কাল যদি ওরা মাল না আনে। কি জানি কি ব্যাপার! নেপেনদা' ফিরলে ভাল করে জেনে নিতে হবে।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙল নেপেনদা'র ডাকাডাকিতে। চোখ মেলতেই বললে —"চ' শীগগির, বহুত কাজ আজ। সন্ধ্যের ভেতর সব জোগাড় করা চাই।"

উঠে দেখলাম ছোলেমান বাইরের বারান্দায় সরু মাদুর পেতে নেমাজ পড়ছে। তার জন্যে নেপেনদা' অপেক্ষা করলে না। আমায় টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সারাটা দিন কাটল ঘোরাঘুরি করে। মনসাতলা লেনের এক স্যাকরার দোকান থেকে চার বোতল ভরতি কি কিনলে নেপেনদা' একশো টাকা দিয়ে। বোতল ক'টা আমাকেই পৌঁছে দিতে হল ছোলেমানের বাড়ীতে। দিয়ে আবার গিয়ে জুটলাম নেপেনদা'র সঙ্গে ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের এক কাফিখানায়। সেখানে সেই সারেং সাহেবদের দু'জনকে দেখলাম। তারপর আমরা গেলাম এক জাপানী মেমসাহেবের বাড়ী। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কিছু পরামর্শ হল সেই জাপানী মেমসাহেব আর তার খানসামাটীর সঙ্গে। কি পরামর্শ হল আমি শুনতে পেলাম না। আমাকে বসিয়ে রাখা হল বাইরের বারান্দায়। এই সব কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ফিরে গেলাম ছোলেমানের বাড়ীতে।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই আবার আমরা ফিরে এলাম। ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট তখন গমগম করছে। আলো, লোকজন, ফিটন গাড়ীতে মাতাল সেলার, অদ্ভুত রকমের সাজানো সাইকেলে সপ্ত-সফর-কেমানো ছারেং ছায়েবরা, চিক টাঙানো টিনের ঘরের দরজার সামনে বেতের মোড়ার ওপর বসে থাকা রঙমাখা চট্টগ্রামী বিবি সাহেবরা, জাপানী মেমসাহেবদের লতাপাতা

ঘেরা গেটে কোমরে ফেটি জড়ানো সাদা পুতুলের মত বেঁটে বেঁটে জাপানী মেয়েরা—সব মিলিয়ে জায়গাটাকে একটা মস্ত বড় মেলার মত মনে হচ্ছে। ভিড় ঠেলে খুব সাবধানে একটা বেতের টুকরি হাতে নিয়ে ছোলেমান আগে আগে চলল। টুকরিটাকে সে এভাবে সামলে নিয়ে চলল যেন একটুকুও ধাক্কা না লাগে কোনও কিছুর সঙ্গে। টুকরিটার ভেতর কি এমন জিনিষ আছে যা অত সাবধানে নিয়ে যাওয়া দরকার—তাই ভাবতে ভাবতে আমি চললাম নেপেনদা'র পাশে পাশে।

ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট দিয়ে আমরা বাঁ-পাশে ঘুরে জগন্নাথ সরকার লেনে ঢুকলাম। একটু গিয়েই খান তিনেক বাড়ীর পরে একটা টিনের দোতলা। দোতলায় উঠতে হল কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির মাথায় একজন নিঃশব্দে বেতের টুকরিটা নিলে ছোলেমানের হাত থেকে। আমাদের নিয়ে গিয়ে বসাল একটা ঘরে। ঘরে আরও কয়েকজন লোক বসে ছিল। খুব মিটমিটে আলোয় তাদের মুখ দেখতে পেলাম না ভাল করে। তখন সেই টুকরির ঢাকনা খুলে ফেললে সেই লোকটি। একটি একটি করে লোক উঠে গেল তার সামনে। কাগজে মোড়া তু'টো করে জিনিষ এক এক জনের হাতে দিলে সে। জিনিষ তু'টো নিয়ে প্রত্যেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যে বিলোচ্ছিল সব শেষে সেও বেরিয়ে গেল। আমরা তিনজন সেইখানেই বসে রইলাম। কারও মুখে একটি কথা নেই।

ঘণ্টা খানেক পরে সেই লোকটি ফিরে এসে বলল—"চলুন, আপনারা —স্বচক্ষে দেখে যান ব্যাপারটা।" বিশুদ্ধ চট্টগ্রামী ভাষায় বললে কথাগুলি। চুপি চুপি আমরা নেমে গেলাম তাঁর সঙ্গে।

জগন্নাথ সরকার লেনের আর একটা মুখ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। ডান ধারে ঘুরেই কয়েক পা গেলেই আবার ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটে পড়া যায়। সেই খানটায় তু'ধারে পর পর কয়েকখানা জাপানী মেয়েদের বাড়ী। গেটের ওপর লতাপাতা দিয়ে সাজানো। প্রত্যেকটা গেটে টাঙানো রয়েছে একটা করে কাচের বাক্স। বাক্সের ভেতর বাতি জ্বলছে। জাপানী অক্ষরে কি লেখা আছে সেই কাচে। প্রথম বাড়ীখানার সামনে দিয়ে যাবার সময় সেই লোকটি বললে—"এই বাড়ী থেকে তারা বেরবে।

আপনারা তিন জনে তিন দিকে থাকুন! একজন গিয়ে দাঁড়ান ঐ ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের ওধারের ফুটপাথে। একজন যান জগন্নাথ সরকার লেনের মুখে। একজন ঐ মোহনচাঁদ রোডের মুখে গিয়ে দাঁড়ান। খবরদার একসঙ্গে দৌড়াবেন না। দৌড়াবার দরকার নেই। পা চালিয়ে সরে পড়বেন। কাজটা শেষ হলেই চলে যাবেন—ব্যাস”—বলে লোকটা মিশে গেল রাস্তার ভিড়ে। আমি ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের ওধারে গিয়ে উঠলাম। ছোলেমান আর নেপেনদা' ফিরে গেল নিজের নিজের জায়গায়। ঠিক রইল যে সকলে ফিরবে ছোলেমানের বাড়ীতে।

এক এক মিনিট যাচ্ছে আর গলা উঁচু করে তাকাচ্ছি সেই গেটটার দিকে। আবার এধার ওধার চাইছি, কেউ আমায় লক্ষ্য করছে কিনা দেখবার জন্যে। এই ভাবে মিনিট দশেক কাটল। তারপর দেখলাম টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা সাহেব। তার পেছনে আরও তিনজন জড়াজড়ি করে বেরিয়ে এল। গেট থেকে নেমে ওরা চাইতে লাগল চারিদিকে, ফিটন গাড়ীর জন্যে। সাধারণতঃ সাহেবদের ও অবস্থায় বেরতে দেখলেই একটা ফিটন এগিয়ে যায়। সেইজন্যেই ফিটনগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে। সেদিন কিন্তু একখানা ফিটনও ছিল না। সাহেবরা চারজনে পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে আধখানা পথ জুড়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসতে লাগল ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের দিকে।

আচম্বিতে দু'পাশের ফুটপাথ থেকে কয়েকজন ছুটে গেল ওদের দিকে। গিয়ে সবাই এক সঙ্গে কি ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠলো সাহেবগুলো। ধেই ধেই করে নাচতে লাগল সারা রাস্তাটা জুড়ে। যাকে সামনে পেল তাকেই মারতে লাগল এলোপাতাড়ি। রৈ রৈ করে উঠল দু'পাশে চায়ের দোকানের লোকেরা। হাতা, খুন্তি, থালা, গেলাস ছুঁড়তে লাগল সাহেবদের দিকে। বেশীক্ষণ আর দাঁড়াতে পারল না সাহেবরা। রাস্তায় পড়ে ছটফট করতে লাগল! ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীট থেকে ছুটল পুলিশরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে। আমি আর দেখতে পেলাম না কিছু। একখানা হুড্ তোলা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল ঠিক আমার সামনে। ঠোঁটে পাইপ কামড়ানো, চোখে চশমা, গলায় নেকটাই,

এক সাহেব গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে খাঁটি বাঙলায় বললেন—"উঠে পড় গাড়ীতে, শিগ্‌গীর।"—বলে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলেন ঝুঁকে। গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম, বাক্য ব্যয় না করে উঠে বসলাম গাড়ীতে। গাড়ী ছেড়ে দিল। এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী গিয়ে উঠল খিদিরপুর পুলে। খিদিরপুর পুল থেকে গাড়ী যখন নামছে ওধারে, তখন পেছন থেকে কে বললে—"ছি ছি ছি ছি ছি—কি ডাকাত রে বাবা এরা, সেলার ক'টাকে একেবারে সাবড়ে দিলে।" চট করে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, অন্ধকারে বসে আছেন ছুরি বৌদি,—চোখ দু'টো তাঁর জ্বলজ্বল করছে। আমার পাশে বসে যিনি গাড়ী চালাচ্ছিলেন তিনি বললেন—"ওরা আর ফিরতে পারবে না দেশে, এসিডে চোখ-মুখ সব পুড়ে গেছে।"

মস্ত বড় ফটক—ভেতরে সাজান গোল বাগান, তারপর বাড়ী। দোতলায় সব ক'টা জানালায় দামী পর্দা ঝুলছে। সামনের সব ক'টা ঘরেই আলো জ্বলছে তাই পর্দাগুলো দেখতে পেলাম। আমাদের গাড়ী গিয়ে ঢুকল সেই ফটকের মধ্যে। গোল বাগানটা ডান দিকে রেখে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ী বারান্দার নীচে। ছ'টা মার্বেল মোড়া সিঁড়ির ওপর পাশাপাশি তিনটে দরজা। একটা দরজা খুলে গেল। ছুটে নেমে এল একজন বেয়ারা বা চাকর। গাড়ীর পেছনের দরজা খুলে ধরে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে।

ছুরি বৌদি নামলেন। বলতে বলতে নামলেন—"সুটকেশটা নামা বাদল, ওপাশে দেখ একটা খাবারের ঝুড়ি আছে, সাবধানে নামাবি।"

আমার দিকে চেয়ে বললেন—"একি! নামছ না যে বড়! বসে থাকবে নাকি সারা রাত গাড়ীতে?"

দাদা ঝুঁকে আমার কোলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। আমি নামলাম, আর হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম ছুরি বৌদির দিকে। অত্যুজ্জ্বল আলোয় জ্বলছে ছুরি বৌদির সাজ-পোষাক, গয়না-গাঁটি। সে সমস্ত কাপড় গয়না অত কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি কখনও। কলকাতার রাস্তায় ও-সমস্ত পরে বড়লোকের বাড়ীর মহিলারা যাওয়া-আসা করেন, দূরে থেকে দেখেছি। সেদিন একেবারে এক হাত তফাতেই

দেখবার সৌভাগ্য হল একটি মহিলাকে। মহিলাকেই দেখলাম, ছবি বৌদিকে নয়। ফলে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম নিজে। সাজ পোষাক-গুলো বিশ্রী রকম কুটকুট করতে লাগল গায়ে। মাথার ওপরেই একটা চোখ ধাঁধাঁনো আলো, কোথায় যে লুকোব নিজেকে, ভেবে পেলাম না।

সুটকেশ আর খাবারের ঝুড়ি নামিয়ে আনলে বাদল। বাদলের জামা-কাপড়ও ঢের পরিষ্কার আমার কাপড়-জামার চেয়ে। বৌদি ততক্ষণে তিনটে সিঁড়ি উঠে গেছেন। পেছন ফিরে আমায় বললেন—"এস, দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

যাবার জন্যে সিঁড়িতে পা দিলাম। পেছন থেকে দাদা বললেন—"আবার পালিও না যেন, যতক্ষণ না আমি আসি। অনেক কথা আছে।" —বলেই গাড়ী ছেড়ে দিলেন। গাড়ী বেরিয়ে গেল, আমরা সামনের ঘরে ঢুকলাম।

দরজার ভেতর পা দিতেই কানে গেল—"আসুন, বাবুমশাই আসুন। কালীঘাটে পেঁাছতে আপনার কষ্ট হয় নি ত' সেদিন? আমরা হলুম দোক্‌নো চাষা মানুষ, কোন রাস্তা দেখাতে কোন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি—"

টপ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। করুণাময়ী-তলার মুদির দোকানের বাঁশের মাচার ওপর বসা সেই লোকটি নোংরা দাঁতগুলো বার করে হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বদলায় নি তার কিছুই, এমন কি সেই পোড়া বিড়িটাও রয়েছে মুখে। পাগড়ি বাদ দিয়ে একটা বেখাপ কাবুলির পোষাক পরে আছে।

ছবি বৌদি যেন একটু কুঁকড়ে গেলেন তাকে দেখে। বেশ ভারি গলায় বললেন—"কতক্ষণ এসেছ?"

লোকটি দেশলাই জ্বালিয়ে আগে সেই পোড়া বিড়িটা ধরালে। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। ও সব খুন-খারাপির ভেতর আমি নেই বাবা। কোচোয়ান সাহেবের ঘর থেকে এঁরা যখন যাত্রা করলেন এক ঝুড়ি এসিড ভরতি বাল্‌ব নিয়ে, তখনও আমি সেই গলির মুখে দাঁড়িয়ে। তারপর সোজা এখানেই চলে এলাম। কে যায় সেই হাঙ্গামার মধ্যে! ছিটকে এসে লাগুক একটা বাল্‌ব

আমার মুখে, তাহলেই কাজ এগোত। এ পোড়া মুখ আর দেখাতে হত না কোথাও।”

ছবি বৌদি ওপাশের দরজা দিয়ে যেতে যেতে বললেন—“তাহলে গল্প কর একটু এই বীর পুরুষের সঙ্গে। এইমাত্র ইনি লড়াই ফতে করে এলেন। আমি কাপড় ছেড়ে আসি।”

গদিমোড়া সোফায় এতক্ষণ সোজা হয়ে বসে ছিল লোকটি। এবার মাথাটা পেছনের ঠেসান দেবার জায়গাটার ওপর রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বললে—“এঁরও স্নান করবার আর জামা-কাপড় ছাড়বার ব্যবস্থাটা করে দিও। নয়ত তোমার এই আস্তানার সঙ্গে যে বড় বেমানান দেখাবে।”

ছবি বৌদি চলে গেলেন পর্দার ওধারে। সেই অবস্থাতেই কড়িকাঠের দিকে চেয়ে লোকটি আমায় ডাক দিলে—“আসুন বাবুমশাই, বসুন এধারের চেয়ারটায়।”

দপ করে জ্বলে উঠলাম। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—“আমায় ভেঙচাচ্ছেন কেন?”

সোজা হয়ে বসলেন তিনি। কপাল কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ মিটমিট করে বললেন—“এজ্ঞে না, একটুও ভেঙচাই নি। আপনিই সর্বপ্রথম আমায় কি সম্ভাষণ করেছিলেন, মনে করে দেখুন। ‘এই, বলতে পার এ রাস্তাটা গেছে কোথায়’—এই রকমের কিছু বলেছিলেন বোধহয় আপনি।”

আরও রেগে গিয়ে বললাম—“কি করে জানব তখন যে আপনি কে।”

হো হো করে হেসে উঠলেন—“তাহলে, এখন নিশ্চয়ই জেনেছেন আমার পরিচয়টা। বলুন ত' আমি কে? শুনি।”

থতমত খেয়ে গেলাম। বললাম—“তা নয়, তবে”—আর কথা জোগাল না।

তাঁর মুখে জুগিয়েই আছে কথা। এবার বেশ সাদা গলায় বললেন—“বেশ ত' দাদা আগের বার মনে করেছিলে চাষা, এবার ত' কাবলী সেজে বসে আছি। এবার তবে আপনি-আজ্ঞে আরম্ভ করলে কেন? যাক্ গে সে সব কথা—এখন বোস এসে।”

বললাম—"না, আর বসব না, এবার যাব নিজের জায়গায় ফিরে। এই সব লুকোচুরি খেলা আমার ভাল লাগে না একটুও। কি দরকার আপনাদের ব্যাপারে মাথা গলিয়ে!"

শান্ত গলায় তিনি বললেন—"তা অবশ্য নেই। পরের ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই ভাল। সেই জন্যেই ত' কয়েকটা কথা জানতে চাই তোমার কাছে। এই যেমন ধর, সেদিন দুপুর বেলা খিদিরপুরের খালের ধারে ইট পেতে বসে ধুলোর ওপর আঁকা অভ্যাস করছিলে কেন?"

তৎক্ষণাৎ আমি পালটা জিজ্ঞাসা করে বসলাম—"আমিও ত' তাই শুনতে চাচ্ছি যে, আমাকে হঠাৎ ওভাবে সেই গুণ্ডা দু'টোকে দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি ছিল?"

ডান হাতখানা আমার সামনে মেলে ধরে তিনি বললেন—"একদম জলের মত সোজা প্রশ্ন তোমার। এর জবাবটাও তুমি জান। মানে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছ! এরা মনে করেছিল তুমি পুলিশের স্পাই।"

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম—"কেন এরকম আজগুবী কথা মনে করবে কেউ? স্পাই হই, যা হই, তাতে ওঁদের কি? কি অধিকার ওঁদের ওভাবে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবার? যদি স্পাই হতাম ত' করতেন কি ওঁরা আমার?"

এবার তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। দাঁতের ফাঁক থেকে বিড়িটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কার্পেটের ওপর। একেবারে পাল্‌টে গেল তাঁর গলার সুর। বরফের মত ঠাণ্ডা একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা যেন বিঁধল আমার বুকে। একটি একটি করে এই ক'টি কথা উচ্চারণ করলেন তিনি—"কোন অধিকারে সেলার চারটেকে পুড়িয়ে মেরে এলে তোমরা?"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম তাঁর চোখের তারা দু'টোর দিকে। সে দু'টো থেকে কি রকম যেন ঠাণ্ডা আলো বেরুচ্ছে তখন। আরও ধীরে ধীরে তিনি বলতে লাগলেন সেইভাবে আমার দিকে চেয়ে—"যদি স্পাই হতে তাহলে ওরা তোমায় কি করত—এই জানতে চাও? কেন, তাও ত' তুমি জান। খালের ভেতর মাথায় লগার বাড়ি খেয়েছ ত'। সেদিন তৎক্ষণাৎ ছুরি তোমায় জল থেকে তোলবার ব্যবস্থা না করলে ভাঁটার

ানে বড় গঙ্গায় গিয়ে পড়ত তোমার অচেতন দেহটা। তারপর কোথায় য়েতে ভেবে দেখ।"

একটু হেসে আবার বলতে লাগলেন ঠিক সেই সুরে—"কে কখন কান অধিকারে কি করছে—তার সব ক'টার জবাব দিতে পারবে? বল ' ভায়া, কোন অধিকারে তোমার বন্ধু গোমেশের প্রায় প্রাণহীন দেহটা ংক্ষণাৎ খুঁজতে গেল ওরা—আর তাকে বাঁচাবার জন্যে নিয়ে গিয়ে লে সেই পুঁটুরে গ্রামে? তারপর তোমার পেছনে পেছনে এসে এই যে ক রাশ টাকা খরচ করে বসলাম আমি, আমারই বা অধিকার কি এ-সব রবার?"

তাঁর কথার মাঝখানেই সবিস্ময়ে বলে ফেললাম—"টাকা খরচ রলেন আপনি! কেন?"

তাঁর গলায় আবার সেই হাল্‌কা সুর বেরল। এক ধারে হেলে পড়ে জাব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি ছোট হোমিওপ্যাথি শিশি বার রলেন। শিশিটা আমার নাকের কাছে তুলে ধরে বললেন—"এই ছাই- স্ম কেনবার জন্যে। না কিনলে তোমাদের সেই কোচোয়ান সাহেব 'শটা টাকা সারেংদের দিত কেমন করে তখন? আমার সেই চরস-খোর ক্কুটি এসিড কিনত কোথা থেকে একশ টাকা দিয়ে? আরও দু'শটা টাকা এখনও ওদের কাছে রয়ে গেল। তা থেকেও বোধহয় বিশ পঞ্চাশটা রচ হয়েছে ওদের। তা' হোক, সব মালটা যদি হাতে পাই ত' বহু টাকা নাফা মারব খরচ-খরচা বাদে।" বেশ স্ফূর্তির সঙ্গেই বললেন শেষ কথাগুলো।

চুপ করে চেয়ে রইলাম শিশিটির দিকে। চিনলামও শিশিটাকে। সারেংরা ঐ শিশিটি ছোলেমানকে নমুনা দিয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে বাকী মালটা ছোলেমানকে দিয়ে বাকী টাকাটা তাদের নিয়ে যাবার কথা।

জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—"কি আছে ঐ শিশিতে? এত টাকা কেন আপনি দিচ্ছেন ওই জিনিসের জন্যে?"

শিশিটা জোব্বার ভেতর পুরে তিনি বললেন,—"কোকেনের নাম শুনেছ কখনও? এই হল কোকেন। এতে রাতারাতি বড়লোক হওয়া

যায়। এ চালানটা সামলাতে পারলে কত টাকা পাব জান? খুব
করে হলে পাঁচ হাজার—বুঝলে?"

বোঝবার আগেই বাদল ঘরে ঢুকে বললে—"চলুন, আপনাকে স্না
ঘরে নিয়ে যাই।"

"হাঁ, হাঁ, আগে স্নানটা করে তোমার এই সাজ পোষাকটা ত' ছে
এস। তারপর খেতে খেতে করা যাবে এখন ঝগড়া। সারা রাতই
পড়ে রয়েছে।" মহা স্ফূর্তিতে বললেন কথাগুলো তিনি।

নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলা
ঘর থেকে। প্রচণ্ড বিক্রমে হাসতে সুরু করলেন সেই অদ্ভুত মানুষটি-
হা হা হা হা।

বড় ঘরের বড় খাওয়া খেলাম। সত্যিকারের পোলাও কালিয়া-
পাত-কুড়নো নয়। ছুরি বৌদি সামনে বসে রইলেন। বামুন পরি
করলে। কাবলীর সাজ ছেড়ে সাদা থান আর সাদা ফতুয়া পরে এসে
খেতে বসলেন আমার পাশে সেই ভদ্রলোক। বসেই বললেন—"এই যা
জলের বাটিটা দাও ছুরি, দাঁতটা ডুবিয়ে রাখি।"

ছুরি বৌদি তাঁর আসনের ডানদিকে জলের বাটিটা দেখিয়ে দিলেন।
তখন সেই পোকায়-খেকো বিশ্রী দাঁত দু'পাটি খুলে জলের ভেতরে ডুবিয়ে
রেখে খাওয়া আরম্ভ করলেন তিনি। মাছ, মাংস, হাড়গোড়—সবই
চিবতে লাগলেন শুধু মাড়ি দিয়ে। এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই।

ছুরি বৌদিকে আর চেনাই যাচ্ছে না! এক ইঞ্চি চওড়া কালো
ভেলভেটের মত পাড় বসানো সাদা সিল্কের শাড়ী আর ঐ রকমের একটা
জামা পরে আছেন। এই প্রথম বার দেখলাম, তাঁর মাথায় কাপড় নেই
এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। দু'হাতে দু'গাছি সরু চুড়ি
গলায় চিক্‌চিক্ করছে সরু চেন। ব্যাস—আর কিছু নেই। এমন কি
সিঁথিতে বা কপালে একটু সিঁদুর পর্যন্ত নেই। তখনকার দিনে ছদো ছদো
মেয়েরা স্কুল কলেজে যেত না। এই রকমের সাজ-পোষাক-ওয়ালা মেয়ে

বেই কম চোখে পড়ত। সেই সাজ-পোষাকে ছুরি বৌদিকে দেখে আর বৌদি বলে মনেই হল না। বিয়েই হয় নি—তা' আবার বৌদি। কিন্তু আশ্চর্য হলাম না মোটেই। এই ক'দিনে এত রকমের চেহারা ওঁর দেখেছি য় আশ্চর্য হতে ভুলে গেলাম।

খেতে খেতে সেই ভদ্রলোক বার দুই বললেন—"কই এখনও ফিরল কেন সে!" ছুরি বৌদি কোন উত্তর দিলেন না। তবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মনে হল একটু যেন ভাবনার ছায়া পড়েছে সে মুখে। এমন কি একটি বারের জন্যেও ছি ছি ছি ছি ছি বলে উঠলেন না।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গেলেন ছুরি বৌদি। একটু পরে ফিরে এলেন, মুখটা আরও থমথম করছে। আমার পাশের তিনি, শেষ সন্দেশটা মুখে ফেলে জলের গেলাস হাতে তুললেন। আমার জল খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাঁর জল খাওয়া শেষ হতেই ছুরি বৌদির গলা শোনা গেল। তিনি বললেন—"নেপেনকে পুলিশে ধরেছে। তার কাছেই সব জিনিস ছিল।"

যাঁকে শোনান হল, তিনি একান্ত নিস্পৃহ গলায় বললেন—

"ধরেছে—বাঃ! ধরলে কোথায় তাকে?"

ছুরি বৌদি যেন অনেক দূর থেকে বললেন—"খিদিরপুর সিনেমার সামনে। জিনিস নিয়ে সে দিতে আসছিল বানোয়ারীকে।"

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন—"ওর পানের দোকানটায় আগুন দিতে বলে দাও। বানোয়ারী চলে যাক মেটেবুরুজে। তোমার দাদা ফিরলে আমায় ডেকে তুলো। এখন ঘুমতে চললাম। উঃ! যা খাওয়া খাইয়েছ।" চটি ফটফট্ করে তিনি চলে গেলেন কলঘরে আঁচাবার জন্যে।

আমায় শোবার ঘরে নিয়ে গেল বাদল। ঘরের আসবাব-পত্র দেখে ঘুম দেশ ছেড়ে পালাল। এক হাত পুরু গদিওয়ালা খাটখানায় উঠলামও না। একটা চেয়ারে বসে রইলাম।

কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করছিল বুকের মধ্যে। নিজেকে ভয়ানক অপরাধী বলে বোধ হচ্ছিল। দোষটা কোথায় তা ঠিক ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু কেমন একটা অবুঝ অস্বস্তিতে পেয়ে বসেছিল

আমায়। গোমেশটা বাঁচবে কিনা ঠিক নেই, নেপেনদা'কে পুলিশে ধরল, আর আমি আরাম করে শোব গিয়ে ঐ খাটের ওপর। সকাল থেকে নেপেনদা' শুধু কয়েক কাপ চা আর পিঁয়াজি বড়া খেয়েছে। ...... মুখে এখনও হয়ত সেই আতপ চাল ধোয়া জল আর বড়িই যাচ্ছে শুধু আমি পেট পুরে আসল কালিয়া-পোলাও খেয়ে এলাম। ভয়ানক রাগ হল নেপেনদা'র ওপর। বেশ ত' খাচ্ছিলাম সকলে ছাতু। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ভাল খাওয়ার লোভে গিয়ে জুটলাম সেই খাল-ধারে। ছি ছি ছি ছি ছি। তারপরই নানান সুরের ছি ছি ছি ছি ছি বাজতে লাগল আমার মাথার মধ্যে। একটু পরেই খেয়াল হল . ছি ছি ছি ছি ছি শোনাও শেষ হয়ে গেছে চিরকালের মত আমার খালধারের টিনের ঘরে কালো টিপ কপালে, নাকে নাকছাবি পরা ছুরি বৌদি ঘাট থেকে বাসন মেজে আনতে পারে ভিজে কাপড়ে, 'ছি ছি ছি ছি ছি'-ও শোনাতে পারে যখন-তখন। কিন্তু এই বাড়ীর ঐ কলেজে-পড়া মহিলাটি ও সমস্ত কিছুই পারেন না। দূরে বসে নিতান্ত পরের মত নির্লিপ্ত ভাবে খাওয়াতে পারেন মাত্র। পরই, নিছক পর। শুধু শুধু ঘুরে মরছি এই বড়লোকদের পেছনে। এদের সঙ্গে মেশাও পাপ, মিশতে গেলেই ফ্যাসাদ, নেপেনদা'কে জেলে পর্যন্ত যেতে হল। চুলোয় যাক ভাল খাওয়া-দাওয়া, ভাল বিছানায় শোয়া। ভোর হতে যা দেরী। সটান নেমে পড়ব রাস্তায়। তারপর কপালে যা থাকে।

ছুরি বৌদি—বৌদি নয়, সেই মহিলাটি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্ করে উঠল ঘরের ভেতরটা—"ছি ছি ছি ছি ছি, এখনও ঘুমোও নি তুমি! মাথায় হাত দিয়ে বসে আছ চেয়ারে। রাত যে শেষ হতে চলল।"

তাঁর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই তিনি গলার সুর বদলে বললেন —"একটা কথা বল ত' ভাই। বেশ ভাল করে ভেবে বল—আমাদের সম্বন্ধে কি কি বলেছ তুমি তোমার নেপেনদা'কে?"

বললাম—"একটি কথাও বলবার ফাঁক পাই নি এখনও। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস করতে পারেন।"

"তা যদি না বলে থাক, তাহলে এখনই তোমায় একবার বেরতে

হবে আমার সঙ্গে। তোমার নেপেনদাকে ছাড়িয়ে আনা হচ্ছে। যেখানে তাকে আনা হচ্ছে সেখানে আমাদের আগেই যেতে হবে। সেখানে তুমি থাকবে, তোমার কাছে তোমার নেপেনদা' থাকবে। ব্যাস—চুকে গেল।"

শক্ত হয়ে বললাম—"কিছুই চুকল না। নেপেনদা' যদি ফেরে আবার আমরা আমাদের সেই বাসায় চলে যাব। ওকে কাজ করব। দরকার নেই আমাদের এই সব গোলমাল বাড়িয়ে।"

আরও শক্ত হয়ে ছুরি বৌদি বললেন—"সে উপায় কি আর আছে তোমাদের? পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে যাকে আনা হচ্ছে তাকে লুকিয়ে থাকতেই হবে। গোমেশকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। সে মোটে এ দেশেই থাকবে না। আর তুমি যদি নিজের ইচ্ছেয় চলতে চাও তবে—"

বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। নিজের ইচ্ছেয় চলতে চাইলে কি হবে আমার, সে কথাটা তিনি শেষ না করলেও আমার বুঝতে একটুও কষ্ট হল না। তাঁর গলার স্বর আর চোখের তারা হু'টো খুবই স্পষ্ট করে সব বলে দিলে।

উঠে গিয়ে নিভিয়ে দিয়ে এলাম আলোটা। অন্ধকার ঘরে বসে রইলাম চেয়ারের ওপর। একটি বারের জন্যেও গেলাম না দরজার কাছে। ভাল করে জানতাম যে দরজা বন্ধ আছে বাইরে থেকে।

নিজের মর্জি মত আর চলতে ফিরতে পারব না আমি। এঁদের হুকুমের চাকর হয়ে থাকতে হবে চিরকাল। মা, বোন, দেশ-গাঁ সব ভুলতে হবে। কিন্তু কেন? কিসের লোভে?

নেপেনদা', গোমেশ আর আমি—আমাদের তিনজনেরই স্বাধীনতা বলতে কিছু রইল না। এঁদের কেনা গোলাম হয়ে গেলাম প্যাঁচে পড়ে। কেনা গোলামকেও চোরের মত লুকিয়ে থাকতে হয় না, এ আবার তারও বাড়া। ছুঁচো আর পেঁচার মত লুকিয়ে বেড়াতে হবে আমাদের। কিন্তু কেন? যেহেতু এঁদের ক্ষমতা অসীম, টাকার জোর আছে, সে টাকা এঁরা উপার্জন করেন কোকেনের চোরা কারবার করে। বাঃ—

এর চেয়ে কি এমন খারাপ হত যদি গোমেশ মরে যেত, নেপেনদা' যেত ক্ষেপে আর আমি জেলে যেতাম! কার কতটুকু ক্ষতি হত, যদি আমি আর নেপেনদা' দু'খানা ছোরা নিয়ে সোজা সেই জাহাজে গিয়ে উঠতাম আর গোটা দুই সেলারকে খতম করে ডকে লাফিয়ে পড়তাম। না হয় ডুবেই মরতাম, তাতেই বা কি হত এমন! কিন্তু এটা কি হল? একদল জোচ্চোর, চোরাকারবারী, খুনে, জালিয়াতের পাল্লায় পড়তে হল শেষ কালে!

আর—এই সব কিছু ঝঞ্ঝাটের জন্যে দায়ী ঐ মেয়েমানুষটা; ওর ঐ নেকাপনা—'ছি ছি ছি ছি ছি'-বলা নানা রকম সুর করে। এখান থেকে একবার যদি বেরতে পারি—

পারলে ওকে দেখিয়ে দেব যে অত সহজে ভুলিয়ে রাখবার পাত্র অন্ততঃ আমি নই। আমাকে ভয় দেখানো অত সোজা নয়। আল্‌-টপকা দু'টো গুণ্ডায় একবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর এতটুকু সন্দেহ করি নি তাই মাথার ওপর আচমকা ঝাড়তে পেরেছিল লগার বাড়ি। কিন্তু আর একবার ছুঁতে হচ্ছে না আমার গা, যদি ছাড়া পাই এখান থেকে। সমস্ত জারিজুরি ঠাণ্ডা করে দেব একেবারে।

জারিজুরি ঠাণ্ডা করবার একশ' রকম ফন্দি-ফিকির আঁটতে লাগলাম সেই অন্ধকার ঘরে বসে। কোনটাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছল না শেষ সীমায়। প্রত্যেকটাই সেই বিচিত্র সুর 'ছি ছি ছি ছি ছি'-তে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগল আমারই মুখের ওপর, জ্বালা ধরিয়ে দিলে আমার চোখে, মুখে, মাথায়—।

শেষে উঠে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে আলো জ্বাললাম। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল মুখে মাথায় দিতে হবে। এক কোণে একটা টুলের ওপর একটা সোরাই ছিল। এক গেলাস জল গড়িয়ে নিলাম। জলটা মাথায় মুখে থাবড়ে দিতে হবে। কিন্তু দরজা ত' বন্ধ বাইরে থেকে, ঘরের মেঝেতেই ফেলব নাকি জল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম ঘরের অন্য ধারে একটা দরজা রয়েছে। ও দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় দেখবার জন্যে টান দিলাম। খুলে গেল

দরজাটা। জলের গেলাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে মাথায় লেগে শরীর জুড়িয়ে গেল। গেলাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। তবে সারা রাত আমায় বন্ধ করে রাখে নি ঘরের ভেতর। আশ্চর্য!

গেলাসটা সেইখানেই নামিয়ে রেখে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বারান্দার ভেতর ফিকে সাদা আলো এসে ঢুকল।

তারপর আর এক মুহূর্ত দেরী করলাম না। সোজা এগিয়ে গেলাম বারান্দার শেষ মাথায়। পেলাম সিঁড়ি—পা টিপে টিপে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে, চতুর্দিকে নজর রেখে এগোতে লাগলাম। কে যে কোথায় ওৎ পেতে আছে, ঠিক কি! আলৃটপকা কেউ না লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ে।

কেউ পড়ল না। একদম বাধা দিলে না কেউ। নীচের বারান্দা পার হয়ে গিয়ে ঢুকলাম সেই ঘরটায়, যে ঘরে প্রথম এসে সেই কাব্লীর পোষাক-পরা লোকটিকে দেখেছিলাম। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই নজর পড়ল মৃদু সবুজ আলো জ্বলছে। ও পাশের লম্বা সোফাটার ওপর একজন শুয়ে আছে পেছন ফিরে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাব পিছু হেঁটে—না, পা টিপে টিপে সামনের দরজা খুলে পালাব তাই ভাবছি, শুনতে পেলাম—"এত সকালেই চললে? খান দুই কাপড়, জামা-টামা কি সব তোমার জন্যে রেখে গেছে দুরি ঐ টেবিলের ওপর। ওগুলো নিয়ে যাও রাতের ঐ সাজ-পোশাক পরে রাস্তায় বেরতে সে মানা করে গেছে। আর এটাও নিয়ে যাও।"

একখানা মোটা খাম ছিটকে এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। যিনি পেছন ফিরে শুয়ে ছিলেন, তিনি আরও একটু নড়েচড়ে আরাম করে শুলেন। মুখ কিন্তু ফেরালেন না এদিকে।

নীচু হয়ে খামখানা তুলে নিলাম। এগিয়ে গেলাম ঢাকা দেওয়া সবুজ বাতিটার কাছে। খোলা খাম, ভেতরে যা আছে টেনে বার করলাম। অনেকগুলো দশ টাকার নোট আর একখানি ছোট্ট চিঠি। চিঠিখানা পড়তে এক মিনিটও লাগল না?

প্রিয়·ভাইটি আমার,

টাকা ক'টা তোমার কাজে লাগবে। নিও, রেখে যেও না। রেখে গেলে মনে কষ্ট পাব আমি। যেখানে থাক, সাবধানে থেক। ইতি—

তোমার বৌদিদি।

অন্যমনস্ক হয়ে মুচড়ে ধরলাম চিঠিখানা হাতের মুঠোয়। বোধহয় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপ করে। তারপর নিঃশব্দে ছেড়ে ফেললাম পাজামা আর ঢিলে কামিজটা। দু'খানা ধোয়া ধুতি, দু'টো শার্ট, দু'টো গেঞ্জি ছিল টেবিলের ওপর। এক প্রস্থ পরে ফেললাম সব। নোটগুলো আর চিঠিখানা পকেটে পুরে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার হাতল ধরে। দরজাটায় টান দিতে গিয়ে দেওয়া হল না।

একটু পরে হাতল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলাম সেই সোফার কাছে। পেছনে ফিরে শোয়া মানুষটিকে বললাম—"আমি যাচ্ছি তাহলে।"

আধা ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি বললেন—"আচ্ছা।"

আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে শেষে বহু চেষ্টায় বললাম—"তাঁকে বলবেন যে কোনও ভয় নেই। আমি কখনও তাঁর ক্ষতি করব না।"

সেই রকম ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে তিনি বললেন—"চেষ্টা করলেও পারবে না বাবা। কেন মিছে বক্‌বক্‌ করছ, যাও ঘুমতে দাও আমায় আর জ্বালিও না।"—বলে আবার নড়ে চড়ে শুলেন।

কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর পেছন দিকে। তারপব সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শ্বেত পাথরের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। বসেই রইলাম চুপ করে। ছোট গোল বাগানটার ওপারেই খোলা ফটক, তারপর রাস্তা। রাস্তা মানে মুক্তি। কিন্তু কি থেকে মুক্তি! কার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি আমি! কে আমায় ধরে রেখেছে এখানে! এই সমস্ত গোলমেলে প্রশ্নগুলো জট পাকিয়ে গেল মগজের মধ্যে। জট ছাড়াতে গিয়ে আরও জড়িয়ে গেল সব। কপালে হাত দিয়ে বসেই রইলাম—আর উঠতে পারলাম না।

খানিক পরে একখানা সাইকেল ঢুকল ফটকের ভেতর। খান দুই কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল আমার সামনে। তুলে নিয়ে খুলে দেখলাম ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের হাঙ্গামার সংবাদ বেশ ফলাও করে ছাপান হয়েছে। খবরের কাগজওয়ালারা জানতে পেরেছে যে এর পেছনে একটা বড় দল আছে, যারা আফিম-কোকেনের চোরা কারবার চালায়। কিছু পরিমাণ কোকেন নাকি পাওয়াও গেছে সেই সাহেবদের শরীর তল্লাশ করে। তারা হাসপাতালে আছে। দু'জনের অবস্থা সাংঘাতিক। আর একটি সংবাদও ছাপা হয়েছে ওর পাশেই। অনেক রাতে ওয়াটগঞ্জ স্ট্রীটের একটা পানের দোকানে আগুন লাগে। ফলে আরও পাঁচ-সাতখানা দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পানের দোকানের মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খবরগুলো পড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ও বাড়ীতে ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না আর। ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তখনও ভাল করে রাস্তায় লোকজন চলা আরম্ভ হয় নি। ফট্-ফট্-ফটাস শব্দ হল ডান-দিকে। জল গড়িয়ে আসতে লাগল রাস্তা দিয়ে। যে ধার থেকে জল আসছিল তার উলটো দিকে হাঁটতে লাগলাম। আধ ঘণ্টারও বেশী হাঁটবার পর ট্রাম লাইন দেখা গেল। বেরিয়ে এলাম ট্রাম লাইনের রাস্তায়। তখন আন্দাজ করতে পারলাম জায়গাটা। ট্রাম লাইন ধরে ডানদিকে গেলে ধর্মতলা, বাঁ-দিকে গেলে জগুবাবুর বাজার। সামনে দিয়ে কপালে টালিগঞ্জ লেখা একখানা ট্রাম ছুটে গেল বাঁ-দিকে। নিশ্চিন্ত হলাম অনেকটা। এখন যেখানে খুশী যেতে পারি।

কিন্তু যাব কোথায়! খিদিরপুরে যাওয়ার প্রবৃত্তিও হল না, সাহসও হল না। ও নোংরা ব্যাপারে জড়াবার কথা ভাবাই যায় না আর। এক যাওয়া যায় এই ট্রামে চেপে টালিগঞ্জে। গিয়ে গোমেশকে দেখে আসা যায়। কিন্তু গোমেশ কি এখনও আছে সেখানে! তাকে ত' সরিয়ে ফেলবে শুনে এলাম ওখান থেকে—ফেলেছেও হয়ত এতক্ষণে তার অজ্ঞান অচৈতন্য দেহটা। গোমেশ, নেপেনদা' দু'জনেই পড়ল ওদের খপ্পরে, শুধু আমিই যা রক্ষে পেলাম।

যাক্ গে, যা আছে ওদের কপালে হবেই। কিন্তু আমি এখন যাই কোথায় ?

কাছে দূরে অনেকগুলো জায়গা মনে পড়ল। আত্মীয়-স্বজন যারা আছে এই শহরে, তাদের কাছে যাওয়া না-যাওয়া দুই-ই সমান। কেউ এক বেলা আশ্রয় দেবে না, বা একটুও সাহায্য করবে না। করলে বার্ড কোম্পানীতে গিয়ে নাম লেখাতে হত না।

বার্ড কোম্পানীর কথাটা মনে হতেই ডক, জাহাজ, ক্রেন, ডেরিক, মাল 'আড়িয়া-হাবিস' সব মনে পড়ে গেল আবার। কি এমন অসুবিধায় ছিলাম এতদিন। নানা দেশ থেকে জাহাজ আসছে, মাল নামছে, মাল উঠছে। সারা দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। ডকটা হচ্ছে কলকাতা শহরের গেট, তার ওপারে খোলা জগৎ। এই যে শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে কে চেনে আমায় ? কি দাম আমার এখানে ? অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছি একেবারে। দূর-দূর—এ সব জায়গায় আবার মানুষ থাকে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচব, যদি আবার ডকে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

কিন্তু আবার সেই খিদিরপুরের পুল পার হবার চিন্তাটাও কেমন যেন বরদাস্ত করতে পারলাম না।

শেষে ট্রামে উঠে বসলাম, নামলাম এসে ধর্মতলায়। তারপর অন্যমনস্ক হয়েই শেয়ালদার ট্রামে উঠে বসলাম। শেয়ালদা স্টেশনের সামনে যখন নামলাম তখন বেশ বেলা হয়েছে। বহু লোক বেরিয়ে আসছে স্টেশন থেকে। সবাই ব্যস্ত, সকলেই ছুটছে নিজের ধান্দায়। ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললাম সামনে। পেছন থেকে কাঁধে টান পড়ল। ফিরে দেখি—আরে !

কাঁধ-ধরা হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেললাম দু'হাতে। ধরা হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা না করে সে জিজ্ঞাসা করলে—"এত সকালে যাচ্ছিস কোথা ?"

আমতা আমতা করে বললাম—"যাচ্ছিলাম এই একটু—"

"যেতে হবে না আর। চল ফিরি। সারাদিন হৈ হৈ করা যাবে।" —বলেই জড়িয়ে ধরলে আমার গলা, টেনে বার করে নিয়ে এল রাস্তায়। বাধা দেবার সুযোগই পেলাম না।

হৈ হৈ করাই বটে। সারা কলকাতাটা চষে ফেলল একেবারে। এত বন্ধু-বান্ধবও মানুষের থাকে! সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অগুণতি মানুষের সঙ্গে দেখা করলে শচীন। ছুটে বেড়াল শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত। এক ফাঁকে ম্যাডান স্ট্রীটে এক রেষ্টুরেন্টে বসে খেয়ে নিলাম আমরা এক পেট। একটি পয়সাও খরচ করতে দিলে না আমায়। এক গাদা বই কিনলে। সেগুলো ঘাড়ে করে সন্ধ্যা বেলা ঢুকল গিয়ে সিনেমায়। ছবি শেষ হল প্রায় রাত ন'টার সময়। তখন আবার ছুটল শেয়ালদা স্টেশনে।

ফাঁক পেয়ে তখন বললাম—"এবার ছেড়ে দে আমায়। আবার নিয়ে চললি কোথায়?"

গম্ভীর ভাবে বললে—"চল না দেখবি। এখন ট্রেণ পেলে হয়।"

"যাচ্ছিস কোথায়, তাই শুনি আগে।"

"শুনে তোর লাভ। তুই যে কোথায় যাচ্ছিলি সকালবেলা, তাও ত' বলতে পারিস নি।"

"আমি বাড়ী যাব ভাবছিলাম।"

"ও, তাহলে স্টেশনে পৌঁছেও ভাবছিলি যাবি কি না। বেশ, তাই ভাব না আরও দু'চারটে দিন। ভাবনাটা শেষ করে আবার স্টেশনে চলে আসবি, ট্রেণ ত' রোজই ছাড়ছে।"

তাড়াতাড়ি বললাম—"না না ভাই। ঠিক করলাম বাড়ী আর যাব না। কলকাতাতেই এখন থাকব।"

খুব খুশী হয়ে শচীন বললে—"বল না তাই স্পষ্ট করে। তাহলে ত' বেঁচে যাই! এত রাত্রে আবার ফিরে যেতে হয় না আমাকে। তোর আস্তানাতেই রাতটা কাটিয়ে যাই।"

ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কি বলা যায় ভেবে না পেয়ে চেয়ে রইলাম রাস্তার দিকে। বাসটা শেয়ালদার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেচে তখন।

শচীন কনুই দিয়ে একটা গুঁতো মেরে বললে—"কি রে, নেমে পড়ি আয় তাহলে। কোথায় তোর আস্তানাটা বল?"

ওর চোখের দিকে না চেয়ে নিরুপায় হয়ে বললাম—"ভাই, আমার কোন আস্তানাই নেই কোথাও—"

আধ মিনিট চুপ করে রইল শচীন। তারপর মহা উৎসাহে বলে উঠল—"ব্যাস, তাহলে ত' চুকেই গেল লেঠা। তাহলে আবার ক্যাঁকড়া তুলছিস কেন? আস্তানার বালাইটা এখনও যখন রয়েছে আমার তখন চল আমার সঙ্গে।"

শেয়ালদা স্টেশনে নামলাম। শচীন বললে—"ধর আমার জিনিষগুলো। পাঁচ নম্বরে গিয়ে দাঁড়া, আমি টিকিট কেটে আনি।"—বলেই দৌড়ল।

লালগোলার গাড়ী রাত দশটার পর ছাড়ল শেয়ালদা থেকে। ইণ্টার ক্লাশের দু'টো বেঞ্চি জুড়ে আমরা শুয়ে পড়লাম।

রাত আর রাস্তা দু'ই কেটে গেল ঘুমিয়ে। পৌঁছে গেলাম বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে। শচীন বললে—"চ, নামা যাক্ এবার, টিকিট খতম এখানেই।"

নামলাম এবং তৎক্ষণাৎ বোধ হল যে নিষ্কৃতি পেলাম একটা গোলক-ধাঁধা থেকে। কতকগুলো ছিনে জোঁক যেন কামড়ে বসে ছিল সর্বাঙ্গে এতদিন, সেগুলো খসে পড়ে গেল। বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের সামনেই মাঠ, মাঠের ও-প্রান্তের বাড়ীগুলোকে ছোট ছোট খেলাঘর বলে মনে হয়। শচীন ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করতে যাচ্ছিল। বললাম—"আয় না হাঁটি। অনেক দেরী রোদ উঠতে, ঘাসের ওপর শিশির রয়েছে এখনও।"

"তাই চল, মোট-ঘাট যখন নেই।"

সদ্য কেনা বইগুলো ভাগ করে নিয়ে আমরা মাঠে নামলাম।

দুই ॥

বহরমপুরের মাঠে শিশির-ভেজা ঘাসের মধ্যে পা ডুবে যায় না, কালীগঞ্জের মাঠে যায়। শুধু পা কেন, কোমর পর্যন্ত বা তারও ওপরে—গলা, মাথা পর্যন্ত সব ডুবে যায় ঘাসের মধ্যে—কালীগঞ্জের মাঠে নামলে। সেই কথাই আমি ভাবছিলাম সেদিন শচীনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে। আমি আমার মরণাপন্ন স্যাণ্ডেল-জোড়া খুলে বগলে নিয়েছিলাম, শচীনের ফিতে-বাঁধা জুতো পায়েই ছিল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে খুঁজছিলাম কালীগঞ্জের মাঠের কাশ ফুলের গন্ধ বহরমপুরের মাঠে। হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যাঁরে, কালীগঞ্জের মত এই মাঠের ওধার দিয়ে কোনও নদী বয়ে যাচ্ছে না?"

বেশ অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলে শচীন—"আছে, মরা গঙ্গা। পচা জল, গন্ধে কাছে যাওয়া ভার।"—বলে পশ্চিম দিকে হাত তুলে দেখিয়ে দিলে—"ঐ যে দেখতে পাচ্ছিস মাঠের শেষে বাড়ীগুলো, ওগুলো গঙ্গার ধারেই। টিঁকতে পারবি না ওখানে দুর্গন্ধের জ্বালায়।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল হা-হা করে, হাসির জের টেনে বললে—"সেই কালীগঞ্জের দিনগুলো আর ফিরে আসবে না রে, কিছুতেই ফিরবে না। এখন সেই কালীগঞ্জে গেলেও ছেড়ে আসা আগেকার কালীগঞ্জ কি ফিরে পাবি আর, হা হা হা হা!"

বিগড়ে দিলে মেজাজ, ভোরের আলো-হাওয়া আর বহরমপুরের মাঠের শিশির-ভেজা ঘাস সব বিস্বাদ হয়ে উঠল। অনেকগুলো বছর পিছিয়ে গিয়েছিলাম নেশার ঘোরে, ঝট্ করে ফিরে এলাম আবার যথাস্থানে। বইগুলোর মোটটা ভারি ঠেকতে লাগল। মাঠটা কি ছাই ফুরোবে না। মাথা নীচু করে গোঁ ভরে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, কোথায় যাচ্ছি ওর সঙ্গে, তা জিজ্ঞাসা করা হয় নি ত'! কি গেরো—কেন যাচ্ছি খামকা ওর পিছু পিছু। জিজ্ঞাসা করলাম—"তাহলে যাচ্ছি কোথায় আমরা এখন?"

উদাস নির্লিপ্ত কণ্ঠে শচীন জবাব দিলে—"কালীগঞ্জে নয়, এটা ঠিক। কালীগঞ্জের সেই দিনগুলো, তখনকার সেই মন, যে মন হিসেব করার ধার ধারতনা। সেই স্কুল, হোস্টেল, মাঠ,নদী,এ সমস্ত আর কোথায় পাবি বল্? তখন ত' বাবু ছিলাম না রে আমরা, এখন আমি শচীনবাবু আর তুই—"

বাধা দিয়ে বললাম—"বাবু এখনও হতে পারি নি ভাই।"

এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে শচীন বললে—"হবি, এখনই হবি, আগে পৌঁছই চল।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু পৌঁছব যে কোথায়, সেইটেই ত' জানতে চাচ্ছি।"

বইগুলো এ বগল থেকে ও বগলে নিয়ে শচীন বললে—"যেখানে আমি থাকি আর আমার ডিউটি করি।"

"ডিউটি! কি ডিউটি? চাকরি করিস বুঝি এখানে?"

"হাঁ, চাকরিই করি। আজীবনের জন্যে দাসখত লিখে দিয়েছি, তাই এক বড় লোকের মেয়েকে পাহারা দি।"

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস হল না ওকে।

তখনও আমরা ওকে ঘাঁটাতে সাহস করতাম না। মাষ্টারমশাইরাও ওকে সমীহ করে চলতেন। ওকে নয়, সমীহ করতেন ওর গোঁ-কে। সকলেই জানতেন যে, মরে গেলেও শচীন সিংগী মিথ্যে কথা বলবে না। কিছু একটা করে ফেললে সেটার সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবে। —'করেছি, বেশ করেছি, ভাল বুঝেছি—তাই করেছি'—এই ওর প্রথম আর শেষ কথা। একবার একটা কাগজ চালাচালি হচ্ছিল যশোদানন্দন ঘাঁটি মাষ্টারমশাই-এর ক্লাশে! মাষ্টারমশাই ছিলেন মেদিনীপুর জেলার মানুষ। ঘাঁটি—এই আজব পদবী শুনেই আমরা নেচে উঠলাম। তার ওপর তাঁর কিম্ভূতকিমাকার কথার টান। যেমন 'এই রকম', 'কি রকম', 'সেই রকম' এই তিনটি কথা উচ্চারণ করতে গেলে তাঁর মুখ থেকে বেরুত

—এর্‌কম, কির্‌কম, সের্‌কম। মাস্টারমশাই এসে হোষ্টেলে উঠলেন এবং সাত দিনের মধ্যেই সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর ডান হাতে বাঁ-হাতে প্রতিটি আঙ্গুলের গাঁটে গাঁটে যে কড়াগুলো পড়েছে সেগুলো অর্জন করতে কত শত মাথা ঘায়েল হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান যে ক'জন ছাত্র আমরা ছিলাম হোষ্টেলে, আমাদের প্রত্যেকের মাথাতেও সাত দিনের মধ্যে কড়া পড়ার যোগাড় হল। শচীন হোষ্টেলে থাকত না। থাকত থানায়। কালীগঞ্জ থানায় ওর বাবা দারোগা ছিলেন। শচীনকে অন্য মাস্টারমশাইরা একটু রেহাই দিতেন সেই জন্যে। মাস্টার ঘাঁটি রেহাই দেবার মানুষ ছিলেন না। তিনি ওর কোঁকড়া চুল-ওয়ালা মাথায় আঙ্গুলের কড়াগুলো শানিয়ে নিতে গেলেন একদিন।

মাত্র দু'টো গাট্টা মারতে পেরেছিলেন তিনি। খপ করে হাতটা ধরে ফেলেছিল শচীন। শান্ত কণ্ঠে বলেছিল—"মাথায় মারবে না।"

ঘাঁটি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—"এর্‌কম আস্পদ্দা তোর! আচ্ছা কির্‌কম ছেলে তুই দেখে নোব।" ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল। তার পাঁচ ছ'দিন পরেই ঘটল সেই দুর্ঘটনাটা। আহমদ, ঘাঁটি মাস্টারের ক্লাশে লুকিয়ে পড়ছিল শরৎ চাটুয্যের বই। মাস্টারমশাই ধরে ফেললেন। বইখানা কেড়ে নিয়ে প্রথম পাতাতেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন— লেখা রয়েছে শ্রীশচীন্দ্রকুমার সিংহ। কিন্তু নামটা তিনিও দেখেও দেখলেন না। রহস্যময় হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটের কোণে। আহমদকে দাঁড়াতে বললেন। তারপর আরম্ভ হল তর্জন গর্জন—"বল—কে তোকে দিয়েছে এই নবেল?"

আহমদ চুপ, বার পঁচিশেক জিজ্ঞাসা করে নিজে গিয়ে ঘাঁটি মাস্টার বেত আনলেন আফিস ঘর থেকে। চালাতে আরম্ভ করলেন বেত আহমদের ওপর। ঘণ্টাটা শেষ করে বেরিয়ে গেলেন।

শচীন সেদিন কামাই করেছিল। বাড়ীতে বসে সব শুনল। তার পরদিন স্কুলে এসেই সোজা ঘাঁটির সামনে হাজির।

"বইখানা ফেরত দিন।"

"কি বই?"

"কাল যেখানা আহম্মদের কাছ থেকে নিয়েছেন।"

"সেখানা তোমার বই—কাল সে বললে না কেন ?"

"বলবার দরকার ছিল না। প্রথম পাতায় আমার নাম লেখা আছে।"

"আই! তাহলে ওই নবেল তুমি দিয়েছিলে ওকে ?"

"হ্যাঁ—কিন্তু ক্লাশে বসে পড়বার জন্যে নয়।"

"তার মানে ক্লাশের বাইরে ওই সব ছাই-ভস্ম পড়লে দোষ নেই ?"

"না।"

"কি'এর্‌কম আস্পদ্দা তোর!" ফেটে পড়লেন ঘাঁটি মাস্টার।

শান্ত গলায় শচীন বলেছিল—"চেঁচাবেন না। বইখানা ফেরত দিন।"

আরও চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মাস্টারমশাই—"ফেরত দেব! ফেরত দেব! এঁ্যা? এত বড় আস্পদ্দা।"

শচীন চেঁচায় নি। বলেছিল—"বেশ দেবেন না।" বলে চলে এসেছিল।

পেছন থেকে মাষ্টারমশাই বলে ফেলেছিলেন—"আচ্ছা যাই আগে ক্লাশে—"

দেড় ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া একখানা কাগজে লেখা ছিল—'ঘাঁটি কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে কেউ উত্তর দিও না। আহমদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও।' কাগজখানা এর কাছ থেকে ওর কাছে পাস হয়ে যাচ্ছিল। লিখেছিল গোবিন্দ সেন—ক্লাশের সব চেয়ে ভাল ছেলে। লেখা কাগজের টুকরোটা যখন লতিফ পাস করছিল শচীনকে তখন ঘাঁটি মাস্টার ধরে ফেললেন। টের পেয়েছিলেন তিনি অনেক আগেই, শচীনকে হাতে হাতে ধরবেন বলে ওৎ পেতে বসেছিলেন।

চীৎকার করে উঠলেন—"কি ওটা? দাঁড়াও।"

শচীন দাঁড়াল, তৎক্ষণাৎ কাগজটুকু মুখে পুরে চিবিয়ে গিলে ফেলল। একেবারে বাক্‌রোধ হয়ে গেল ঘাঁটির।

ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্লাশ থেকে। নিয়ে এলেন বেত। তারপর গর্জন আরম্ভ হল।

"কি ছিল ওটাতে ?"

"আপনার জেনে লাভ নেই, আমাদের নিজস্ব ব্যাপার।"

ব্যাস—আরম্ভ হল বেত চালানো। দু'হাতে মুখটা ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল শচীন। জামাটা ফালা ফালা হয়ে গেল! বেতখানাও গেল ফেটে। তারপর সে ঢলে পড়ল।

ছুটে এলেন অন্য মাস্টার-মশাইরা। হেডমাস্টার ব্রজেনবাবু ঘরে ঢুকে বেতখানা কেড়ে নিলেন। ঘাঁটি মাস্টারকে বার করে নিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাঁচ দিন শচীন স্কুলে এল না। সকলে আশা করতে লাগলেন থানা থেকে কেউ আসবে। কেউ এল না। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসেও হেডমাস্টার-মশাই-এর সঙ্গে দেখা করলেন না। তারপর স্কুলে এসে শচীন এমন ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন কিছুই হয় নি। হেডমাস্টার-মশাই শচীনকে ডেকে কি বলতে গেলেন। ও তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল.—"অন্যায় করেছিলাম, তাই মার খেয়েছি স্যার্। কিন্তু কাগজখানা না চিবিয়ে ত' উপায় ছিল না। ওটা দেখলে যে উনি আরও অপমানিত হতেন।" বলে, শরৎবাবুর বই পাওয়া, আহমদের মার খাওয়া, সব বললে হেডমাস্টার মশাইকে। কাগজখানায় কি লেখা ছিল তা'ও জানালে। হেডমাস্টার মশাই, সে মাসের মাইনে দিয়ে ঘাঁটি মাস্টারকে নারায়ণগঞ্জ জাহাজে তুলে দিয়ে এলেন তার তিন দিন পরেই। আপদ চুকে গেল।

বহু আপদ বিপদ থেকে বহুবার আমরা উদ্ধার পেয়েছি শচীনের বদকুঁটে জিদের জন্যে। তাই ওর জিদকে ভয় করতাম আমরা, সহজে ওকে ঘাঁটাতে সাহস করতাম না। সেই শচীন আজীবনের জন্যে দাসখত লিখে দিয়েছে যাঁর পায়ে তাঁর এক গুঁয়েমির বহর কত দূর তাই ভাবতে ভাবতে মুখ বুজে হাঁটতে লাগলাম।

আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর শচীন জিজ্ঞাসা করলে—"করছিলি কি তুই কলকাতায়?"

কি করছিলাম, বললাম। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। তিনটে লোক সংসারে—মা, বোন, আমি নিজে। তিনজনের ওপর ছোটঠাকুর্দা'। তাঁর ভাগের ধান চালটা অবশ্য এক সঙ্গে ওঠে। এক হাঁড়িতেই তাঁর দু'মুঠো ফোটে। কিন্তু চারজনের পেট তাতে চলে না। কাজেই—

বাধা দিয়ে বললে শচীন—"তাই বল, তাহলে তোর বাবা তোর সব চেয়ে বড় উপকারটা করে যেতে পারেন নি। মানে, বিয়ে করিস নি এখনও। তবে আর কি, খুঁজে পেতে পয়সাওয়ালা ঘরের একমাত্র কন্যা একটির পাণিগ্রহণ করে ফেল। সর্ব দুঃখ দূর হয়ে যাবে আমার মত!"

ভড়কে গেলাম। সর্ব দুঃখ দূর হওয়ার গলার আওয়াজ কি এই রকম! নিজেকে নিজে ভেংচানো নয় ত'। কি জানি কি ব্যাপার।

যাক্ গে—ওধার দিয়েই গেলাম না। মহা উৎসাহে বলে উঠলাম—"ও, তাই বল। বিয়ে থা করে ফেলেছিস! বাঃ—এতক্ষণ বলিস নি কেন, বলতে হয়, আমি ভাবছি কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবি আমাকে কে জানে! গৃহ, গৃহিণী সবই তোর আছে এখানে, একথা আগে বলতে হয়!"

খুবই বাঁকা সুরে বললে শচীন—"বেশী লাফাস নি। নিয়েই ত' যাচ্ছি গৃহ-গৃহিণীর কাছে। আরামটা এখন সইলে হয়!"

আমরা মাঠ পার হলাম।

আরামের অঢেল বন্দোবস্ত।

ঝি, চাকর, দারোয়ান, গোমস্তা গিজগিজ করছে বাড়ীতে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা নয়, সাধারণ ধরণের দোতলা একখানা বাড়ী। পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ গুঁতোগুঁতি করছে তার ভেতর। কে যে আত্মীয়, কে যে অনাত্মীয় বোঝা অসাধ্য। বাড়ীতে সবাই কর্তা, সবাই গিন্নী।

বই কাঁধে করে শচীনকে হেঁটে আসতে দেখে এক সঙ্গে জনা দশেক ছুটে এল। হায়, হায় করতে লাগল অনেকে, তবে বাবুকে হেঁটে আসতে দেখে খুব বেশী যে চমকে গেছে কেউ, তা মনে হল না। রাস্তা থেকে গোটা তিনেক সিঁড়ি উঠলেই বাইরের ঘর। ঘরের দু'ধারে দু'খানা তক্তাপোশ। তক্তাপোশের ওপর নায়েব-গোমস্তারা লাল খেরো বাঁধানো খাতা খুলে বসে আছে। মাঝখানে একখানা গোল টেবিল, টেবিলের চারপাশে খান কয়েক চেয়ার। শচীন ঘরে ঢুকতেই অনেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। ও ফিরেও তাকাল না, এ পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে

ওপাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন ওর হাত থেকে বইগুলো নিতে গেল। বই না দিয়ে হুকুম দিলে শচীন—"বাগানের দোতলায় এঁর থাকবার ব্যবস্থা কর। আমার ঘরে চা দাও দু'জনের।" আমার দিকে না তাকিয়েই বলল—"আয় রে।"

ওর পেছনে আমিও ভেতরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ডান ধারে পর পর দশ বারটা দরজা, সব দরজাগুলো বন্ধ—বাঁ দিকে উঠান। দরজাগুলোর সামনের টানা বারান্দা দিয়ে আমরা চললাম। বারান্দার শেষ মাথায় আর এক দরজা। পকেট থেকে চাবি বার করে সেই দরজা খুলল শচীন। আমরা ঘরে ঢুকলাম।

আমাদের পেছনে একজন চাকরও এসে ঢুকল ঘরে। ঢুকে সব ক'টা জানালা দরজা খুলতে লাগল। দরজা জানালাগুলো খুলতে ঘরের ভেতর আলোয় ভরে গেল। ঝক্‌মক্ করে উঠল ঘর ভরতি আলমারী, আলমারী বোঝাই বই। একধারে ছোট একখানি খাট, কোনও রকমে একজনের শোয়া চলে। আর ধারে একখানি ছোট টেবিল—একটি মাত্র ছোট চেয়ার। ঘরের ওধারে ছোট্ট একটু বাগান। বাগানের শেষে পাঁচিলের গায়ে একখানি দোতলা বাড়ী। বাড়ী মানে নীচে একখানি ঘর, ওপরে একখানি ঘর। শচীন বইগুলো নামাল টেবিলের ওপর। নামিয়ে বলল—"ঐ ওপরের ঘরখানায় তুই থাকবি। ওই পাঁচিলের ওধারেই গঙ্গা। ঘরে বসে আরামে গঙ্গা দেখবি। ঢেউ নেই মরা গঙ্গায়। ঢেউ থাকলে ঢেউ গুণতিস। সে উপায়ও নেই। না থাক, কিন্তু মনে রাখিস এখন থেকে তুই বাবু। এ বাড়ীর জামাই হুজুরের বন্ধু-হুজুর। 'বাবু' আর 'হুজুর' শুনতে পাবি দিনে রাতে হাজার বার। এও কি কম কথা নাকি—"

কথাটা আবার খট্ করে লাগল কানে। বেশ বাঁকা কথা। কি জানি এভাবে বাঁকা কথা বলার মধ্যে কি বারতা লুকিয়ে আছে!

যে ছোকরা জানালা দরজা খুলছিল সে তার কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে চক্ষের নিমেষে টেবিল চেয়ার আলমারীগুলো ঝেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন আধা বুড়ো লোক চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল। সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একখানা চেয়ার আনলে। আমরা বসলাম।

শচীন বলল—"এর নাম শুনে রাখ, এ হল ভবতারণ। অনেককে তরিয়েছে। তারণ—ইনি আমার বন্ধু। বাগানের দোতলায় থাকবেন। ভয়ানক শাঁশালো ঘরের ছেলে। কলকাতায় বসে দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছিলেন, ধরে নিয়ে এলাম।"

চা করা থামিয়ে ভবতারণ দু'হাত জোড় করে অনেকটা নুয়ে পড়ে একটি প্রণাম নিবেদন করে দিলে। নিখুঁত অভিনয়, কিন্তু এতটুকু ভাবান্তর দেখা গেল না লোকটির মুখে। বুঝতে কষ্ট হল না যে, জীবনভোর ও এই ভাবে নুয়ে পড়ে জোড় হাতে অগুণতি প্রণাম করে এসেছে অনেককে। কাজেই ও কাজটিতে ওর একটুও কষ্ট হয় না বা ভুল হয় না। কিন্তু আমি পড়লাম মুশকিলে। শাঁসালো ঘরের ছেলের পায়ে যে শাঁসহীন স্যাণ্ডেল-জোড়া রয়েছে, সে দু'পাটি কোথায় লুকব—ভেবে পেলাম না।

স্যাণ্ডেল-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলে শচীনই আমাকে। কি করে সে জানতে পারলে আমার মনের ভাব, বলতে পারব না। একটু পরেই ভবতারণকে বললে—"এই দেখ ভবতারণ, কাল রাত্তিরে বাবু কোথায় গিয়ে পড়েছিলেন, সেখান থেকে উঠে আসবার সময় কার ছেঁড়া চটি পায়ে গলিয়ে চলে এসেছেন। ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখাটা হল, নয়ত এতক্ষণে কোথায় যে গিয়ে পৌঁছতেন কে জানে। যাক্ গে—তুমি দেখ গিয়ে ওঁর থাকবার ঘরটা ঠিক হল কি না। ঐ গঙ্গার ধারের ওপরের ঘরে ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি আমি।"

চা ঢেলে দিয়ে ভবতারণ আর একবার মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেল। বিশ্বাস না অবিশ্বাস কিসের হাসি যে তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিল, ঠিক ধরতে পারলাম না।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এটা কি হল ?"

শচীন বললে—"কিছু না। বাবু হয়ে গেলি। বাবু না হলে এ বাড়ীতে থাকবি কি করে ? এতক্ষণে ভবতারণ পদ্মমণি ঝিকে বলছে যে বাবুর মত বাবু একজন এসে গেছে বাড়ীতে। পদ্মমণি বলবে নয়নবালাকে। সে বলবে বামুনঠাকুর গোপেশ্বরকে। গোপেশ্বর বলবে আসমানকে। আসমান ঠিক সময় আর মেজাজ বুঝে কথাটা বাড়ীর কর্ত্রীর কানে তুলবে। যদি

তিনি বিশ্বাস করেন তোর দাম আরও বাড়বে। আমারও মান বাড়বে। একটা দামী বন্ধু অন্ততঃ আছে আমার, সেটা তিনি জানবেন।"

ভারি বিশ্রী লাগল ব্যাপারটা। কিন্তু কথা বাড়িয়ে কোন লাভ হবে বুঝলাম না। চুপ করে চা খেতে লাগলাম। একখানা সন্থ কেনা বই খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল শচীন।

বহরমপুরের ঘোষ ভিলাতে বাবু মাত্র একজন। নাম—মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সিংহ বাহাদুর। লাট কল্যাণকোটের মালিক স্বর্গগত ভূস্বামী রায় জগত্তারণ ঘোষ বাহাদুরের একমাত্র কন্যা প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা শুক্তিসুন্দরী দেব্যার স্বামী—মহামহিম মহিমার্ণব কুমার সিংহ বাহাদুর। নায়েব গোমস্তা ঝি চাকররা বাইরের লোকের কাছে শচীন্দ্র কথাটি বাদ দিয়ে মহাসম্ভ্রমের সঙ্গে বলে—কুমার সিংহ বাহাদুর। আর নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় সংক্ষেপে বলে জামাইবাবু। জামাই-বাবুকে সবাই পছন্দ করে, সম্মানও করে, কিন্তু জামাইবাবু কেমন যেন ঠিক জামাইবাবুর মত নয়। তবে নামটায় 'কুমার' আর 'সিংহ' থাকায় সকলেই খুব সন্তুষ্ট। ঘোষ বাহাদুরের চেয়ে কুমার সিংহ বাহাদুর ঢের ভাল নাম। স্বর্গগত রায় বাহাদুরের ছেলে থাকলে লাট কল্যাণকোট এখনও ঘোষ বাহাদুরের জমিদারীই থাকত। মালিক কুমার সিংহ বাহাদুর বলার আরাম আর মজা করাও কপালে ঘটে উঠত না।

জগত্তারণ জগৎ তরাবার জন্যে কি কতদূর করতে পেরেছিলেন তার ইতিহাস এখনও লেখা হয় নি। চাকর-বাকররা যে সব কাহিনী বলে বেড়ায় তা থেকে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, ভূ-ভার হরণ করার জন্যে বিস্তর মানুষ খুন করেছিলেন তিনি। অনেকের ঘর দরজা পুড়িয়ে ছিলেন। অনেকের বৌ ঝি উধাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য জটিল এমন একটি কর্ম শেষ জীবনে করেছিলেন, যে কাহিনী ভুলতে ত' পারেই না কেউ, এমন কি ঐ রকম একটা কাণ্ড করার কি হেতু থাকতে পারে তাও আজ পর্যন্ত গবেষণা করে বার করতে পারে নি কেউ। কর্মটি

হচ্ছে—একমাত্র কন্যাকে সম্পত্তির মালিক না করে যথাসর্বস্ব জামাইয়ের নামে লিখে দেওয়া। মেয়েকে শুধু কলকাতার খান দুই বাড়ির জীবন-স্বত্ব লিখে দিয়ে গেছেন তিনি। সেই বাড়ী দু'খানার ভাড়া মাসে শ' পাঁচেক টাকা আদায় হয়। তাই দিয়েই প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা শুক্তি সুন্দরী দেব্যার আহার-বিহার ইত্যাদি নির্বাহ হয়।

এ সমস্ত ভেতরের ব্যাপার জানার জন্যে মোটেই কষ্ট করতে হয় নি আমাকে। জানতে আমি চাইও নি। ও বাড়ীতে তিনটে দিন থাকলে সকলেই এ সব কথা জানতে পারে। জানতে পারবেই, কারণ ঘোষ ভিলায় দু'টো সংসারের নায়েব গোমস্তা ঝি চাকর সবই আলাদা। এমন কি দু'টো রান্না ঘরে দু'জন বামুনে রান্না করছে দু'রকমের ভাত তরকারি। তার আস্বাদও দু'রকম। আমার বরাত জোরে আমি দু'রকমের আস্বাদই পেয়েছিলাম।

পুব দিক থেকে মস্ত একটা তারা আস্তে আস্তে উঠে আসছিল তখন। নিস্তরঙ্গ গঙ্গার জলে থরথর করে কাঁপছিল তার আলো। বহুদূর—সেই কলকাতা—তারও অনেক দক্ষিণে আছে সাগর, সেই সাগর থেকে উঠে ছুটতে ছুটতে এত দূর এসে বেচারা বাতাস হাঁপিয়ে পড়েছিল। তাই তার গতি হয়েছিল মন্থর, আর গা দিয়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছিল। আমি সেই বাতাসের ঘামে ভিজছিলাম পাঁচিলের বাইরে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে। দেখছিলাম আকাশের তারাটা কেমন কাঁপছে গঙ্গার জলে।

ভয়ানক চমকে উঠলাম পেছনে মানুষের গলা শুনে। কিছু না ভেবেই সরে দাঁড়ালাম একটা ভাঙ্গা থামের আড়ালে। যে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল দু'টি ছায়া মূর্তি। তারা একজন অপরের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে এল। এগিয়ে গেল জলের দিকে।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিলে তারা। তারপর দাঁড়াল দু'জন দু'জনকে ধরে। অনুচ্চ কণ্ঠে একজন বললে—"এ ছায়াটা কার!" কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক না হলেও বেশ উদ্বেগ ফুটে উঠল।

দ্বিতীয় জনের গলায় ফুটে উঠল বিহ্বলতা। বিভীষিকা দেখলে ওই সুরে কথা বলে মানুষ। তাছাড়া তার কথা শুনে বোঝা গেল যে মানুষটির কণ্ঠে প্রথমার মত আভিজাত্য নেই। সে বললে—"ওমা গো, ওটা আবার কি গো—"

ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে এক পা এগলাম। তৎক্ষণাৎ দু'জনেই পেছন ফিরে তাকাল এবং একই সঙ্গে প্রশ্ন করলে—"কে?"

সেই ভোর রাতে পাছে চেঁচামেচি করে লোক জমা করে ফেলে সেই জন্যে আর এক পা এগিয়ে গিয়ে বললাম—"আমি ভূত নই—ভয় পাবার দরকার নেই। আমার ছায়া দেখে ভয় পেয়েছেন আপনারা। ভূতের কিন্তু ছায়া থাকে না।"

কয়েকটি মুহূর্ত নিস্তব্ধ। মাত্র কয়েক হাত দূরে তাঁরা, নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। একটু পরে যাঁর কণ্ঠে আভিজাত্য খেলা করে অনায়াসে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কে? ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন এ সময়?"

শান্ত গলায় বুঝিয়ে বললাম—"ঐ দোতলার ঘরে আমি দু'দিন আছি। শচীন আমার বন্ধু।"

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন আমার দিকে তাঁর সঙ্গিনীকে ছেড়ে। আসার ধরণ দেখে মনে হল বড়ই ক্লান্ত তিনি। একজনের ওপর ভর না দিয়ে সত্যিই তাঁর চলার ক্ষমতা নেই। এসে দাঁড়ালেন আমার হাত খানেক তফাতে। তারার আলোয় বেশ অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন আমার মুখটা নিজের মুখখানি তুলে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন নিজেকেই নিজে বললেন—"কই, তেমন ত' নয়!"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কি! কি তেমন নয়?"

যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছেন, সেই সুরে বললেন—"না, সে কথা থাক। আচ্ছা—বলত আমি কে?"

কি জানি কি করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"তুমি, তুমি শুকতারা।"

প্রায় চীৎকার করে উঠলেন তিনি, "এঁ্যা! কি বললে?"

আর একবার উচ্চারণ করলাম—"তুমি শুকতারা।"

সেই প্রায় অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম তাঁর চোখ দু'টির পাতা বন্ধ হয়ে গেল। আত্মগত ভাবে বার বার বলতে লাগলেন তিনি আস্তে আস্তে—"তোমার বন্ধুকে একবার ঐ নামে আমায় ডাকতে বলতে পার! একটি বার—শুধু একটি বার সে আমায় তোমার মত করে বলুক—তুমি শুকতারা, তুমি শুকতারা, তুমি শুকতারা—"

বলতে বলতে তাঁর পা দু'টো যেন ভেঙে পড়ল। শরীরটার ভার রাখতে পারলেন না যেন তিনি নিজের পায়ের ওপর। আস্তে আস্তে অতি অপরূপ ভঙ্গিমায় বসে পড়লেন আমার সামনে।

পেছনে থেকে ঝি-টা দৌড়ে এসে জাপটে ধরল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি মিনতি করতে লাগলেন—"সরে দাঁড়া, ওরে একটু সরে দাঁড়া আমার কাছ থেকে—এখন আমায় ছুঁস নে!"

ঝি-টা হাত তিনেক পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল তাঁকে ছেড়ে দিয়ে।

কি বলা উচিত, কি করা দরকার তখন, কিছুই মাথায় এল না আমার। জড় পদার্থের মত দাড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে।

শুকতারাটা তখন মাথার ঠিক ওপরে এসে পৌঁছে গেছে।

জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেগুলো একেবারে না ঘটলে ভাল হত, না মন্দ হত, তাই এখন অনেক সময় ভাবি বসে বসে। যেমন সেদিন ভোর রাতে যদি আমার ঘুম না ভাঙত ঘোষ ভিলার পাঁচিলের ধারের দোতলার ঘরটিতে। ঘুম ভেঙেছিল, বেশ হয়েছিল, কিন্তু নীচে নেমে ঘাটে যাবার দরকার যদি না হত সে সময়। যদি তখন শুকতারাটা না উঠত আকাশের কোণে, যদি ও রকম ভাবে না কাঁপত শুকতারাটা গঙ্গার জলে, যদি শিশির-ভেজা বাতাস সে সময় অত শান্ত ভাবে না বইত। যদি আমি হাবা-গঙ্গারামের মত সেই তারার নাচন না দেখতাম আত্মহারা হয়ে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে। যদি একটু আগে নিজের ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়তাম। তাহলে—

তাহলে হয়ত ঘোষ ভিলার আকাশে একদিন ঘন ঘোর মেঘ এসে ছেয়ে ফেলত না। কুমার সিংহ বাহাদুর শুধু বই কিনতেন আর বই পড়তেন তাঁর মহিমার্ণব শ্বশুরের টাকায়। আর শ্রীযুক্তা শুক্তিসুন্দরী দেব্যা তাঁর মাসিক পাঁচশ' টাকা আয়ে মহা সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ঘর তিনখানার মধ্যে ফুলমণি, আসমানী, নয়নতারাদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকতেন।

কিন্তু যা হবার নয় তা হয় কি করে। কাজেই আকাশের শুকতারাটা আকাশ থেকে তখন মিটিমিটি হাসছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম জবুথবু হয়ে মাটির শুকতারার সামনে। গঙ্গার জলে কিন্তু ঢেউ ছিল না তখন। তারপর কতকগুলো পাখী একসঙ্গে কিচির মিচির করে উঠল নানাদিক থেকে। খানকতক গরুর গাড়ী কঁ্যাচর কঁ্যাচ শব্দ করে চলতে লাগল গঙ্গার ওপারে। ঘোষ ভিলার ভেতর কচর কচর শব্দে গরুর বিচালি কাটা সুরু হল। ঠাকুরঘরের পুরুতমশাই খড়ম খটখট করে এগিয়ে আসতে লাগলেন ঘাটের দিকে। সেই আওয়াজ শুনেই বোধ হয় ঝি-টি আবার এগিয়ে এল কাছে। বললে—

"লাও গো ওঠ, ঘরে চল, মানুষ জন এসে পড়বেক যে ঘাটকে।"

নতমুখী শুকতারা কোনও রকমে বললে—"যা যা সরে যা এখান থেকে। ছুঁস নে আমায়, দিনের আলোয় ছুঁস নে খবরদার আমাকে। ছুঁলে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব। ইস্ কি ঘেন্না—"

স্পষ্ট দেখতে পেলাম বারবার শিউরে উঠল সেই ক্ষীণ দেহখানি। যেন কেউ ছুঁয়ে দিলে এখনই ঐ লতাটি শুকিয়ে মরে যাবে।

বেশ আলো ফুটেছে তখন। তাকালাম ঝি-টার দিকে। তৎক্ষণাৎ নিদারুণ বিতৃষ্ণায় আমারই দম আটকে এল। মানুষ কালো হয়, বেটপ হয় বা বেয়াড়া রকমের বেমানান হয় কারও অঙ্গ-প্রতঙ্গ। কিন্তু এ সমস্ত কিছু না হলেও এমন এক আধজন মানুষ চোখে পড়ে, যাদের দিকে চাওয়া যায় না শুধু তাদের হাবভাব চালচলন বেশভূষার জন্যে। দেখলেই মনে হয় যে এতবড় নচ্ছার আর দুনিয়ায় দু'টি নেই। চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁট দু'খানার কোঁচকানিতে, নাকের ডগাটার অদ্ভুত রকম ওপর-তোলা গঠনে হাত দু'খানার নিশপিশনি ভাবে, মারমুখো বুক আর অতি পুষ্ট নিতম্বের

নির্লজ্জতায়, তার ওপর রঙ, কাজল, চুল বাঁধা আর টেনেটুনে জামা-কাপড় পরায় এমন একটা উৎকট হ্যাংলাপনা ফুটে ওঠে যে, তা দেখে অতি বড় বেল্লিকেরও গা ঘিনঘিন না করে পারে না। ভয় হয়, বুঝি কামড়ে দিতে আসছে তেড়ে বা জিভ বার করে চাটতে থাকবে এখনই যা পড়বে নাগালের মধ্যে। বীভৎস ক্ষুধার ষোল আনা সাকার রূপ, যা দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই থাকে না।

সেদিন সকালে আমার চোখের সামনে বসে ছিল একটি নিবন্ত আলোক শিখা, আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি জ্বলন্ত মশাল। নিবন্ত আলোক-শিখা তখনও অনুনয় করছিল—"সরে যা, দূরে সরে যা, দিনের আলোয় আসিস নে আমার সামনে, ছুঁস নে আমাকে। জ্বলে পুড়ে মরে যাব আমি। ওরে তোদের দিকে দিনের আলোয় তাকালে আমি অন্ধ হয়ে যাব যে।"

স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম সেই কাকুতি মিনতি। পাঁচিলের গায়ে ঘাটে আসার দরজার ওধার থেকে কে ডাক দিলে—"রাণী, রাণী, রাণী।"

সে ডাকের ছন্দে কি যে ছিল বলতে পারব না, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কে যেন গুমরে কেঁদে উঠল সেই শব্দ তিনটির ঝঙ্কার শুনে। ছটফটিয়ে উঠল আমার সামনে বসা শুকতারাটি। চীৎকার করে উঠল—"পালা, পালা, ওরে হতচ্ছাড়ী লুকিয়ে ফেল নিজেকে, এসে পড়ল যে। আমার যে এখনও স্নানই হয় নি। হায় হায় কি করি আমি!" —বলতে বলতে ছুটলো সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে। সেই বিকট মূর্তি মিলিয়ে গেল ঘাটের ওপাশে কচু বনের মধ্যে, আর সেই মুহূর্তে এক দীর্ঘকায় পুরুষ তীর বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে শুকতারার পথ আগলে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে করুণ ভাবে কেঁদে উঠল শুকতারা—"ওগো ছুঁয়ো না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—আমায় ছুঁয়ো না। এখনও আমার স্নান হয় নি যে। আর কখনও এমন দেরী হবে না আমার—"

পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল পুরুষটি, যেন ধাক্কা দিয়ে কে সরিয়ে দিল তাকে। গঙ্গার জলে ঝপাং করে একটা শব্দ হল। আমি পা টিপে টিপে দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দেখবার আর আছেই বা কি তখন সেখানে।

বহরমপুর থেকে জিয়াগঞ্জ। বোধহয় মাইল পনেরো ষোল হবে। শচীন বলেছিল—"একখানা নড়বড়ে গাড়ী রেখে গেছেন শ্বশুরমশাই। সেটাতে চড়েই যাব। কপাল ভাল হলে ঘাড় থেকে মাথা দু'টো ছিটকে পড়ার আগেই পৌঁছে যাব সেখানে।"

বেলা এগারোটা নাগাদ ঘাড়ে মাথা নিয়েই আমরা নিরাপদে পৌঁছে গেলাম জিয়াগঞ্জ বাগান বাড়ীতে। আমাদের অনেক আগেই শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী পৌঁছে গেছেন সেখানে। পৌঁছে বাগানের এক ধারে উনুন বানিয়ে রান্না চাপিয়ে দিয়েছেন। একটি চাকর আর একজন বামুন আছে তাঁর সঙ্গে। স্বামীর ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্যে অনেক রকমের তোড়জোড় করতে হয়েছে তাঁকে। দু'দিন দু'রাত একই বাড়ীতে কাটালাম ওঁদের সঙ্গে। সেখানে সুবিধা হল না ওঁর আলাপ পরিচয় করার। ষোল মাইল ছুটে আসতে হল এই জঙ্গলে। বড়লোকের বড় ব্যাপার—এই না হলে আর আমিরী মেজাজ!

টকটকে লাল পাড় দুধে গরদ পরে,আঁচল গলায় দিয়ে, সেই আঁচল সুদ্ধ দু'হাতে বুকের কাছে জোড় করে যিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন, তাঁর দিকে চেয়ে চোখ আর মন দুই-ই জুড়িয়ে গেল। জবাফুলের মত ঘোমটার রঙ, ঘোমটাটি কপালের ওপর থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত লম্বা ধরণের ত্রিভুজের আকার ধারণ করেছে, সেই ত্রিভুজের ভেতর কুচকুচে কালো চুলের মাঝখানে ফুটে আছে একখানি মুখ। সে মুখে নাক চোখ কেমন তা দেখবার আগেই যা নজরে পড়ে তা হচ্ছে স্নিগ্ধ শুচিতা আর অকপট সরলতা। ঠোঁট দু'খানি অল্প একটু নড়ল, অপরূপ সুরে তিনি বললেন—"আসুন, আসুন। খুব কষ্ট দিলুম আপনাকে। কিন্তু কি করি, ও বাড়ীতে আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারতাম না আমি—"

শচীন বললে—"মন বেশী না খোলাই ভাল কিন্তু। মন খোলাখুলির ইনি বোঝেনই বা কোন কচু, স্ত্রীলোককে এখনও উনি স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই শেখেন নি।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—"দেখলেন ত'। সোজা কথা কিছুতেই ওঁর মুখে আসে না। আচ্ছা, আগেও কি উনি এই রকম ছিলেন? আপনাদের সঙ্গেও এই রকম কথাবার্তা বলতেন?"

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম—"ওর কথা আপনি ধররেন না অত। ওটা ওর চিরকেলে স্বভাব।"

হো হো করে হেসে উঠল শচীন। হাসি সামলে বললে—"বাঃ, বিয়ে না করেই শিখলি কি করে যে, মহিলাদের কথায় নির্বিচারে সায় দেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। আর হ্যাঁ—ভোরবেলা ও তোমার কি যেন একটা নতুন নাম দিয়েছে, রাণী?"

চমকে উঠলাম আমি, একটু আড়ষ্টও হয়ে উঠলাম। সে কথাটিও ইতিমধ্যে শচীনকে শোনানো হয়ে গেছে!

চকিতে অদ্ভুত একটা আলো খেলে গেল রাণীর চোখ দু'টিতে। এক মুহূর্তের অনেক কম সময়ের ভেতর তাঁর চোখের তারা দু'টি চোখের কোণে গিয়ে শচীনের মুখ ছুঁয়ে যথাস্থানে ফিরে এল। নত হল আঁখি পল্লব। কেমন যেন একটু অস্পষ্ট শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। বললেন—"যাও—তুমি ত' সে নামে ডাকলে না একটি বার।"

দরাজ গলায় শচীন বলতে লাগল—"আহা-হা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন। দাঁড়াও দু'দিন রপ্ত করে নি আগে। এর মধ্যে ফুরসতই বা পেলাম কখন বল। উনি ত' নামকরণ করেই সরে পড়লেন। আমি গিয়ে দেখলাম, নাম শুনেই তোমার অস্ত যাবার মত অবস্থা। তারপর থেকে ত' শুধু হুকুমই তামিল করছি। তোমায় পাঠালাম, তোমার মালপত্র সব পাঠালাম, ওকে নিয়ে এলাম। কিন্তু বসতে টসতে দেবে ত' আমাদের, না সারাটা দিন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তোমার সামনে।"

শুনে তিনি অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, অকৃত্রিম লজ্জিতও হলেন। তাড়াতাড়ি এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে বললেন—"আসুন আসুন, চলুন, বসবেন চলুন। দেখুন ত' কি অন্যায়, মিছিমিছি এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

শচীন বললে—"চল্ রে, বসিগে চল। সারাটা দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাব্য করা পোষাবে না আমার।"

কাব্য না করলেও সেদিনটা কিন্তু বড় শান্তিতে কেটেছিল আমাদের। একটি বারের জন্যেও ছন্দপতন ঘটল না। একবারও মনে হল না যে, সেই আমার বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। মস্ত বড় জমিদারের একমাত্র কন্যা, যাঁর প্রতাপে ঘোষ ভিলার প্রতিটি মানুষ থরথর করে কাঁপে, তাঁর সঙ্গেই যে সারা দিন বকে ম'লাম, এটা খেয়ালই করতে পারলাম না।

উঁচু দরের রুচি তাঁর, তার প্রথম পরিচয় হল ঘোষ ভিলার পঞ্চাশ ষাট জোড়া কেতা-দুরস্ত চোখের নাগালের বাইরে পালিয়ে আসা। সত্যিই ঘোষ ভিলার জাঁকজমক আর ছেঁদো আভিজাত্যের মধ্যে অত সহজে মন খুলে আলাপ পরিচয় করতে পারতাম না আমরা। সবচেয়ে বড় কথা, জিয়াগঞ্জের বাগানে ঘাসের ওপর কচি-কলাপাতা পেতে আতপ চালের ভাত আর নিরামিষ তরকারি খেয়ে শচীনও তার নিজস্ব বাঁকা বুলি বলতে ভুলে গেল। কথায় কথায় আমি কালীগঞ্জের কাহিনী সব বলে ফেললাম। সে সময় কি করত শচীন, কি কি খেয়াল ছিল তার, কি খেতে ভালবাসত, বন্ধুরা কে কেমন ছিল, ঝগড়া মারামারি করত কি না, এই সমস্ত তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কথা তুলে তাঁর যা জানবার তা তিনি জেনে নিলেন। গল্প করতে করতে কত কি যে বলে ফেলেছি তা খেয়াল হল সন্ধ্যার আগে চা খেতে বসে। এমন অনেক কিছু বলেছি যা না শোনানোই উচিত ছিল বন্ধু-পত্নীকে। বিশ্রী বোধ হতে লাগল, শুনে উনি কি মনে করেছেন কে জানে!

কি মনে করেছেন জানবার জন্যে চট করে একবার তাকালাম ওদের দিকে। দু'জনেই নিজের কাজে ব্যস্ত। বন্ধুটি আমার বিকট মুখভঙ্গী করে ডাহা কাঁচা একটা পেয়ারার গা থেকে এক খাবলা ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে কামড়াচ্ছে। বন্ধুপত্নী মাথা হেঁট করে একটা টিনের কৌটোর ঢাকনা খোলার জন্যে হিমশিম খাচ্ছেন।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালাম—"আমায় দিন ওটা, খুলে দিচ্ছি।" দু'জনেই একসঙ্গে আমার দিকে তাকাল। এমন ভাবে চেয়ে রইল যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখেছে।

বললাম—"ঐ কৌটোটা চাচ্ছি। আপনার হাতে লাগবে। আমায় দিন, আমি খুলে দি।"

আস্তে আস্তে বন্ধুপত্নীর মুখ কালো হয়ে উঠল। চোখ দু'টিতে ফুটে উঠল গভীর ক্লান্তি। কৌটোটা একটু ঠেলে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

কি হল? কি বললাম আমি! এমন কি বললাম যে ওরকম আঁধার হয়ে উঠলেন উনি?

থতমত খেয়ে হাত টেনে নিলাম। পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শচীন ভাল-মানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে, হল কি তোর হঠাৎ?"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে বললাম—"আমার! আমার আবার হবে কি!" টিনের কৌটোটা টেনে নিয়ে একটা চামচের বাঁট দিয়ে কৌটোর ঢাকনিতে চাড় দিতে দিতে শচীন বললে—"তবে যে হঠাৎ আবার পিছচ্ছিস?"

মাথা মুণ্ডু কিছুই না বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম—"তার মানে?"

"মানে হচ্ছে"—শচীন আরও জোরে চাপ দিলে চামচেটায়। খট্ করে শব্দ হল, ঢাকনিটা ছিটকে উঠল ওপর দিকে। শচীন শেষ করলে কথাটা—"হঠাৎ তোর শুকতারাকে আপনি আজ্ঞে আরম্ভ করলি কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

শুনে হাঁ হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে ওরকম কালো হয়ে গেল ওর মুখ! তাঁকেই বললাম—"এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে তুমি অত চটে গেলে শুকতারা! আমি—মানে অতটা খেয়াল করতে পারি নি—"

শুকতারা মুখ ঘোরাল এদিকে। জলে ভরে উঠেছে তার চোখ দু'টি। ধরা গলায় বললে—"সে আমি বুঝেছি। পৃথিবীতে খেয়াল করে কেউ আমায় 'তুমি' বলতে পারবে না। যদিও বা কেউ বলে ত' অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলবে। তারপর যে মুহূর্তে ধরতে পারবে নিজের ভুল, সঙ্গে সঙ্গে আপনি আজ্ঞে আরম্ভ করে দেবে। আমি যে পর, নিছক পর একেবারে। দুনিয়াসুদ্ধ সকলেই যে চিরকাল পর ভেবে আমায় দূরে ঠেলে দেবে—"

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি যা মুখে এল বলে ফেললাম—"না না, ওসব কিছু ভেব না তুমি, কখ্খনো আর ওরকম ভুল হবে না আমার।"

শচীন একান্ত নিরীহ গলায় বললে—"অতঃপর চা ঢালা চলুক এবং তারপর আমরা ফিরে যাই আবার স্বস্থানে, তাহলেই সব দিক বজায় থাকে এখন।"

কথাটা কি করে জানাজানি হয়ে গেল বলতে পারব না, কয়েকদিন দেখলাম বাড়ীসুদ্ধ মানুষ শুকতারা বলতে সুরু করেছে। পুরুত মশাই বললেন—"যাও ত' বাবা ধনুকধারী সিং, মা শুকতারাকে জিজ্ঞাসা করে এস, আজ ওঁর তরফে ক'জন প্রসাদ পাবে।" এ-তরফের নায়েব নাগমশাই, ও-তরফের নায়েব যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বললেন—"আপনাদের শুকতারা দেবীর খয়রাতী খাতে তেরো টাকা উঠিয়ে নিন। এ-তরফের ও-তরফের মোট সাতাশ টাকা বার আনা কাশীর টোলে পাঠান গেল।" ও-তরফের দারোয়ান এ-তরফের সর্দারকে একটু তাতিয়ে দেবার জন্যে বললে—"আরে সোর্দার, তুমার কুমারসিং হুজুর বহুত বড়া আদমী আসেন, লেকিন হামার শুকতারা মাইজী বড়া দয়ালু আসেন, একদম পাঁচ পাঁচ রূপেয়া বকশিশ ফরমাস দিসেন হরেক আদমীকো।"

কুমার সিং হুজুরের চাকরাণী পাঁচুর মা প্রকাণ্ড ঘড়াটা কাঁখে নিয়ে ঘাট থেকে উঠে আসতে আসতে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেব্যার পদ্ম ঝিকে এঁটো বাসন হাতে নামতে দেখে পাঁচজনে শুনতে পায় এমন চাপা গলায় বললে—"হ্যাঁ-লা কি যেন সব শুনছি, কলকাতা থেকে কে বাবু এসেছেন, তাকে নিয়ে নাকি তোদের রাণী ঠাকরুণ পাগল হয়ে উঠেছেন। আবার কি ছাই যেন নতুন নাম নিয়েছেন, মুখসরা না কি—?"

শুনে পদ্ম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল—"মুখে যা ফেরে না তা বলতে যাও কেন বাবু। ছোট মুখে বড় কথা। তোমার মুখে সরা চাপা পড়ুক। আমরা এখন সবাই রাণীকে শুকতারা বলে ডাকি।" ফট্‌কে বেয়ারা ও-তরফের নন্দা মালীকে টবের গাছে জল দিতে দিতে বললে—"আছিস সুখে মাইরী তোরাই। মেয়েমানুষ না হলে মনিব। গায়ে ফুঁ লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস খালি শুকতারা শুকতারা করে, আর মাইনে মারছিস মাসের-মাস।"

এই রকম সব ঠেস দেওয়া আলাপ চলতে লাগল এ-তরফে ও-তরফে। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ টাকার মনি-অর্ডার রসিদ এলো বাড়ী থেকে। তার সঙ্গে মায়ের চিঠি। মা লিখছেন—"হঠাৎ পঞ্চাশ টাকা কোথা হইতে পাঠাইলে জানাইবা। আজকাল তুমি কি কাজ করিতেছ? বহরমপুরেই বা গিয়াছ কেন?" চিঠিখানি হাতে নিয়ে শচীনের কাছে গেলাম। অম্লান বদনে সে বললে—"তোর মা, আমার মাসীমা। বেশ করেছি আমার মাসীমাকে টাকা পাঠিয়েছি। তাতে তোর মাথায় বজ্রপাত হল কেন?"

বজ্রপাত মাথায় হলে কেমন হত তা বলতে পারব না, তবে অসম্ভব রকমের জটিল চিন্তা সব ঢুকে গেল মাথায়। সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। দোতালায় উঠেই নজরে পড়ল নায়েব নাগমশাই ভারি এক বোঝা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার সামনে। ভদ্রলোক বোধহয় ভাবছিলেন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকবেন কি না। পেছন থেকে গলা খাঁকারি দিলাম। চমকে উঠে এদিকে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁড়িয়ে একবার কপালে তুললেন তাঁর ঘোলাটে চোখ দু'টি তারপর হেঁট হয়ে সেই কাগজপত্র সুদ্ধ দু'হাত জোড় করে একটি সবিনয় নমস্কার নিবেদন করে দিলেন। অতটা বিনীত নমস্কার আশা করি নি তাঁর কাছ থেকে তিনি ত' দূরের কথা, এ পর্যন্ত চাকর-বাকররাও অতটা বিনীত ভাব দেখায় নি আমায়। হঠাৎ আমার কাছে কাগজপত্র হাতে উনি উপস্থিত হলেন কেন, এই সব ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকলাম। তাঁকেও ডাকলাম—আসুন নাগমশাই, ভেতরে আসুন।"

ভেতরে ঢুকে তিনি কাগজের তাড়াটি অতি সন্তর্পণে আমার সামনে বিছানার ওপর রাখলেন। রেখে যেন বিশেষ গোপনীয় কিছু বলছেন, এই ভাবে বললেন—"একটু চোখ বুলিয়ে রাখবেন দয়া করে। রাণী মা মানে আমাদের শুকতারা দেবী আজই আপনাকে দিতে বলেছেন কাগজগুলো। আপনার মতামত পেলে সেই ভাবেই সব ব্যবস্থা করতে হবে কি না।"

এবার আমার চক্ষু কপালে তোলার পালা। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। পারব কি করে, আমি যে কুমার সিংহ হুজুরের বন্ধু-হুজুর! কর্মচারীদের সঙ্গে বেশী কথা বলা কি আমার সাজে। নিজেকে

সামলে নিলাম। কি জানি কি ব্যাপার আছে ঐ নথিপত্রের ভেতর।

সংক্ষেপে বললাম—"আচ্ছা, তাই হবে।"

নাগমশাই আর একটি অতি বিনীত নমস্কার নিবেদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করতেও ভুললেন না।

নথিগুলো টেনে নিলাম। লাল ফিতের গিঁঠ খুলে ওপরের পাতাটা ওলটাতেই যা নজরে পড়ল তা হচ্ছে একখানি নিয়োগ পত্র। মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে এবং আহার বাসস্থান রাহাখরচ ইত্যাদি সর্ববিধ সুবিধা সহ একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করছেন শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেব্যা। নিয়োগপত্রে তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার সিংহ বাহাদুরও তাঁর নামের নীচে নিজের নাম সই করে দিয়েছেন। নবনিযুক্ত ম্যানেজারটির নাম পড়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাথাটা যেন ঘুরে গেল আমার। ভুল পড়লাম না ঠিক পড়লাম দেখবার জন্যে নথিটা তুলে নিলাম মুখের কাছে। তারপর আবার নামিয়ে রেখে চুপ করে বসে রইলাম।

সেই হল সুরু।

এ জীবনে কত কাণ্ডই ত' কতবার সুরু করলাম। সুরু থেকে শেষ, শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার আশা করেই সুরু করছি যা সুরু করবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি ক'টা ব্যাপারে? পৌঁছতে পারলে ত' তার ফল ভোগ করব। তা সে ফল শুভই হোক আর অশুভই হোক। প্রতিবার প্রতিটি কাজ সুরু করার সময় দপ করে জ্বলে উঠেছি আনন্দে, উত্তেজনায়, ফল লাভ করার আকাঙ্ক্ষায়। তারপর আস্তে আস্তে নিভে গেছি কখন, তা টেরই পাই নি। যেখানকার কাজ সেখানেই থেমে থেকেছে।

সেদিন কিন্তু বহরমপুর ঘোষ ভিলার এক তরফের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে মনের কোণে এতটুকু আনন্দ বা উত্তেজনা খুঁজে পাই নি। তার বদলে গলা, মুখ সব তিক্ত আস্বাদে বিষিয়ে উঠেছিল। বন্ধুর স্ত্রীর ম্যানেজার! করতে হবে না কিছুই, শুধু টাকা ক'টা নেওয়া ছাড়া। অর্থাৎ হাত পেতে

দান নেওয়া মাসের পর মাস। এটা যে কত বড় ছ্যাচড়ামো তা বোঝার মত ক্ষীণ মনুষ্যত্বটুকু বেঁচে ছিল তখনও আমার। কিন্তু উপায় ছিল না কিছুই। পর পর দেশ থেকে যে ক'খানা চিঠি পেলাম তাতে হাত পা অসাড় হয়ে গেল। খবর এল—বন্যায় চাষ হয় নি, বোনটির টাইফয়েড হয়েছে, দু'খানা ঘর পড়ে গেছে জলের তোড়ে। সর্বশেষের সংবাদটি আরও মিষ্টি। মা লিখলেন যে মেয়ে নিয়ে আর গ্রামে থাকতে সাহস পাচ্ছেন না তিনি। প্রতিবেশীরা বড্ড বেশী ধর্ম-চর্চা আরম্ভ করে দিয়েছে। গ্রামের মাঝখানে আমাদের বাড়ীর সামনেই তারা শরীর চর্চার আখড়া খুলেছে। সেখানে সকাল বিকেল রাত্রি সব সময়—"আল্লা হো আকবর" চিৎকারে ধর্মের মহিমা ঘোষণা করা হচ্ছে। সব দিক থেকে তাড়া খেয়ে ঘোষ ভিলার আশ্রয় ছাড়তে সাহস হল না। মাকে লিখে দিলাম, বোনটাকে নিয়ে গৌহাটিতে মামার কাছে চলে যাও। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাব।

তারপর সজোরে মনোনিবেশ করলাম নতুন চাকরিতে। যদিও করবার মত কিছুই খুঁজে পেলাম না। কলকাতার বাড়ী-ভাড়া নিয়ম মাফিক ঠিকই আদায় হচ্ছে মাসে মাসে আর খরচ হচ্ছে। তবে আদায় মাত্র পাঁচশ' টাকা নয়—তার ঢের বেশী। কারণ কুমার সিংহ বাহাদুর নিজের ভাগের বাড়ীগুলোও স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছিলেন।

কয়েক দিন পরে নজরে পড়ল যে, আয় যা হয় তার বেশার ভাগটাই খোদ মালিকের নামে খরচ লেখা হয়। ঝি চাকর দারোয়ান নায়েব গোমস্তার মাইনে, চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি সব জিনিষ পত্রের দাম অর্থাৎ সংসার খরচ সবই খুঁটিয়ে লেখা হচ্ছে। এ সমস্ত ছাড়া দফায় দফায় খোদ মালিকের নামে মোটা টাকা খরচ রয়েছে। এত টাকা নিয়ে ভদ্রমহিলা করেন কি। দান করেন না কি সব? না গয়না গড়ান? খাতাপত্র ঘেঁটে দেখলাম যে তাও নয়। গয়না কাপড় খরিদ আর খয়রাতী খরচ বলে আলাদা দু'টো হিসেব রয়েছে! ভয়ানক খটকা লাগল। এত টাকা নগদ নিয়ে উনি করেন কি?

নায়েব নাগমশাইকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা যায় কি না ভাবতে

লাগলাম। জানতে চাইলে আবার অন্য কিছু মনে করবে না ত' এরা! ভাববে হয়ত, দু'দিনের ম্যানেজার হয়ে বসে লোকটা নিজেকে একজন কেষ্ট-বিষ্টু মনে করছে। মালিক কেন এত টাকা নেন, তাও জানা চাই। কি আস্পদ্দা!

কিন্তু জানা আমার চাই-ই যে। এত টাকা সত্যিই নেন কি না, না জানলে আমার কর্তব্য পালন করা হয় না। ঠিক করলাম, শচীনের কাছেই জিজ্ঞাসা করব ব্যাপারটা। ওকে ত' চিনি ও নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভাববে না।

এত্তেলা না দিয়ে কোনও কর্মচারী মালিকদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। এই হল আদব-কায়দা। মাইনে নিচ্ছি যখন, তখন আদব-কায়দা মানাই উচিত। এই সব সাত পাঁচ ভেবে একজন বেয়ারা পাঠালাম। লিখব কি তাও ভেবে পেলাম না। বন্ধুকে আর তুই বা তুমি বলা চলে কি না তাও ছাই ঠিক করতে পারলাম না। বেয়ারাটাকে মুখে বলে দিলাম—"বল গিয়ে যে, আমি একবার হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" এত্তেলা পাঠিয়ে ভাবতে বসলাম, কি করে কথাটা পাড়া যায় শচীনের কাছে। ওর স্ত্রী কেন এত টাকা নিচ্ছেন, তা জানার কি অধিকার আছে আমার। নেহাত বেয়াদবি করছি বলে মনে করবে না ত'!

চমকে উঠলাম সিঁড়িতে ফটাস ফটাস শব্দ শুনে। ওরকম বেয়াড়া আওয়াজ এ বাড়ীতে একমাত্র শচীনের চটি থেকেই বেরোয়। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম দরজার কাছে।

দরাজ গলায় শচীন বললে—"কি হুজুর, হুকুম কি বলুন। এত্তেলা পাঠিয়েছেন কেন?"

আমতা-আমতা করে বললাম—"আমিই যেতাম দেখা করতে, তাই খবর পাঠালাম। তা তুমি যে এসে পড়বে একেবারে—"

এক দাবড়ি দিলে শচীন—"ফের তুমি বলবি ত' মারব এক থাবড়া। দু'দিনের ম্যানেজার হয়ে ভদ্দর লোক হয়ে গেছিস, না? তুই যদি তুমি বলতে সুরু করিস আমাকে, আমি তাহলে আপনি আজ্ঞে আরম্ভ করে দেব। চল চল, বসিগে ঘরের ভেতর। ওরে আমার ভদ্দরলোক রে—"

ঘরে ঢুকল আমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে। ঢুকেই বসে পড়ল

বিছানার ওপর। সমানে চেঁচাতে লাগল—"আদব-কায়দার তুই জানিস কি কচু? জানিস—আমি এক তরফের মালিক? জানিস—মালিক এলে এক কাপ চা অন্ততঃ খাওয়াতে হয়! হুকুম কর, তোদের তরফ থেকে এক কাপ চা আনতে—নয়ত ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। এক কাপ চায়ের খরচটা ত' খসুক তোদের তরফের।"

দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে বেয়ারাটাকে চায়ের কথা বলে দিলাম। তারপর গিয়ে বসলাম ওর পাশে। বললাম—"ওই খরচের ব্যাপারেই ভয়ানক মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। কাকে যে কথাটা জিজ্ঞেস করব ভেবে পাচ্ছি না। তাই ভাবলাম, তোর কাছেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা।"

শচীন বলল—"কিসের খরচ? এর মধ্যে আবার এমন কি খরচ হল তোদের যে কুলোচ্ছে না?"

তখন সব কথা বললাম ওকে। এত টাকা দফায় দফায় ওঁর নামে খরচ লেখা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে। যদিও মালিক কিসে খরচা করেন তাঁর টাকা তা জানতে চাওয়া অপরাধ, কিন্তু আদতেই মালিক টাকাটা নেন কি না, এইটুকু জানতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। কোথাও সই একটা দেখলাম না যে তাঁর। হচ্ছে কি ব্যাপারটা?"

গম্ভীর ভাবে শচীন বললে—"জেনে রাখ, সব টাকাই সে নিচ্ছে আর খরচা করছে। খরচাটা কিসে করছে তা যদি জানতে চাস্ ত' আরও কয়েকটা দিন দেরী কর। সবই জানতে পারবি, কোনও কিছুই লুকনো থাকে না এ বাড়ীতে।"

লক্ষ্য করলাম শেষ কথা ক'টা বলতে বলতে ওর গলাটা বেশ ধরে এল। ঘাঁটাতে আর সাহস হল না। এইটুকু শুধু বুঝলাম, খরচটা যে ভাবে আমার মালিক করেন সেটা এ-তরফের মালিকের মনঃপুত নয়। শুধু তাই নয়, আমার মালিকের খরচ করার পন্থাটা সকলে জানুক, এও শচীন চায় না।

কে জানে কি ব্যাপার। বড়লোকের মেয়ে তার বাপের টাকা ওড়াচ্ছেন। কিসে ওড়াচ্ছেন, জেনেই বা আমার লাভ কি!

চা এসে গেল। চা খেতে খেতে অন্য কথা আরম্ভ হল।

শচীন বললে—"চ, এবার পুরী ঘুরে আসা যাক। ও-তরফ আবার রাজী হলে হয়। দেখি কথাটা তুলে?"

চা খাওয়া শেষ করে শচীন উঠল। ওকে শিউড়ী যেতে হবে। পরদিন একটা মকদ্দমা আছে। ওর নিজের জমিদারী সংক্রান্ত মামলা। নিজে গিয়ে দেখাশোনা না করলে মামলাটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। উকিলে টাকা খাচ্ছে, নায়েব গোমস্তা ভাগ মারছে আর প্রজা মারা যাচ্ছে। কাজেই ও নিজে চলেছে নিষ্পত্তি করার জন্যে। দিন দুই থাকবে সেখানে, একেবারে মিটিয়ে দিয়ে আসবে মামলাটা।

গঙ্গা পার হয়ে খাগড়াঘাট রোডে গাড়ী ধরলে শচীন। তুলে দিতে গেলাম আমি। গাড়ী ছাড়বার আগে বললে—"শোন একটা কথা। চাকরি ছেড়ে পালাস নি। অন্ততঃ আমি ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি, বুঝলি।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"পালাব কেন?"

অল্প একটু হেসে শচীন বল্‌লে—"তোকে বিশ্বাস নেই। তোদের আত্মসম্মান জ্ঞানটা বড্ড বেশী টনটনে কি না। সে যাক, এত তাড়াতাড়ি যে আমাকে বেরতে হবে তা ভাবতে পারি নি। তা মাত্র দু'দিনের জন্যেই ত' যাচ্ছি। তোর শুকতারা রইল। জেনে রাখ ওর অসুখ আছে একটা। শক্ত অসুখ। ফিরে এসে তোকে সব বলব।

গাড়ী চলতে সুরু করল। শচীন আমার হাতে একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে। গাড়ীটা মিলিয়ে গেল একটা বাঁকের ওধারে গঙ্গা পার হয়ে।

ফিরে এলাম। মনটা বেশ ভারি হয়ে রইল। যার সম্পর্কে এ বাড়ীতে আসা, সে চলে গেল। হোক দু'দিনের জন্যে, তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল। অথচ শচীনের সঙ্গে আমার সাত দিনেও একবার দেখা হত না। সে তার বই পত্র নিয়ে নিজের ঘরে বন্ধ থাকত। আমি আমার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে মরা গঙ্গার ঢেউ গুণতাম।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবতে সুরু করলাম। প্রথমেই যে ভাবনাটা মাথায় এল—সেটা হচ্ছে

অসুখ সম্বন্ধে। শুকতারার অসুখটা কি? চেহারা দেখে ত' মনে হয় না কোনও অসুখ-বিসুখ আছে। অত টাকা যে সে নিজের জন্যে নেয়, তা কি ওর অসুখের জন্যে খরচ হয়! কিন্তু অসুখটা কি? এ পর্যন্ত যেটুকু শুনেছি তাতে শুধু এইটুকুই জেনেছি যে, এ বাড়ীর যে ধারটায় শুকতারা থাকে, সেখানে কারও ঢোকবার অধিকার নেই। গোটা পাঁচ-সাত ঝি থাকে ওর সঙ্গে। ঝি-গুলোকে অবশ্য মাঝে-মধ্যে বাইরে আসতে হয়। দেখলেই গা জ্বলে ওঠে। এমন হাড়-নচ্ছারের মত সেজে থাকে তারা যে, চোখ ঘুরিয়ে না নিয়ে উপায় নেই।

এদেরই একটাকে সেদিন ভোরে শুকতারার সঙ্গে ঘাটের সিঁড়িতে প্রথম দেখেছিলাম। কি দুঃসহ ঘৃণায় বারবার শুকতারা তাকে বলেছিল—'সরে যা, সরে যা। ছুঁস নে আমায়।' সত্যিই ওই সব জীব ছুঁলে গায়ে জ্বালা ধরে যেতে পারে। বিশেষতঃ শুকতারার মত মানুষের। যে অপার্থিব স্নিগ্ধ দীপ্তিটি সদা-সর্বদা শুকতারাকে ঘিরে থাকে সেটি যে নিভে যাবে চিরকালের মত ওই সব ক্ষুধার্ত জীব যদি ছোঁয় ওকে। ক্ষুধার্তই বটে, এমন হ্যাংলা যে মনে হয় ওদের আপাদ-মস্তক থেকে অসংখ্য লকলকে জিভ বেরিয়ে রয়েছে। সামনে একটা কিছু পেলেই হয়, অমনি চাটতে সুরু করে দেবে।

কিন্তু কেন ওরা ঘিরে থাকে শুকতারাকে! ভাল লোক কি মেলে না নাকি এ দেশে? এই ত' কতকগুলো রয়েছে যারা শুকতারার মহলের বাইরে কাজ করে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে এরা কখনও ওধারে ঘেঁসতেই পারে না। যে দিকটায় শুকতারা থাকে, সে দিকের দরজা পার হতেই পারে না অন্য মানুষে, পারে কেবল ওই বেহদ্দ নোংরামির জ্যান্ত প্রতিমূর্তি ঝি-গুলো।

কি করে ওরা সারা দিন রাত শুকতারাকে নিয়ে! আজই নাগমশাইকে বলতে হবে যে ওগুলোকে তাড়িয়ে গোটা কতক ভাল লোক রাখলেই হয়। চেষ্টা করলে কি ভাল লোক জোটে না নাকি কোথাও।

দরজায় খটখট আওয়াজ হল। দরজা খুলে দেখলাম ফট্‌কে বেয়ারাকে।

"কি চাও?"

"আজ্ঞে, রাণীমা জানতে চেয়েছেন, তিনি কি এখন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন!"

"কোথায় তিনি?"

"আজ্ঞে, ঐ যে নীচে, ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

"নীচের সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়ে আছেন! কি আশ্চর্য! চল্ চল্।" ছুটে নেমে গেলাম নীচে। ঘাটের দরজা পার হতে নজরে পড়ল একটা থামে হেলান দিয়ে গঙ্গার ওপারে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুকতারা। ছাতার কাপড়ের চেয়ে ঢের বেশী কালো রঙের একখানা শাড়ী পরে আছে। দাঁড়াবার ভঙ্গীটি দেখে মনে হল অপরিসীম ক্লান্ত ও, কোন কিছুতে ঠেস না দিয়ে দাঁড়াবার সামর্থও যেন নেই। শুধু ক্লান্ত নয়, ক্লান্ত আর একা। এমন ভয়ানক রকম একা দেখাচ্ছে ওকে যে আমার মনটাই কেমন আতঙ্কে ছেয়ে গেল।

আরও এক ধাপ নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমায় দেখে থামের গা থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলল। ভয় পাওয়া জন্তুর চাউনি ওর চোখ দু'টিতে। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় গেল?"

ভয় পেয়ে গেলাম আমিও। বললাম—"শিউড়িতে মামলার তদ্বির করতে।" অনেকক্ষণ এক ভাবে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটি আওয়াজ —"ও।" তারপর পেছন ফিরে অতি কষ্টে উঠল গোটা তিনেক ধাপ, সেই ভাবে গিয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। আমার যেন মনে হল ও টলছে। টলতে টলতে বাগান পার হয়ে আবার তিনটে ধাপ উঠে দালানে গিয়ে পৌঁছল। অবস্থা দেখে ছুটে গিয়ে উপস্থিত হলাম ওর পেছনে, যদি পড়ে যায়!

পড়ল না কিন্তু। টলতে টলতে গিয়ে পৌঁছল সিঁড়ির মুখে। সিঁড়ির ডান পাশের দেওয়ালে হাত দিয়ে উঠতে লাগল। এক ধাপ পেছনে আমিও চললাম। যদি পড়ে ত' ধরব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। ওপরে নীচে আলোগুলো সব জ্বলছে। ওই ভাবে আমাদের দু'জনকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে চাকর-বাকররা চেয়ে রইল। এতটুকু সাড়া শব্দ নেই কোথাও। একটা ভয়ানক কিছু ঘটবার আশঙ্কায় থমথম করতে লাগল সারা বাড়ীটা। আমরা দোতালায় উঠে এলাম।

আগাগোড়া দোতালার বারান্দাটা পার হতে হল আবার। সেখানে ডান দিকে ঘুরে একটা ছোট্ট বারান্দা। সেই বারান্দার শেষ দরজাটার সামনে পেঁৗছে অতি কষ্টে হাত তুলে দু'বার আঘাত করলে দরজায় তারপর দরজার গায়ে মুখ বুক চেপে দেহের সম্পূর্ণ ভারটা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক এক হাত পেছনে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও ভেতর দিকে। টপ করে এক পা এগিয়ে পেছন থেকে দু'কাঁধ ধরে ফেললাম। ধরে টেনে খাড়া করবার চেষ্টা করতেই দেহটা এসে পড়ল আমার গায়ের ওপর। বুঝতে পারলাম, বৃথা চেষ্টা করছি দাঁড় করাবার। কে দাঁড়াবে! যাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি তার জ্ঞান নেই।

দু'হাতে তুলে নিলাম অচেতন দেহটা, নিয়ে দরজার ওধারে পা দিলাম। যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে এক পাশে সরে দাঁড়াল। এগিয়ে চললাম সোজা। প্রথম ঘরটা পার হলাম। সে ঘরে খান কয়েক টেবিল চেয়ার ছাড়া এমন কিছু নেই যা চোখে পড়ে। দ্বিতীয় ঘরে ঢুকলাম পর্দা ঠেলে। সে ঘরে বোধহয় খাওয়া দাওয়া হয়। খানকয়েক পিঁড়ি, জলের জায়গা, থালা বাসন চোখে পড়ল। ভাল করে সব দেখাও সম্ভব নয় তখন। হাতের ওপর একটা অচেতন মানুষ রয়েছে। তাকে কোথাও শোয়ানই প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু শোয়াই কোথায়!

সে ঘরের দু'দিকে দু'টো দরজা। ডান দিকের দরজায় পর্দা ঝুলছে। বাঁ দিকের দরজাটা বন্ধ। হাতের ওপরে তখন আর রাখা যাচ্ছে না ওকে, বেশ ভারি লাগছে। যে দরজায় পর্দা ঝুলছে সেই দিকে এগলাম।

পেছন থেকে কে বললে—"যাবেন না ও ঘরে।"

শুনলাম না তার মানা। সোজা গিয়ে পর্দা ঠেলে ঢুকলাম সেই ঘরে।

মেঝেতে খুব পুরু বিছানা পাতা রয়েছে। তাড়াতাড়ি তাকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়। দিয়ে দম নিয়ে মুখ তুলে দেখি—

যা দেখলাম, তাতে তৎক্ষণাৎ নীচু করতে হল চোখ। আবার মুখ তুলে ঘরের দেওয়ালে নজর ফেললাম। হিম হয়ে এল শরীর। ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল মাথার ভেতর। সত্যিই কি দেখছি তা বোঝবার জন্যে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে আবার তাকালাম চার দিকে। তারপর চোখ বুজে দম বন্ধ করে বসে রইলাম। ও রকম ব্যাপার যে পৃথিবীতে কোথাও থাকতে পারে তা কস্মিনকালে মনের কোণেও উদয় হয় নি।

ঘরখানার চারটে দেওয়ালই প্রায় আয়না দিয়ে মোড়া। আয়না-গুলোর মাঝে আস্ত আস্ত মানুষের ছবি। এতটুকু আবরণ নেই তাদের দেহে। বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে সবগুলোই নারীদেহ। সেই অতি-জীবন্ত নারীদেহগুলি একে অপরকে জড়িয়ে কিম্ভূতকিমাকার জটিল উপায়ে কি যে করছে, তা বোঝবার উপায় নেই। সেই প্রতিবিম্বগুলো এ আয়না থেকে ও আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে এমন ভাবে নড়ছে চড়ছে বলে মনে হল যে, ওরা সবাই ঐরকম মত্ত অবস্থায় জড়াজড়ি করতে করতে এসে হুড়মুড় করে পড়বে বুঝি ঘাড়ের ওপর।

সামনে পড়ে রয়েছে কালো কাপড় জড়ানো অচেতন শুকতারা। পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে তা দেখবার সাহসও হল না। মাথা নীচু করে শুকতারার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরে শুনতে পেলাম—"আপনি এবার যান। আমরা দেখব ওঁকে।"

গলার স্বর আর উচ্চারণ শুনে মনে হল না যে সেই নোংরার বেহদ্দ ঝি-গুলোর কেউ। এ রকম মিষ্টি অনুরোধ শুনতে পাব সেই ঘরে, তা আশা করি নি। পেছন ফিরে চাইতে হল।

একটি বছর বার তেরোর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। হাঁ করে চেয়ে রইলাম তার দিকে। এ আবার কে! এ বাড়ীতে কখনও দেখিনি ত' একে! এতটুকু একটা মেয়ে থাকে শুকতারার সঙ্গে, কই, শুনি নি ত' কখনও! মেয়েটির মুখ থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিতে হল। এমন একখানা বিশ্রী পাতলা কাপড়

রয়েছে ওর গায়ে, যা না থাকলেও কিছু যেত আসত না। তার চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার, শুধু কাপড়খানাই পরে আছে সে। তার তলায় জামাটামা কিছুই নেই।

আমার অবস্থা দেখেই বোধহয় মেয়েটি একটু কুঁকড়ে গেল। কোনও রকমে সে বললে—"এবার আপনি যান, আমরা ওঁকে দেখছি।"

ওর দিকে না তাকিয়ে বেশ শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম—

"তোমরা কারা? আর কে কে আছে এখানে?"

"আমি আর—আর ওই"—কথা আটকে গেল তার গলায়।

ভাল করে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—

"তুমি কে? কতদিন আছ এখানে? কি কর তুমি?"

"আমি—আমি—আমার"—আর বলতে পারলে না কিছু মেয়েটি, চোখ দু'টিতে জল টল্‌টল্‌ করতে লাগল। সভয়ে সে তাকাতে লাগল ঘরের অন্য ধারের দরজার দিকে।

উঠে গিয়ে এক টানে সেই দরজার পর্দাটা সরিয়ে ফেললাম। দুপ দুপ করে শব্দ হল। হুড়োহুড়ি করে কয়েক জন পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

ফিরে এসে দাঁড়ালাম মেয়েটির সামনে। সে তখন এধার ওধার তাকাচ্ছে, বোধহয় ঘর থেকে পালাবার জন্যেই। তার মাথায় হাত রাখলাম—"কি নাম তোমার? কোথা থেকে এসেছ তুমি? সত্যি কথা বল, তা হলে তোমায় ছেড়ে দেব।"

কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি। বললে—"আমায় এরা ধরে এনেছে এখানে। আমি কিছু বললে আমায় মেরে ফেলবে—"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কে বললে —"তুই এবার যা এখান থেকে, আমি সব বলছি।"

ঘুরে দাঁড়ালাম। শুকতারা উঠে বসবার চেষ্টা করছে। মেয়েটা এক ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

অতি কষ্টে শুকতারা বললে—"দয়া করে আমায় একটু ধরুন, উঠে দাঁড়াই। চলুন ও ঘরে যাই। সব বলব আমি। কিন্তু এ ঘরে নয়—"

কথা ক'টা বলে হাঁপাতে লাগল।

দু'হাত ধরে দাঁড় করালাম। আমার হাত ধরেই টলতে টলতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার পরের ঘরখানাও পার হলাম আমরা। প্রথম যে ঘরখানায় ঢুকেছিলাম সেই ঘরে ঢুকে ও একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বসে দু'হাত টেবিলের ওপর রেখে তাতে মুখটা গুঁজে দিল!

আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইলাম ওর পাশে। তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। চৌকাঠ পার হয়ে দরজাটা টেনে দিলাম সন্তর্পণে। নেমে গেলাম নীচে। চাকর-বাকররা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কোন দিকে চোখ না ফিরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেলাম বাগানে। বাগান পার হয়ে গঙ্গায় গিয়ে নামলাম। জামা-কাপড় সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। তারপর লাগলাম ডুব দিতে। অনবরত ডুব দিয়ে চললাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জ্বালা ধরে গেছে গায়ে, ঠিক করলাম যতক্ষণ না শীতল হবে শরীর, ততক্ষণ আর উঠব না।

কত রাত পর্যন্ত ডুবে বসেছিলাম গঙ্গার জলে তা বলতে পারব না। এক সময় গঙ্গা থেকে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে পেঁাছেছিলাম। পর দিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে ভিজে জামা কাপড় সুদ্ধই শুয়ে ঘুমিয়েছি। তারপর সারা দিনটা অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করে কাটালাম ঘরের মধ্যে। অনেক বার অনেকে এসে ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেল, সাড়া দিই নি। মুখ দেখাতে প্রবৃত্তি হল না কাউকে। ঠিক করে ফেলেছিলাম, এই ভাবে দু'টো দিন দু'টো রাত কাটিয়ে শচীন ফিরলেই চলে যাব। যতক্ষণ না ছেড়ে যাচ্ছি ঐ পাপপুরী, ততক্ষণ কিছুতেই ভুলতে পারব না সেই ঘরখানার কথা, ঘরের ছবি-গুলোকে আর সেই একরত্তি মেয়েটাকে। কেন ওকে চুরি করে আনা হয়েছে, কি কাজে লাগে ও, শচীন ওর কথা জানে কি না, এই রকমের বহু প্রশ্ন বারবার এসে দাঁড়াল দু'হাত মেলে আমার সামনে। দু'হাত দিয়ে ঠেলে জোর করে তাদের তাড়ালাম। দরকার নেই, কিছুমাত্র গরজ পড়ে নি আমার কোনও কিছু জানবার। শুধু পরিত্রাণ পেতে চাই এখান থেকে। আগে এই বাড়ী থেকে বেরনো—তারপর অন্য কথা।

অন্য কথা কিন্তু চোখ রাঙিয়ে ফোঁসাচ্ছিল আমার ঘরের বন্ধ দরজায়

বাইরে। বার কতক মৃদু আওয়াজ হল দরজার গায়ে, তারপর ফিসফিস করে কে বললে—"এবার আমি এসেছি, দরজাটা খুলুন।"

জবাব দিলাম না, শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম।

"শুনছেন, আপনি ঘুমোন নি আমি জানি, শুনুন কেন এসেছি আমি। টেলিগ্রাম এসেছে শিউড়ি থেকে, এখনই আমাদের যেতে হবে সেখানে।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বললাম—"কি বললে? কৈ দেখি টেলিগ্রাম।"

কাপড়ের ভেতর থেকে হাত বার করে—টেলিগ্রামটা আমার হাতে দিলে। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। দুর্ঘটনা ঘটেছে, শচীন হাসপাতালে—শীঘ্র এস। শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। করছে হিরণ্যাক্ষ।

মুখ তুলে তাকালাম ওর মুখের দিকে। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে। চকচকে একখানা ধারালো ছোরার মত দেখাচ্ছে ওকে। ক্লান্তি নেই, জড়তা নেই, দুর্ভাবনার চিহ্নমাত্র নেই মুখে চোখে কোথাও। তার বদলে চোখে মুখে সর্ব দেহে জ্বলছে একটা অদৃশ্য অগ্নিশিখা। বেগুনী রঙের একখানা বেনারসী পরে আছে, সেই কাপড়ের জামা গায়ে। আঁচল কোমরে জড়ানো। সীমন্তে টকটক করছে সিন্দূর। দু'হাতে কয়েক গাছি চুড়ি, গলায় সামান্য একটু হার। মাথায় ঘোমটা নেই, অসম্ভব লম্বা চুল বিনিয়ে সোনালী জরিতে জড়িয়ে পিঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুহূর্ত দু'য়েক লাগল ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলতে। শানিত দৃষ্টিতে ও চেয়ে রইল আমার দিকে। শুকতারা অস্ত গেছে, তার বদলে ঘোষ ভিলার প্রবল প্রতাপান্বিতা কর্ত্রী শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী উদয় হয়েছেন সামনে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কে এই হিরণ্যাক্ষ?"

"আমাদের উকিল। ঘন্টা দু'য়েক পরে গাড়ী আছে, আপনি তৈরী হন তাড়াতাড়ি।"

বলেই পেছন ফিরলেন। তীর বেগে নেমে গেলেন নীচে। নীচে যে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে তীব্র গলায় হুকুম দিলেন—

"ঘাটে নৌকো আন খান দুই। নায়েবমশাইকে একখানায় এখনই

রওয়ানা হতে বল। ওপারে গাড়া তৈরী রাখুন উনি। আর একখানা নৌকোয় আমি যাব। জিনিষপত্র আগে রাধার ঘাটে পার করে দাও।"

বহু মানুষ ছুটোছুটি করতে লাগল। একটি বারের জন্যেও শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেব্যা নীচে থেকে ওপরে গেলেন না। নড়লেনই না কাছারি ঘর থেকে। এপক্ষের ওপক্ষের দু'পক্ষের কর্মচারীদের বহু হুকুম দিলেন কাছারি ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বয়োজ্যেষ্ঠ নাগমশাই বাড়ীর ভার নিয়ে থাকবেন, যজ্ঞেশ্বরবাবু যাবেন আমাদের সঙ্গে। যজ্ঞেশ্বরবাবুকে হুকুম হল—"আপনার মালিকের পিস্তলটা আমায় দিন। বন্দুকগুলো নিয়ে দারোয়ান, সর্দার যে ক'জন আছে বাড়ীতে, সব চলুক আপনার সঙ্গে।" নাগমশাইকে হুকুম হল—"বাড়ী সাফ করে ফেলুন। ছেড়ে দিন সবাইকে। জিনিষপত্র কাল সকালেই বাগানে সরিয়ে দিন।"

দুই নায়েবই মাথা নীচু করে সব শুনলেন। যথাসময়ে আমরা খাগড়াঘাট রোডে গাড়ীতে উঠলাম। দু'বার গাড়ী বদল করে ভোর হবার আগেই শিউড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আগাগোড়া সব পথটাই আমাদের সকলের সঙ্গে বসে গেলেন শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরা দেব্যা। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারও ধারলেন না। বললেন—"না, ও সবে দরকার নেই। যে গাড়ীতে সকলে এক সঙ্গে বসে যাওয়া যায়, সেই গাড়ীতে ওঠ সকলে।" গাড়ীতে উঠে জানালার বাইরে ঠায় চেয়ে রইলেন। একবারও ভেতরে মুখ ফেরালেন না, বা একটি কথাও কইলেন না কারও সঙ্গে।

উকিল হিরণ্যাক্ষ বসুর বয়স হয়েছে।

তিনি বললেন—"আজ তোমার বাবা থাকলে এ কেলেঙ্কারিটা হত না মা লক্ষ্মী। একশ'বার আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি বাবাজীকে যে, প্রজাকে সায়েস্তা না করে ছেড়ে দিলে সে মাথায় উঠবেই। কোর্টের মাঝখানে কি যাচ্ছেতাই কাণ্ডই না হয়ে গেল।

তারপর তিনি যা বললেন—তা এই। শচীন এসে প্রজাদের ডেকে পাঠায়। তাদের বলে, মালিক পক্ষ থেকে মামলা উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে,

তারাও তুলে নিক মামলা। হাঙ্গামা চুকে যাক। কেন মিছে এই হয়রানি-ভোগ। এস, আজ আমরা সব চুকিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যাই।

প্রজারা রাশীকৃত টাকা চেয়ে বসে। তাদের খেসারত চাই। শচীন বলে, খেসারতের কথা আর তুলো না। তাহলে কোনও দিনই কিছু মিটবে না। খেসারত মালিকও চাইতে পারে। তার চেয়ে এস, সব ভুলে গিয়ে আমরা আগে মামলা তুলে নিই। তারপর আমিও রইলাম,তোমরাও রইলে। খেসারতের কথা আমি বিবেচনা করব, তোমাদের কথা দিচ্ছি।

কে একজন বলে বসল—"ওরে আমার ঘরজামাইবাবু রে, মস্ত বড় দাতা হয়ে বসেছে রে আজ?"

কথায় কথায় কথা চড়তে থাকে। ইতিমধ্যে কে একজন ধাক্কা মেরে শচীনকে মাটিতে ফেলে দেয়! আর সেই ফাঁকে কয়েকজন তাকে কয়েক ঘা বসিয়েও দেয়! হিরণ্যাক্ষবাবু আর জন কয়েক উকিল তখন ওদের মাঝে পড়ে শচানকে উদ্ধার করেন।

উকিলবাবু বললেন—"মাথায়, মুখে বেশ চোট পেয়েছেন, তবে সে তেমন কিছু নয়। কিন্তু কোর্টের মাঝখানে তাঁর গায়ে হাত তুলতে সাহস হল যাদের—তাদের কিছু করা গেল না। বাবাজী কিছুতেই কিছু করতে দিলেন না।—পুলিশ-দারোগা থেকে সুরু করে নিজে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কত বোঝালেন। বাবাজীর এক উত্তর—'মেটাতে এসে মেটাতে পারলাম না। এটা কত বড় লজ্জার কথা তা ভাবুন। আবার নতুন মামলা লাগিয়ে বাড়ী ফিরব। ও সব আমার দ্বারা হবে না'।"

শুনতে শুনতে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী উঠে দাঁড়ালেন। সেই প্রথম কথা কইলেন তিনি। অতি শান্ত গলায় বললেন—"সেইটুকুই ত' সব-চেয়ে ভাল কাজ করেছেন, কাকা। যদি ও মামলা বাধাত, তাহলে ওকে কোর্টে এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে হয় ত যে অমুক অমুক আমায় মেরেছে। কি ভয়ানক কথা? আচ্ছা হরি আসে নি, আমাদের হরি গোমস্তা।"

"এই যে মা, এই যে তোমার হুরে চাকর।" বলতে বলতে পাকানো উড়ুনি গলায়, পাকানো শরীরের একটি প্রায়-বৃদ্ধ মানুষ সামনে এসে

দাড়াল। তার বাঁ-বগলে ছাতা লাঠি হু'টোই রয়েছে! ছাতা-লাঠি সুদ্ধ অনেকটা হেঁট হয়ে একটি প্রণাম করল।

তার দিকে না তাকিয়ে শুক্তিসুন্দরী দেবী বলতে লাগলেন—"হরিহর কাকা, বাবার মুখে শুনেছি, যখন তুমি আস তখন তোমার একটা ঘটি একখানা গামছা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন তোমার যা কিছু হয়েছে, তা তুমি এই বাড়ী থেকে পেয়েছ কি না স্পষ্ট করে বল।"

হরিহর নিরুত্তর। ঘর সুদ্ধ মানুষ চুপ। এক মিনিট পরে আবার শোনা গেল শুক্তি দেবীর গলা। এবার তিনি কেটে কেটে প্রতিটি কথা ভাল করে উচ্চারণ করতে লাগলেন। "হরিহর কাকা! আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে তোমার প্রজারা আমার কাছে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়বে। নয়ত সেই গামছা আর ঘটি নিয়ে পথে নামতে হবে তোমায়। বাবা মারা গেছেন কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি।"

হু'মিনিট চুপ। তারপর আবার শোনা যেতে লাগল সেই স্বর।

"উকিল কাকা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে আমি দেখা করে যাব, তার ব্যবস্থা করুন। বাবা কিছু টাকা আলাদা করে রেখে গিয়েছেন কোনও ভাল কাজে লাগাবার জন্যে। সে টাকাটা আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে দিয়ে যেতে চাই। হরিহর কাকা, কি ঠিক করলেন আপনি?"

"তোমার ইচ্ছে মতই সব হবে মা—" হরিহর আবার নত হয়ে প্রণাম করে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

হিরণ্যাক্ষবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন। বৃদ্ধের মুখে-চোখে জোয়ার এসেছে। চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"বাঘের বাচ্চা। বাবা নেই, তার বাচ্চা এসে দাঁড়িয়েছে এবার।"—উত্তেজনায় বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হয়ে গেল।

সব কাজ শেষ করে শ্রীমতীর খেয়াল হল হাসপাতালে যাবার। বললেন—"চলুন এবার, আপনার বন্ধুকে তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাই।"

ফস্ করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—

"যাক্, এতক্ষণে তবু তার কথাটা মনে পড়ল।"

সেই প্রথম প্রাণ খুলে হাসতে দেখলাম আমার মনিব ঠাকরুণকে। বললেন—"খুব রাগ হয়েছে ত' আপনার। তা কি করব বলুন, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আগে দেখা করলে কি আর রক্ষে ছিল নাকি! এই যে এতক্ষণ এত কাণ্ড করে মলুম, এর কিছুই করতে পেতাম না। অমন অবুঝ মানুষ দুনিয়ায় দু'টি নেই। গোঁ ধরে বসতেন, চল বাড়ী ফিরে, দরকার নেই কিছু করে। ব্যাস, এতক্ষণে আমাদের ভাল মানুষের মত তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসতে হত।"

বললাম—"আগে গিয়ে দেখাই যাক, গাড়ীতে তাকে তুলতে পারা যাবে কি না?"

আবার হাসি। হাসিতে ফেটে পড়ছেন একেবারে? বললেন—"ও হরি! আপনি বুঝি তাই ভাবছেন!"

একটু রেগেই গেলাম। সেটা বোধ হয় একটু প্রকাশ হয়ে পড়ল আমার গলায়, বললাম—"ভাবাটা খুবই অন্যায় হয়েছে বুঝি আমার?"

অত্যন্ত ভাল মানুষের মত তিনি বললেন—"না না, অন্যায় হবে কেন? আপনার ছেলেবেলার বন্ধু যখন—"

আর কথা এগোল না। এগিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ঢুকলাম আমরা। একজন নার্স পথ দেখিয়ে একটা ঘরের সামনে উপস্থিত করলে। ঘরের ভেতরে তখন হাসির হুল্লোড় চলছে। শচীনের গলা সব থেকে উঁচুতে চড়েছে। সে বলছে—"হাতটা-পাটা কেটে জুড়তে পারেন ডাক্তাররা, কিন্তু নাকটি যদি কাটা যায়! নাক কাটা গেলে নাকও জোড়া যাচ্ছে না কি আজকাল? তবে ত' দাদা দেশসুদ্ধ নাক-কাটার পোয়া বার—।"

পর্দা সরিয়ে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে আমিও।

ঝপ্ করে হাসি গোলমাল সব থেমে গেল। ডাক্তার, নার্স কম্পাউণ্ডার সব মিলিয়ে পাঁচ-সাতজন লোক রয়েছে ঘরে। খাটের ওপর প্রকাণ্ড তাকিয়া ঠেস দিয়ে মহা আরামে বসে আছে শচীন। কপালে একটা ফেটি বাঁধা রয়েছে, ডান গালে ছোট্ট একটু কাগজ আটকানো, তার ডান হাতের কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এ ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও

কিছু নেই। হাসপাতালের মধ্যে স্বয়ং রোগী তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে সকলকে জুটিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে আড্ডা দিচ্ছে দেখে শরীর একেবারে জুড়িয়ে গেল!

মুখটা একটু ফাঁক করে একটু সময় শচীন অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতখানা ওপর দিকে তুলে বলল—"জয়, মহারাণী শুক্তিসুন্দরী দেবীর জয়।"

চতুর্দিকে খুকখুক করে চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী খাটের দিকে যেতে যেতে বললেন—"জয়ধ্বনি ত' দিচ্ছ এখন মহা আরামে খাটের ওপর বসে। ওধারে যে তিনটে লোকের নাক ঘুষিয়ে ভেঙেচ—তারা এখন কোথায় কি কচ্ছে তার খবর রাখ? এ শহরে কোথাও তারা এক বিন্দু জল বা ওষুধও পায় নি।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে শচীন বললে—"সে হল তাদের নাকের বরাত। আমার স্বর্গীয় শ্বশুরমহাশয়ের প্রজাদের নাকগুলো যে অত পল্‌কা তা আমার ধারণা ছিল না।"

এবার আর চাপা রইল না হাসি। হো-হো হি-হি হাসিতে ফেটে পড়বার যোগাড় হল ঘরখানা। শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী নিতান্ত ভালমানুষের মত আমায় বললেন—"নিন, এবার দেখে শুনে, বুঝে নিন আপনার বন্ধুকে। আপনার বন্ধুর কোথায় ক'খানা হাড় গুঁড়িয়েছে দেখে নিন এবার। উঃ! কি বিপদেই যে পড়েছি—"

বিপদের মাত্রাটা বোঝাবার জন্যেই বোধহয় দীর্ঘ মাত্রায় একটি নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শচীন হো হো শব্দে হেসে উঠল। বললে—"তাই নাকি? মানে তুই বুঝি ভাবলি, শচীনটা মার খেয়ে মরেছে?"

একজন ডাক্তারবাবু বললেন—"তাহলে আপনার দেখা উচিত সেই লোক তিনটির অবস্থা। নাক জিনিষটি তাদের মুখ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এসেছেন শচীনবাবু। তারাও এসেছিল এখানে, করবার মত কিছুই নেই দেখে আমরা হাত গুটিয়ে নিলাম।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"তাদের হাসপাতালে রাখা হল না যে?"

ওধার থেকে একজন ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"ব্যাটাদের জেলে পোরা গেল না শচীনবাবু জন্যে। এই রাগে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিলেন যে ওদের হাসপাতালেও ঢুকতে দিও না।"

কথাটা আর বাড়তে পেল না। শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী জোড়-হাতে বললেন—"তাহলে এবার আপনারা আদেশ দিন আমি মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। যে ভাবে আড্ডা জমিয়েছেন, তাতে হাসপাতালের হাসপাতালত্ব যে আর থাকবে না।"

আবার হাসিতে ফেটে পড়ল ঘর।

ওরা দু'জন যাবে পুরীতে। নায়েব যজ্ঞেশ্বর সর্দার দারোয়ানদের নিয়ে চলে গেল হরিহর গোমস্তার সঙ্গে। আমি ওদের সঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত চললাম। হাওড়ায় ওদের পুরীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাকে দু'চার দিন থাকতে হবে কলকাতায়। কলকাতায় শচীনের ভগ্নীপতি ব্রজমাধব চৌধুরীর বাড়ীতে আমি থাকব। থেকে স্বচক্ষে এদের বাড়ীগুলোর অবস্থা দেখে আসব। শুধু তাই নয়, একখানা বাড়ী খালি করার ব্যবস্থাও করতে হবে আমাকে। পুরী থেকে ফিরে এরা কলকাতার বাড়ীতে উঠবে। শীতকালটা কলকাতায় কাটাবে, বহরমপুরে এখন ফিরবে না।

শচীন চিঠি দিলে তার বোনকে। লিখলে—"আমার বন্ধু যাচ্ছেন। সাবধানে রেখ। একটুতেই ক্ষেপে যায় বন্ধুটি আমার। দেখ, যেন না ভাগে কোথাও।"

শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী নন্দাইকে লিখলেন—"আপনারা কেউ আমাকে এ পর্যন্ত একটা মনের মত নাম দিতে পারেন নি। আমার শুঁটকী ননদটি ত' আমার গতরের হিংসেয় ম'ল। এ ভদ্রলোক আমার নতুন নাম দিয়েছেন শুকতারা। আপনার তিনির কি নাম হওয়া উচিত এঁকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। হয়ত ইনি বলবেন, নাম হওয়া উচিত 'জলহস্তিনী'। তাতে কিন্তু চটে যাবেন না। কারণ এঁর রসজ্ঞানের ওপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে।"

ওদের দু'জনকে পুরীর গাড়ীতে তুলে দিয়ে চিঠি দু'খানি পকেটে নিয়ে

হাওড়ার পুলে গিয়ে উঠলাম। ডানধারে যতদূর নজর যায় জাহাজের পর জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে উঁচু হয়ে আছে মাস্তুলগুলো, মাস্তুলের মাথায় আলো জ্বলছে টিমটিম করে। পুলের ওপর থেকে অন্ধকারেও বেশ দেখা যাচ্ছে জাহাজের গায়ে গাদা-বোটগুলো বাঁধা রয়েছে, ডেরিকের মাথাগুলো জাহাজ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মাল উঠছে, মাল নামছে গাদাবোট থেকে.। যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—আড়িয়া হাবিস, হাবিস আড়িয়া, আড়িয়া হাবিস। দাঁড়িয়ে রইলাম রেলিঙ-এ ভর দিয়ে। ত্রিশ বছর আগেকার হাওড়া পুল জলের ওপর ভাসত। পুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে বেশ দোলা লাগত। পুলের ওপর দোলা খেয়ে তখনকার মানুষ কলকাতায় এসে ঢুকত। তাই তখন কলকাতায় ঢুকলে দুলে উঠত মানুষের মন। এখনকার পুলের চেহারা দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। এখনকার পুলের ওপর উঠে ওপর দিকেই চাও, নীচের দিকেই চাও, মাথা ঘুরে যায়। মনে হয় মহাশূন্যে ভাসছে পুলটা, মাটি-জল কোন কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। তাই এখনকার ঐ পুল পেরিয়ে যারা কলকাতায় ঢোকে, তারা শূন্যে ভেসে বেড়ায়।. কলকাতার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের কিছুমাত্র যোগ নেই।

পুল পার হয়ে ট্রামে উঠলাম। ধর্মতলায় যখন নামলাম তখন রাস্তায় ভিড় নেই বললেই হয়। শচীন বলে দিয়েছিল, ধর্মতলা থেকে গাড়ী নিতে। গাড়ী মানে ফিটন গাড়ী। এখনকার মত তখন কলকাতায় বাবা-ট্যাক্সী, বেবী-ট্যাক্সীর বন্যা বইত না।

ঘোড়া চাবকাতে-চাবকাতে ফিটনওয়ালা পার্ক স্ট্রীটের ভেতর ঢুকল। সত্যি বলছি, তখন গাড়ী চড়লে মনে হত, ঘোড়াটা গাড়ী টানছে না, গাড়ীখানা আমায় বইছে না। গাড়ীর মাথায় যে বসে আছে চাবুক হাতে নিয়ে, সেই মহাপুরুষ একাই তার মুখ হাতের কসরতের মহিমায় ঘোড়া-গাড়ী-আরোহী সব একসঙ্গে নিয়ে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত কোন চুলোয় পৌঁছে দেবে তারও ঠিক নেই। হয়ত ভবনদীর ওপারে পর্যন্ত পৌঁছে দেবে একেবারে।

সেদিন রাত্রে আমার সেই ফিটনওয়ালাটি ভবনদীর এপারেই ঠিক

ঠিকানায় পৌঁছে দিলে আমায়। গাড়ী থামল। নেমে দেখি, বাড়ীর দরজায় সাদা চামড়ার পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে কোমরে রিভলভার নিয়ে। ফিটন থেকে নামতে দেখে বোধহয় তাড়াটা আর করলে না, যতটা সম্ভব তাড়িয়ে দেবার মেজাজী সুরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাও এখানে ?"

বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—"এটা কি ব্রজমাধব চৌধুরীর বাড়ী ?"

আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠল সাহেবের মেজাজ। চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—"ইয়েস্।"

"আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কিন্তু লোকটা কে তুমি ? হু দি হেল আর ইউ ?"

"বহরমপুরে ব্রজমাধববাবুর ব্রাদার-ইন-ল থাকেন, তাঁর কাছ থেকে আসছি।"

হাত পাতল সামনে—"আইডেন্‌টিটি প্লিজ—"

চটে গেলাম—"তোমার হাতে দেব কেন। চিঠি আছে আমার কাছে তাঁকে দেব।"

"তবে তুমি যতক্ষণ খুশী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পার। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

ভাল মুসকিলে পড়া গেল ত'! এ বেটা টাঁশ্‌কে এখন বোঝাই কি করে ? আর হয়েছেই বা কি এখানে যে বাড়ী ঘিরে রয়েছে পুলিশে ! ব্যাপারটা না জেনে ত' ফেরাও যায় না।

প্রচুর সাড়া শব্দ করে একখানা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে। জন চারেক খাকী-পরা পুলিশের লোক নামল গাড়ী থেকে। নেমে দু'ধারে সরে দাঁড়াল। তারপর নামলেন একজন বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক। তাঁর পরণে সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতি। নেমে আমার পাশে দাঁড়ানো ট্যাঁশকে জিজ্ঞাসা করলেন। ট্যাঁশ তাঁকে কি বোঝাল।

তখন আমার দিকে ফিরে প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন তিনি—"কি চাও তুমি ?"

"বহরমপুর থেকে আসছি। ব্রজমাধববাবুর কাছে চিঠি আছে। শচানবাবু পাঠিয়েছেন।"

"কই দেখি চিঠি?"

"ব্রজমাধববাবুর হাতে দেব—"

"আরে কি আপদ, তাই না হয় দিন না মশাই। আমি ছাড়া আর একটা ব্রজমাধব আপনি পাবেন কোথায় শুনি?"

আকাশ থেকে পড়লাম—"মানে আপনি"—চিঠি দিলাম তাঁর হাতে।

"আজ্ঞে হাঁ, আমিই। আসুন ভেতরে, আমিই হচ্ছি আদি এবং অকৃত্রিম ব্রজমাধব চৌধুরী, শচীন সিঙ্গীর বোনাই।"

বলতে বলতে আমায় নিয়ে ঢুকলেন বাড়ীর ভেতর। নীচের তলায় প্রত্যেক ঘরে পুলিশের লোক কাজকর্ম করছে। সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠলাম দোতলায়। দোতলাতেও পুলিশের অফিস, লোক গিজগিজ করছে। তেতলায় উঠলাম তাঁর পিছু পিছু। সিঁড়ির মুখে দরজা, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার সামনে রিভলভার কোমরে বাঁধা দু'জন লোক। দু'জোড়া বুট এক সঙ্গে খট্-খটাশ শব্দ করে উঠল। দরজার গায়ে ছোট একটু ছেঁদা, সেই ছেঁদায় মুখ রেখে একজন কি বললে। দরজা খোলা হল ভেতর থেকে। আমরা ঢুকলাম। দরজার ভেতর আর এক জোড়া বুট খট্-খটাশ করে উঠল। দরজা বন্ধ হল আমাদের পেছনে।

ব্রজমাধব চৌধুরীর বসবার ঘর। বসবার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর, ছেলে-মেয়ে ক'টির জন্মদানের ঘর, মায় আঁতুড় ঘরও এক এবং অদ্বিতীয়। ছেলে-মেয়ে বউ নিয়ে ব্রজমাধব এমন ঘরে বাস করেন, যে ঘরের ছাতে দিন রাত খট্ খট্ খটাশ শব্দে দু'জোড়া বুট ঘুরে বেড়ায়। সেই ঘরের দু'পাশের দুই ঘরে দিবারাত্র দু'জন করে মানুষ বসে বসে খইনি ডলে। সামনের পেছনের দু'ধারের ঘেরা বারান্দায় দু'টো মানুষ, মানুষমারা-যন্ত্র নিয়ে ওৎ পেতে থাকে। এই ভাবে আট জন মানুষ অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে সপরিবার ব্রজমাধব চৌধুরীকে। ত্রিশ বছর আগে ইংরেজ ছিল এদেশে। ব্রজমাধব ছিলেন ইংরেজের হাতের কল। সেই কল দিয়ে ইংরেজ এদেশের মানুষ পিষত মনের সুখে।

ব্রজমাধবের মূল্য ছিল যথেষ্ট। ইংরেজ তাদের এই মূল্যবান যন্ত্রটিকে যৎপরোনাস্তি যত্ন করত। পাছে চোট পায় তাদের যন্ত্রে, এই ভয়ে বহু রকমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তাতেও ব্রজমাধবের ঘুম হত না দিনে রাতে। তিনি তাঁর বিছানার ওপর একলা জেগে বসে দাবা খেলতেন সারা রাত। তিন হাত দূরে অন্য খাটে তাঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ক'টি পাশে নিয়ে ঘুমতেন নাক ডাকিয়ে। খুব চেঁচিয়ে নাক ডাকত তাঁর। এটা বোধহয় তিনি অভ্যাস করেছিলেন, স্বামীর জীবন রক্ষার্থে। তাঁর নাক ডাকার চোটে, দু'পাশের দুই ঘরের আর দু'দিকের বারান্দার ছ'জন পাহারাদারের চোখে ঢুলুনিও আসত না।

আমারও এল না। ব্রজমাধব তাঁর খাটের ওপরেই আমার শোবার ব্যবস্থা করলেন। বললেন—"শুয়ে পড় দাদা, ঘুমিয়ে পড় টান-টান হয়ে। রাতভোর জেগে থাকি আমি। লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই। সে রকম কিছু দরকার হলে তোমায় ঠেলে তুলে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেব।"

শুনে ব্রজমাধব পত্নী গর্জন করে উঠলেন—"আবার—"

ব্রজমাধব আধ হাত জিভ বার করে তৎক্ষণাৎ দু'হাতে নিজের দু'কান ধরে ফেললেন।

সারা রাত না ঘুমিয়ে দেখলাম কি করেন ব্রজমাধব। বই পড়েন আর দাবার ঘুঁটি চালেন। বই তিনখানা উল্টে পাল্টে দেখলাম। একখানা ইংরেজী, নাম সেক্স এণ্ড ক্রাইম্‌স্‌। একখানা বাঙলা, নাম আনন্দমঠ। একখানা সংস্কৃত, নাম উপনিষদ্‌। রাতে দু'তিনবার টেলিফোন বাজল। ব্রজমাধব ধরলেন, যা শোনবার শুনলেন। একটি কথাও বললেন না নিজে, শুধু 'আচ্ছা' আর 'হুঁ হাঁ' ছাড়া। শেষ রাতের দিকে একবার মাত্র একটি কথা উচ্চারণ করলেন। বললেন—"বলবেই।"

ফোন নামিয়ে রেখে উপনিষদ্‌ খুলে বেশ চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন—

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি, সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী, সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ, সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ, তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে, বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সংকল্পন্তে, মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ

কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে ; কর্ম্মাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে ; স এষঃ সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি।

সকালে অন্য ব্যবস্থা। তেতলার যে কোনও ঘরে যেতে পার, যা ইচ্ছে করতে পার। সিঁড়ির দরজা পার হতে গেলেই ফ্যাসাদ। সেখানে খাতা আছে একখানা। তাতে লিখতে হবে, ক'টার সময় যাচ্ছ, কোথায় কোথায় যাচ্ছ, ফিরবে আন্দাজ ক'টার সময়। ওপর থেকে নীচে ফোন করে জানান হবে যে একজন যাচ্ছে, এতটার সময় যাচ্ছে, এই নাম তার, এই সময় ফিরবে। ফিরে আসলে নীচের দরজায় ওপরের দরজায় মিলিয়ে নিয়ে তবে ঢুকতে দেবে। নয়ত ঢুকতেই দেবে না যতক্ষণ না ব্রজমাধব চৌধুরী নিজে হুকুম দেবেন।

সকালে চা জলখাবার খেয়ে বেরলাম। বেরবার সময় শচীনের বোন বললে—"তাড়াতাড়ি ফিরবেন দাদা। কালীঘাট থেকে মহাপ্রসাদ আসছে। শুধু একটু মাংসের ঝোল আর ভাত হবে। জুড়িয়ে গেলে মুখে দেওয়া যাবে না।"

ব্রজমাধব তাঁর পূজার ঘরে দরজা বন্ধ করে আছেন তখন। ভোর বেলা মুরগীর ডিম সিদ্ধ আর চা খেয়ে পূজার ঘরে ঢোকেন, বেলা দশটার আগে বেরোন না। বেরিয়েই নীচে নামেন। নীচে তাঁর অফিস। তা বলে যখন তখন তিনি অফিসে যান না, অফিস থেকে বাড়ীতে মানে তেতলায় ওঠেনও না। বেলা দশটা থেকে দু'টো এই চার ঘণ্টা অফিসে থাকেন। তারপর উঠে আসেন ওপরে। সহজে আর নামেন না নীচে।

চা জলখাবার খাওয়ার সময় শচীনের বোন এই সব কথা বললে আমায়। কালীগঞ্জ থানায় দু-একবার দেখেছিলাম শচীনের এক বোনকে। রোগা ডিগডিগ করছে এই এতটুকু একটা ফ্রকপরা মেয়ে। শচীনকে ডাকতে গেলে সে এসে দূরে দাঁড়াত। যতবার তাকে দেখেছি, দেখেছি একটা কিছু চাটতে। হয় আমসত্ত, নয় আমচুর, নয় তেঁতুলের আচার। তার নাম ছিল নেলী, তাও মনে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনারা ক'টি ভাই-বোন ?"

শচীনের বোন বললে—"কেন, আপনি তাও জানেন না নাকি! কতবার ত' আমায় দেখেছেন কালীগঞ্জে। দাদা আর আমি, আমি দাদার বোন, দাদা আমার ভাই। ব্যাস, ফুরিয়ে গেল।"

বললাম—"কালীগঞ্জে শচীনের এক বোনকে দেখতাম বটে। তার নাম নেলী। যেমন রোগা, তেমনি হ্যাংলা—"

শচীনের বোন বললে—"সেই নেলী ত' আমি।"

"এঁ্যা—" হাঁ করে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

নেলী বললে—"হ্যাঁ, সেই আমি এখন ফুলতে ফুলতে বিশ গুণ হয়েছি। কোথাও যে এক-পা নড়ব তারও ত' উপায় নেই।"

বললাম—"উপায় নেই। কেন উপায় নেই?"

"ওঁর ধারণা, বাড়ী থেকে বেরলেই আমি আর ছেলেমেয়ে তিনটে মরব। কেউ-না-কেউ আমাদের মারবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে এই ওঁর ধারণা। একবার সব গেছে কি না বাড়ী থেকে বেরিয়ে।"

শুনলাম সেই মর্মান্তিক কাহিনী।

শচীনের বোনকে বিয়ে করবার আগে ব্রজমাধব যাকে বিয়ে করেছিলেন, তারও একটি ছেলে হয়েছিল। সেই বউ আর ছেলেকে কারা কেটে কুচিকুচি করে ফেলে নৌকার ওপর। ব্রজমাধব তখন বরিশালের এক থানায় ছিলেন। তারপর থেকে এভাবে উনি চোর ডাকাত ধরে নির্মূল করতে থাকেন যে খুব তাড়াতাড়ি ওঁর উন্নতি হয়। শচীনের বাবা অনেক কষ্টে ব্রজমাধবকে বিয়ে করতে রাজী করান, আর নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেন। নেলীকে বিয়ে করার পর ব্রজমাধবের উন্নতি আরম্ভ হয়। এখন আর চোর ডাকাত ধরতে হয় না। ধরতে হয় না একটি পিঁপড়েকেও। অন্যেরা ধরে এনে ব্রজমাধবের কাছে দেয়। ব্রজমাধব তাদের কাছ থেকে ভেতরের কথা বার করে নেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—"ধরে আনে কাদের এখন?"

বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দিলে নেলী—"তারাও চোর ডাকাত নয়। ধরে আনে সব ভদ্দরলোকের ছেলে-মেয়েদের, যারা বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজ মারে।"

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল আমার, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি ফিরতেও হবে। কারণ, কালীঘাট থেকে মহাপ্রসাদ আসছে। দু'টি ভাত আর মাংসের ঝোল,ঠাণ্ডা হয়ে গেলে খেতে আমার কষ্ট হবে যে।

অনেক বার ভাবতে চেষ্টা করেছি, ভেবে বার করতে চেষ্টা করেছি, কেন সেদিন শচীন আমাকে কলকাতায় তার ভগ্নীপতি ব্রজমাধব চৌধুরীর কাছে পাঠিয়েছিল। হোটেলের অভাব ছিল না কলকাতায়, তা ছাড়া ওর বন্ধুবান্ধবও এমন অনেক ছিল যাদের বাড়ীতে আমি কয়েকটা দিন থেকে কলকাতার কাজকর্ম মিটিয়ে বহরমপুরে ফিরে যেতে পারতাম। তবু ভগ্নীপতি ব্রজমাধবের কাছে আমাকে পাঠাবার কি যে উদ্দেশ্য ছিল শচীনের, তা আমি আজও ভেবে ঠিক করতে পারি নি।

হয়ত কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না তার। হয়ত শুধু এই ভেবেই পাঠিয়েছিল যে, তার ভগ্নীপতিটি কি দরের মানুষ, সেটুকু আমি জেনে-শুনে আসব। তাও হয়ত নয়, প্রথম থেকেই শচীনের মাথায় কি জানি কি করে ঢুকেছিল যে আমি লোকটা টুপ করে সরে পড়ার জন্যে অষ্টপ্রহর তৈরী হয়ে আছি। সেই ধারণায় ওকে পেয়ে বসেছিল বলেই বোধহয় ও ওর জবরদস্ত ভগ্নীপতির হেফাজতে পাঠিয়েছিল আমায়। কিংবা এসব হয়ত কিছুই নয়। আমার, শচীনের, শচীনের বউ শুকতারার, ব্রজমাধবের, নেলীর, কপাল বরাত নিয়তি ভাগ্য ভবিতব্য—এ সমস্ত কিছুও নয়। এ হচ্ছে একটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, যে কারণে আগুনের ওপর জল চাপিয়ে ফোটাতে সুরু করলে আস্তে আস্তে জলটা বাষ্প হয়ে উঠে যায়, এ হচ্ছে সেই ধরণের একটা কাণ্ড। খুব গুছিয়ে বলতে গেলে বলা যায় এ হচ্ছে পরিণতি। আমার, শচীনের, শুকতারার, ব্রজমাধব চৌধুরীর, নেলীর, আর শচীন-নেলীর স্বর্গগত পিতৃদেব যিনি অত্যন্ত বিবেচনাপূর্বক অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে ছেলেটির আর জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তাঁর, আমাদের সকলের সমস্ত কাজকর্মের চরম

পরিণতিটি ঘটে যাওয়া একান্ত উচিত ছিল বলেই শচীন আমায় তার ভগ্নীপতির কাছে পাঠিয়েছিল। সেই একই কারণে যে মুহূর্তে আমি তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায় নেমে নীচের দরজার খাতায় কোথায় যাচ্ছি, কখন ফিরব এই সব লেখাচ্ছিলাম, তখন যমদূতের মত একখানা প্রকাণ্ড লরি পিছু হেঁটে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। নিশ-কালো রঙের ঘেরা টোপ দিয়ে গাড়ীখানা মোড়া। একটা চলন্ত কারাগার,—বা ধাবমান নরকও বলা যেতে পারে। দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

সেই কারাগারের পিছনের দরজা খুলে গেল। প্রথমে দশ জোড়া বুট আর দশটা রাইফেল নামল। তারা দু'ভাগে দু'ধারে তৈরী হয়ে দাঁড়াল কারাগারের দরজা থেকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত। তখন ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন সাদা চামড়ার মানুষ নেমে এল চাবি নিয়ে। পিস্তলটা ডান হাতে বাগিয়ে ধরে, বাঁ হাতে চাবি নিয়ে উঠে গেল লরির ভেতর। ভেতরে আর একটা ছোট্ট দরজার তালা খুলে দিয়ে সে নেমে এসে দাঁড়াল পিস্তল উঁচিয়ে। বাড়ীর ভেতর থেকে আমার পাশ দিয়ে চার জন পাঠান বেরিয়ে গিয়ে ঢুকল লরির মধ্যে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলাম আমি।

তাদের দু'জনকে নামানো হল। পাঠান চারজন তাদের ঝুলিয়ে নিয়ে এসে তুললে বাড়ীর মধ্যে। আমার পাশ দিয়েই তাদের ঝুলিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে। অনেকটা ভেতরে ডান ধারের একটা ঘরে ঢুকল তারা। যতক্ষণ দেখা গেল, দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে।

যে জমাদার সাহেব খাতায় আমার নামটাম লিখছিলেন, তিনি বললেন—"বাস, হোইয়ে গেল, এখোন আপনে যাইতে পারেন।"

চমকে উঠলাম একটু। মাথা নীচু করে রাস্তায় নামলাম। ডান দিকে চেয়ে দেখলাম কালো রঙের বীভৎস লরির পেছনটা, সেটা তখন মিলিয়ে যাচ্ছে রাস্তার বাঁকে।

আমি তাদের চিনতে পেরেছিলাম

ঠিক ঐ ভাবে ওরা আমায় খিদিরপুরের খাল ধার থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই টিনের ঘরে। আর একবার ওদের দেখেছিলাম পুঁটুরের সেই বাড়ীতে মৃতপ্রায় গোমেশের বিছানার পাশে। সেই দু'জন ষণ্ডা। চিনতে ভুল হয় নি আমার। কিন্তু কি ভয়ানক অবস্থা ওদের! ঘাড় দু'টো যেন ভেঙে গেছে ওদের, তাই মাথা দু'টো ওভাবে নুয়ে পড়েছে বুকের ওপর। ঝুলিয়ে না নিয়ে গেলে যেতেই পারত না ওরা হেঁটে। নিজেদের পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াবার অবস্থা ওদের নেই।

ব্যাপার কি! কেন ওদের ধরে নিয়ে এল? করেছে কি ওরা? ও অবস্থা ওদের করলে কে? ব্রজমাধবের ওখানেই বা ওদের আনলে কেন?

নেলীর কথাটা মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল—ধরে আনে সব ভদ্দরলোকের ছেলে-মেয়েদের। যারা বোমা-পিস্তল নিয়ে ইংরেজ মারে। কারণ ব্রজমাধবের চাকরি হচ্ছে তাদের কাছ থেকে ভেতরের কথা সব জেনে নেওয়া।

পার্ক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ঘুরতে লাগলাম নিজের কাজে। শচীনের শ্বশুর মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে যে ক'খানা বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন, তার সব ক'খানা সাহেব পাড়ায়, পার্ক স্ট্রীট, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী এলাকার মধ্যে।

তার কোনটায় চলছে বিলিতী হোটেল আর মদ-খাবার আড্ডা। কোনটায় রয়েছে মেম সাহেব ভাড়াটে, যে মেম সাহেবরা নিজেরাও ভাড়া খাটে। কোনটায় চীনে, জাপানী, ইংরেজ, মুসলমান ইত্যাদি ছত্রিশ জাতের ছাপ্পান্নটা সংসার। ঘুরে ঘুরে সব ক'খানা বাড়ী দেখলাম, দেখা করলাম মূল ভাড়াটে অর্থাৎ যার নামে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে। লিখে নিলাম, কোন বাড়ীর ক'টা বৃষ্টির-জলপড়া নল ভেঙেছে, কোন বাড়ীর ছাত ফুটো হয়েছে, কোন বাড়ীর গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক গেছে চেঁদা হয়ে। বছর তিনেক একটি পয়সা ভাড়া ঠেকায় নি এমন ভাড়াটেকে বাড়ী ছেড়ে দিতে বললাম। কাউকে বা ভয় দেখালাম মকদ্দমার। কারও কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিলাম বাকী ভাড়ার জন্যে। সে সময় কলকাতার ভাড়াটেরা বাড়ীওয়ালাদের চোখ রাঙিয়ে মারতে তাড়া করত না, কাজেই ভাড়াটেদের সঙ্গে তখন কথা বলতে পারা যেত। তাদের

অভাব-অভিযোগ শুনে বাড়ীওয়ালারা সাধ্যমত প্রতিকার করত। অনেক ক্ষেত্রে ছ'ছমাসের ভাড়া ছেড়েও দিত বাড়ীওয়ালা ভাড়াটের অবস্থা বুঝে। এখন আইন হয়েছে, ভাড়াটে বাড়ীওয়ালা কেউ কারও সুখ দুঃখের ধার ধারে না। দু-পক্ষই বাগে পেলে আইনের প্যাঁচে ফেলে একে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার চেষ্টায় থাকে।

ঘণ্টা তিন-চার লাগল কাজ কর্ম সারতে। সেই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে একটি মুহূর্ত ভুলতে পারলাম না তাদের দু'জনের কথা। কেন তাদের আনা হল, তাদের নিয়ে করা হবে কি, তাদের কাছ থেকে কি কথা বার করা হবে, এই সব চিন্তায় পাগল হয়ে উঠলাম। কিন্তু এতটুকু বুদ্ধি ঘটে ছিল যে, ওদের সম্বন্ধে একটি কথাও ব্রজমাধবকে বা ও-বাড়ীর কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। ওদের যে কস্মিন কালে দেখেছি কোথাও, এতটুকু যেন কিছুতেই প্রকাশ না পায় ব্রজমাধবের কাছে আমার কথা-বার্তায় চালে-চলনে। সামান্য মাত্র সন্দেহ যদি করতে পারেন ব্রজমাধব—তাহলে আমার পেটের ভেতর থেকেই সব কথা টেনে বার করবার জন্যে উনি উঠে পড়ে লাগবেন। তারপর ঐ বাড়ীতে, ঐ ভাবে এসে নামাবে ওরা সেই দাদাকে, ছুরি বৌদিকে—

ছুরি বৌদির কথা মনে পড়তেই বুকটা কেঁপে উঠল ভয়ানক ভাবে।

না না না না না—এ কখনও কিছুতে হতে পারে না। যদি এমন কোন কিছু হয়ই, যা হওয়া একেবারে অসম্ভব, যদি ওখানে আনেই ওরা ছুরি বৌদিকে, তখন—

তখন আমি আছি। যাচ্ছি আমি ও-বাড়ীতে, যে ভাবে হোক ব্রজমাধব চৌধুরী যাতে আমায় বিশ্বাস করেন তার ব্যবস্থা করতেই হবে। সারা রাত থাকব ব্রজমাধবের পাশে। সে সময় ব্রজমাধব অন্য মানুষ হয়ে যান, ব্রজমাধব চৌধুরীকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমিই তাঁর একমাত্র আপন জন পৃথিবীতে। তাড়াতাড়ি একটা ফিটন ডেকে চড়ে বসলাম। লিখিয়ে এসেছি, বারটায় ফিরব, বেজে গেছে দেড়টা। গরম-গরম মায়ের বাড়ীর মাংসের ঝোল আর ভাত বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ফিটনওয়ালাকে জলদি হাঁকাবার হুকুম দিয়ে গাড়ীর কোণে বসে মতলব ঠাওরাতে লাগলাম।

দ্বিতীয়বার আবার পৌঁছলাম সেই বাড়ীর সামনে। কত তফাৎ! প্রথম বার নামাবার সময় বুক টিপটিপ করে নি, দ্বিতীয় বার করল। প্রথম বার নেমে লাল-মুখোটার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিলাম, এবার তার দিকে তাকালাম ভয়ে ভয়ে। সে কিন্তু এবার দাঁত বার করে হাসল। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে উঠে গেলাম খাতাওয়ালার কাছে। আধ মিনিটও দাঁড়াতে হল না। খট্-খটাশ আওয়াজ হল তার জুতোর। হাত তুলে নিয়ে দেখিয়ে দিলে সে।

দ্বিতীয় বার উঠতে লাগলাম সিঁড়ি দিয়ে। আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম কান পেতে। তাদের কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না—এই আশায় কান পেতে আস্তে আস্তে উঠতে লাগলাম। একতলা থেকে দোতলায়, দোতলায় উঠে এক মিনিট দাঁড়িয়ে দম নিলাম। না, এতটুকু সন্দেহজনক শব্দ হচ্ছে না কোথাও। একতলার দোতলার সব ক'খানা ঘরের ভেতর বহু লোক কাজ কর্ম করছে। মস্ত বড় এক ঝাঁক মৌমাছি ভনভন করে উড়তে থাকলে যে রকম শব্দ হয়—সেই রকম শব্দ হচ্ছে বাড়ীটায়। দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে তেতলায় উঠে গেলাম।

আবার খট্-খটাশ শব্দ হল জুতোয় জুতোয়। তারপর সেই ছেঁদায় মুখ লাগিয়ে কি বলা হল। দরজা খুলল, ভেতরে ঢুকলাম, খট্-খটাশ আওয়াজ হল জুতোয় জুতোয়। সামনের ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাব, ভেতর থেকে ব্রজমাধব চাপা গলায় বললেন—"জুতোটা খুলে রেখে এস ভায়া, গুরুদেব এসেছেন।"

জুতো খুলে ঘরে ঢুকলাম। ব্রজমাধবের সঙ্গে যে খাটখানায় রাত্রি কাটিয়েছিলাম তার ওপর দামী কম্বল পড়েছে। কম্বলের ওপর বাঘছাল, বাঘছালের ওপর গুরুদেব শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে। চোখ বুজে আছেন তিনি। ধ্যানস্থ হয়ে আছেন বোধহয়। গরদের থান পরে ব্রজমাধব তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত বুলচ্ছেন।

এগিয়ে গেলাম। খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে গুরুর মুখ সম্পূর্ণ দেখা গেল। দেখে কাঠ হয়ে গেলাম আমি। কাঠ হয়েই চেয়েছিলাম

গুরুর মুখের দিকে। একটু পরে খেয়াল হল, ব্রজমাধব লক্ষ্য করছেন আমায়। আর এক মুহূর্ত দেরী করলাম না। ধ্যানস্থ গুরুদেবের খাটের সামনে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে অনেকক্ষণ মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখ-বুজে দু'হাত বুকের কাছে জোড় করে এক মিনিট ঠোঁট নাড়লাম। চোখ খুলে আবার গুরুদেবের শ্রীমুখখানি একবার দর্শন করে ব্রজমাধবের মুখের দিকে তাকালাম। আনন্দে না তৃপ্তিতে জানি না, ব্রজমাধবের মুখ জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আর দাঁড়ালাম না, পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। একলা আমার একটু ভাববার সময় দরকার। নেলীর সঙ্গে দেখা হল। সেও গরদ পরেছে। বোধহয় গুরুদেবের ভোগ রাঁধছে। বললে—"স্নান করে আসুন দাদা। গুরুদেবের প্রসাদ পাব সব এক সঙ্গে। আমার সব তৈরী হয়ে গেছে।"

এইটুকুই চাচ্ছিলাম। জামাটা খুলে রেখে কলঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কাপড়খানা ছেড়ে কলের নীচে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে যে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে অনেক কিছু ভাবতে হবে।

ভাবতে গিয়ে দেখলাম, ভাববার আর পথ নেই কোনও দিকে। ঐ ব্যক্তিটি, যিনি চোখ বুজে শুয়ে আছেন ব্রজমাধবের খাটের ওপর, উনি এক সময় চোখ খুলবেন। তখন আমায় দেখবেন, দেখবেন আর চিনতে পারবেন তৎক্ষণাৎ। পারবেনই ঠিক চিনতে, কারণ আমারও ওঁকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরী হয় নি। পুঁটুরে গ্রামে গোমেশের মাথার কাছে এসে উনিই দাঁড়িয়েছিলেন আর আতপ চাল ধোয়া জলের সঙ্গে বড়ি খাওয়াতে বলে গিয়েছিলেন। ও রকম অলৌকিক রূপ হামেশা চোখে পড়ে না বলেই দেখা মাত্রই ওঁকে চিনতে পেরেছি আমি। উনিও আমায় চিনতে পারবেন নির্ঘাত। তারপর কি হবে! আমি ওঁকে কখনও কোথাও দেখি নি, এই কথা বলে সহজে নিস্তার পাব ব্রজমাধবের কাছে? ব্রজমাধব গুরুদেবের কথা বিশ্বাস না করে বিশ্বাস করবেন আমাকে! এ রকম একটা অসম্ভব আশা করা আর গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা একই কথা যে।

কিন্তু গুরুদেবই বা ব্রজমাধবকে বলবেন কি করে যে উনি পুঁটুরের

বাড়ীতে গিয়েছিলেন! কেন গিয়েছিলেন, কার সঙ্গে গিয়েছিলেন, কি করতে গিয়েছিলেন সেখানে, কাকে দেখেছিলেন, কি করেছিলেন, এই জাতের হাজার প্রশ্ন করে বসবে শিষ্য, তার জবাব উনি দেবেন কি ?

হঠাৎ ফট্ করে একটা জোরালো আলো যেন জ্বলে উঠল আমার চোখের সামনে। কে ঐ গুরুদেবটি! উনিই ভেতরের সব সংবাদ শিষ্যটিকে সরবরাহ করছেন না ত'! কে উনি ? কিসের অভিনয় করছেন!

ভেতর থেকে কে বলে উঠল—"ছি ছি ছি ছি ছি।" অনেকদিন পরে স্পষ্ট শুনতে পেলাম সেই বিচিত্র সুরের ছি ছি ছি ছি ছি। আরও শক্ত করে চোখ বুজে কলের নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভুলটা যেন না ভেঙে যায়।

কলের জল পড়তে লাগল মাথার ওপর। মাথার ওপর থেকে পা পর্যন্ত গড়িয়ে নামতে লাগল। শক্ত করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম—"ঠিক, এত অবিশ্বাস মানুষকে করতে নেই। করলে তোমার মত অত সহজে, অমন করে সব ব্যাপারে ছি ছি ছি ছি ছি বলা কিছুতেই আসবে না। নানা রূপে, নানা অবস্থায় তোমায় দেখেছি। কিন্তু তোমার মুখে অবিশ্বাস বা দুঃখের বা ভয়ের কালো ছায়া দেখি নি এক মুহূর্তের জন্য। তাই তুমি হাসতে পার, হাসাতে পার, আগুনের মাঝে থেকেও কৌতুক করতে পার জীবনের সঙ্গে। তাই তুমি দুরি, অদ্বিতীয়া, অপরূপা। তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে খাল থেকে আমার অচৈতন্য দেহটা তুলে এনে। এখন এসেছে এমন সুযোগ আমার জীবনে, যে সুযোগ হারালে তোমার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না কখনও। ভয় পেয়ে এ সুযোগ আমি কিছুতে হারাতে পারি না।

দরজায় ঘা পড়ল। নেলী বললে—"হল দাদা ?"

তাড়াতাড়ি গা মুছে বেরিয়ে এলাম।

এবার আমিও শুধু গায়ে, গলায় কোঁচার খুঁট দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। গুরুদেব উঠে বসেছেন। তাঁর শ্রীচরণের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। আশীর্বাদ করলেন—"ভয় জয় কর। মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

তাকালাম তাঁর চোখের দিকে। চোখ বুজে আছেন। বুঝব কি! ইতিমধ্যে ঘরের আর একখানা খাট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেঝেটা ধুয়ে

মুছে ফেলা হয়েছে। প্রকাণ্ড কার্পেটের আসন পাতা হয়েছে। শ্বেত-পাথরের থালায় ভোগ নিয়ে এল নেলী। তিনি আসনে বসলেন। ভোগ রাখা হল তাঁর সামনে। ব্রজমাধব হাত জোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেব ভোগ নিবেদন করলেন বোধহয় তাঁর ইষ্ট দেবতাকে। তারপর শুধু পায়েসের বাটি থেকে অল্প একটু মুখে দিলেন।

সেইখানেই একটা গামলা এনে তাতে তাঁর হাত-মুখ ধোয়ালে নেলী। নিজের আঁচল জলে ভিজিয়ে তাঁর চরণ দু'টি মুছিয়ে নিলে। উঠে গিয়ে খাটে আসন গ্রহণ করলেন গুরুদেব।

আদেশ করলেন—"যাও, এখন প্রসাদ পাও গে তোমরা।"

প্রসাদের থালাটা মাথায় নিয়ে নেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্রজমাধব নিজ হাতে জায়গাটা মুছে নিলেন কাঁধের গামছা দিয়ে। আমি গামলাটা তুলে নিলাম। নিয়ে ব্রজমাধবের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

প্রসাদ পেতে বসে ব্রজমাধব জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন দেখছ ভায়া?"

তাঁর গদগদ গলার আওয়াজ শুনে কি দেখছি, জানতেও চাইলাম না। তখনও হাত এঁটো করি নি। চোখ বুজে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম। মুখে কিছু বললাম না।

কি রকম যেন বিহ্বল ভাবে ব্রজমাধব খেতে লাগলেন। অল্পই খেলেন তিনি। খাওয়া শেষ করে বললেন—"কি কৃপা কৃপাময়ের। যখন কোনও দিকে কোনও পথ দেখতে পাই না তখনই উনি দর্শন দেন। জয় গুরু, জয় গুরু।"

নেলী বললে—"এ বেলা কালীবাড়ীর মাংসটা রান্না হল না দাদা। গুরুদেবের ভোগ হল কি না। ওঁর ভোগের জন্যে আলাদা ঘর আছে। মাছ মাংস সে ঘরের ত্রিসীমানায় যেতে পারে না। বিকেলে রাঁধব, মাংসটা কষে রেখেছি।"

মুখ হাত ধুয়ে ব্রজমাধবকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও ঘরে এখন যেতে পারি আমি?"

"নিশ্চয়ই। তোমার কপাল বড় উঁচু দরের ভায়া। যদি তুমি

ভাগ্যবান না হতে তাহলে তোমায় উনি অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না। কত বড়লোক ওঁর শ্রীচরণে মাথা ছোঁয়াবার জন্যে মাথা খুঁড়ছে। কিছুতে ছুঁতে দেন না। বলেন—'ওরা ছুঁলে জ্বলে যাই ব্রজ, অনেকক্ষণ আমার গা জ্বালা করে।' কিন্তু তুমি ওঁর শ্রীচরণে মাথা রেখে পড়ে রইলে। উনি কিছুই বললেন না। তোমার ভাগ্য ভাল দাদা, ওই শ্রীচরণ স্পর্শ করতে আমারই তিন বছর লেগেছিল।"

আমরা ঘরে ঢুকলাম।

মেরুদণ্ড সোজা করে চোখ বুজে বসে আছেন গুরুদেব। ঘরে ঢুকেই শুনতে পেলাম—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
মনসা ত্বিন্দ্রিয়াণি প্রাঙ্ নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈরসক্তো যঃ স যোগস্তু বিশিষ্যতে॥

অতি স্পষ্ট উচ্চারণ, সুরটি অত্যন্ত মধুর। যেন অনেক দূর থেকে তিনি শোনালেন শ্লোক ক'টি। শুনিয়ে বহুক্ষণ এক ভাবে চুপ করে বসে রইলেন। আমরা দু'জন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে। প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগলাম, এই বুঝি আবার নড়ে উঠবে তাঁর ঠোঁট দু'খানি, আবার শুনতে পাব কিছু। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি চোখ খুললেন। আমাদের দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাবে একটু হাসলেন। হেসে বললেন—"কর্মযোগ সম্বন্ধে যা বললাম, তা ওকে বুঝিয়ে দিও ব্রজ। কিন্তু খড়কে-কাঠি ভাঙবার জন্যে হস্তী নিয়োগ-করা কর্ম নয়। ওটা হটকারিতা। কর্তা কর্ম করবে, কর্ম কর্তাকে ঘাড়ে ধরে খাটিয়ে পারবে না। সব থেকে বড় মন্ত্রটা আজ তোমরা দু'জনেই শুনে নাও।—"

এই পর্যন্ত বলে খাট থেকে নামলেন। শিষ্যের চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন—"মন্ত্রটি হচ্ছে—'গরজ বড় বালাই।' আচ্ছা, আমি চললাম।"

ব্রজমাধব তৎক্ষণাৎ উপুড় হয়ে পড়লেন গুরুর পায়ের ওপর, দেখাদেখি তাঁর পাশে আমিও। নেলী ছুটে এসে আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে নিলে। ব্রজমাধব উঠে দাঁড়িয়েই টেলিফোন তুলে নিলেন। এই ক'টি কথা তাঁকে বলতে শোনা গেল—"গাড়ী, গুরুদেব যাচ্ছেন। ওদের দু'জনকে তাড়িয়ে দাও। হোক, সে আমি বুঝব। আগে ওদের পৌঁছে দাও ওদের বাড়ীতে। না, কোন দরকার নেই। এখনই বার করে দাও!"

আমি নেলী ব্রজমাধব সকলে নীচে গেলাম। গুরুদেব গাড়ীতে উঠলেন। আবার একচোট প্রণাম করা হল। অফিসের সকলে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন গাড়ীর পাশে। ব্রজমাধব হাত তুললেন, গাড়ী ছেড়ে দিল। ওপরে ফিরে এসে ব্রজমাধব স্বহস্তে গুরুর জন্যে পাতা বাঘছাল কম্বল তুলে যত্ন করে আলমারীর মধ্যে ভরে রাখলেন। তৎক্ষণাৎ আর একখানা খাট বিছানা এনে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে সাজিয়ে দিলে পাহারাদাররা। বিলকুল আগের মত দেখতে হল ঘরখানা। ছেলে-মেয়ে নিয়ে নেলী এসে শুয়ে পড়ল তার খাটের ওপর। আলমারী থেকে একখানা গীতা বার করলেন ব্রজমাধব। আমায় বললেন—"এবার একটু গড়িয়ে নেবে নাকি ভায়া? গড়াতে চাও ত' ঐ ওপাশের ঘরে যাও। বিছানা পাতাই আছে। দিনের বেলা অন্য ঘরে থাকতে পার, কিন্তু রাতটা কাটাতে হবে আমার শয্যা-সঙ্গী হয়ে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন বলুন ত'?"

চোখ মিটমিট করে ব্রজমাধব বললেন—"নয়ত ঐ উনি ঘাড়ে ধরে কিলোন যে। যে ক্ষুদ্র কলেবর তোমাদের বোনের, টিপে ধরলেই মরে যাব কিনা! তোমরা কেউ কাছে থাকলে একটু সাহস পাই। শচীন এলে তাকেও শোয়াই এই খাটে। সেই জন্যেই ত' ভদ্রলোক আসতে চায় না বোনের বাড়ী। বোন দিয়েছে আমাকে, বোন-ই শোবে আমার খাটে। ভাইকে ধরে আবার টানাটানি কেন।"

নেলী শুয়ে শুয়েই চোখ পাকিয়ে বললে—"আবার—"

ব্রজমাধব তৎক্ষণাৎ আধ হাত জিভ বার করে দু'কান ছুঁতে গেলেন দু'হাতে। আমি সরে পড়লাম।

পাশের ঘরে সেদিনের ইংরেজী বাংলা কাগজগুলো স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে কাগজ ক'খানা উলটে পালটে দেখলাম। অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য সংবাদ চোখে পড়ল। শিউড়ির ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে কোনও সৎকাজে লাগাবার জন্যে স্বর্গতঃ রায় জগত্তারণ ঘোষ বাহাদুরের কন্যা শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। বীরভূম জেলার আলতাপাটি থানার তিনখানা গ্রাম পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। পাঁচদিন আগে ভোর বেলা পুলিশ টালি-গঞ্জের পুটুরে গ্রামে এক বাড়ীতে হানা দিয়ে তাজা বোমা বানাবার মাল-মশলা আর মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছে। দু'জনকে ধরতেও পেরেছে পুলিশ। উত্তর প্রদেশের কমিশনার হত্যার সঙ্গে এই দলের সম্পর্ক আছে বলে পুলিশের ধারণা। আরও বহু সংবাদ চোখে পড়ল, কিন্তু মনে ধরল না। চোখ বুজে শুয়ে একটু ঘুমবার চেষ্টা করলাম। রাতটা থাকতে হবে ব্রজমাধবের সঙ্গে। ঘুমতে যদি হয় ত' দিনেই ঘুমনো উচিত।

কিন্তু ঘুম আমার চাকর নয় যে হুকুম করলেই এসে উপস্থিত হবে। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও ঘুম এল না। মনের চোখে বার বার ভেসে উঠল গুরুদেবের মুখখানি। সে মুখে কি ছিল! ।কছুতেই ঠিক করতে পারলাম না—কি ছিল তাঁর মুখে? মুখ দেখে কিছুতেই ধরা যাবে না তাঁর মনের ভাব। কি বলে আমায় তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন, তাও ভুললে চলবে না। বলে গেলেন—"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক"—এই মহামন্ত্রটি গুণ গুণ করতে লাগল মনের মধ্যে অবিরাম। শেষে সত্যিই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, টেরই পেলাম না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁর মুখখানিই শুধু দেখেছিলাম, এটুকু শুধু মনে আছে।

রাত দশটায় মায়ের বাড়ীর মাংস খেয়ে চড়লাম গিয়ে ব্রজমাধবের খাটে। অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্রজমাধব—কপাল কুঁচকে দাবা নিয়ে বসলেন। আনন্দ-মঠখানা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম।

একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। দাবার ঘুঁটিগুলো লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে ব্রজমাধব উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

"হুঁ, হুঁ, হুঁ, পাঠাবে? হুঁ, কখন? আচ্ছা—"

এই ক'টি কথা বলে টেলিফোন রেখে ফিরে এলেন বিছানায়।

সেক্স এণ্ড ক্রাইমস খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে অনেক জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ টানলেন। রাত বাড়তে লাগল। নেলী কাজকর্ম সেরে এসে শুয়ে পড়ল বাচ্চাদের পাশে। একটু পরেই তার নাক-ডাকা আরম্ভ হল।

আমারও একটু তন্দ্রা এসেছিল বোধহয়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম পিঠে এক ধাক্কা খেয়ে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ব্রজমাধবের দিকে। ভয়ানক অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে তাঁকে। দু'টো চোখ প্রায় বুজে আছে। সামান্য দু'টি কালো রেখা মাত্র দেখা যাচ্ছে দু'চোখের পাতার ফাঁকে। সেই অল্প ফাঁক দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

মিনিট খানেক দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ তিনি সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে হিসহিস করে বললেন—"রিভলভার ছুঁড়তে জান?"

মন্ত্রমুগ্ধের মত অবস্থা আমার তখন। মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরলো না। শুধু ঘাড় নাড়লাম।

"কখনও মানুষ মেরেছ?"

আবার সেই ভাবে ঘাড় নাড়লাম।

"মরতে দেখেছ কখনও কাকেও?"

আবার ঘাড় নাড়লাম।

"জোর করে কখনও কোনও মেয়ের ধর্ম নষ্ট করেছ?"

আর ঘাড়ও নাড়লাম না, শুধু চেয়ে রইলাম সেই অদ্ভুত চোখের দিকে।

"তার মানে এই দুনিয়ায় এসে তুমি কিছুই কর নি, কিছুই দেখ নি, হুঁ।"

ব্রজমাধব দু'চোখ সম্পূর্ণ খুলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাত পাতলেন আমার সামনে, "দাও একটা সিগারেট।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম—"কই, খাই না ত'।"

"অ"—হাত টেনে নিলেন।

নেমে গেলাম খাট থেকে। আলমারীর মাথা থেকে ব্রজমাধবের সিগারেটের টিন আর দেশলাই নামিয়ে আনলাম। একটা সিগারেট বার করে এগিয়ে ধরলাম। অন্যমনস্ক হয়ে নিয়ে মুখে লাগালেন সেটা। একটা কাঠি জ্বালালাম। ফ্যাঁশ করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় পড়ল জ্বলন্ত কাঠি সুদ্ধ আমার হাতের ওপর। কাঠিটা নিভে গেল। দেশলাইটা ছিটকে চলে গেল অনেক দূরে। ব্রজমাধব দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলেছেন তখন। সিগারেটটা তাঁর মুখ থেকে খসে পড়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর খুব সহজ কণ্ঠে বললাম—"সিগ্রেট ধরান। অনেকক্ষণ সিগ্রেট খান নি ত'।"

মুখ থেকে হাত নামিয়ে সিগারেটটা তুলে মুখে লাগালেন। বললেন —"আমার হাতে দাও দেশলাইটা।"

দেশলাইটা তুলে এনে হাতে দিলাম। ধরালেন সিগারেট, ধোঁয়া ছেড়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন সিগারেটের আগুন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। কয়েকটা টান দিলেন পর পর, দিয়ে সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা টিপে টিপে নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ঘরের কোণে।

বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছেন, ভাল করে চাইতে পারছেন না আমার দিকে। নিজের হাতের আঙুলগুলো দেখতে দেখতে বললেন— "এস, বস এসে।"

উঠে বসলাম বিছানার ধারে। দু' একবার আড় চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপর অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"কিছু মনে কর না ভাই, সব সময় আমার মাথার ঠিক থাকে না।"

বললাম—"ছুটি নিন না কিছু দিন। শচীনরা পুরী গেছে। চলুন, সেখানে কিছু দিন থাকলে মন ভাল হবে আপনার।"

"কিন্তু আর ফিরতে হবে না এখানে।"—সহজ সুরেই বললেন কথা ক'টি।

জিজ্ঞাসা করলাম—"তার মানে?"

"মানে, যে একবার বেরিয়েছে এখান থেকে সে আর ফেরে নি। সোজা চলে গেছে যমের বাড়ী। অর্থাৎ তোমাদের বোনটি বিধবা হবে—"

ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোনটা। বিরক্ত হয়ে বললেন ব্রজমাধব —"ধর ত' ভাই ফোনটা, বলে দাও আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। শালারা ধরেই নিয়েছে, আমি জেগে থাকব সারারাত, শুয়োরের বাচ্চারা—"

হাত বাড়িয়ে টেলিফোন কানে তুললাম। ইংরেজীতে সাহেবী টোনে বলা হল—"শোন চৌধুরী, বদরোদ্দাজাকে গুলি করা হয়েছে খড়্গপুর প্লাট-ফরমের ওপর। হি ডায়েড্ অন দি স্পট্, শুনছ—"

কান থেকে নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ফোনের মুখ চেপে ধরলাম। ব্রজমাধবের দিকে তাকিয়ে বললাম—"খড়্গপুর প্লাটফরমের ওপর বদরোদ্দোজাকে গুলি করা হয়েছে। সেখানেই তিনি মারা গেছেন। আপনি ধরবেন ফোন?"

"নামিয়ে রেখে দাও। বলে দাও, থ্যাঙ্ক উ, ব্যাস্"—ঝাঁজিয়ে উঠলেন ব্রজমাধব। তারপর দু'হাতে নিজের মাথার দু'পাশ চেপে ধরে হেঁট হয়ে বসে রইলেন।

ভোরের দিকে ব্রজমাধব বললেন আমায়—"না-ই বা বেরলে ভায়া, দু'টো দিন কোথাও। কি দরকার অনর্থক ছুটোছুটি করে। শচীন সিঙ্গীর শ্বশুরের বাড়ী ক'খানা আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি থাকবে। থাক আমার সঙ্গে দু'টো দিন, ভয়ানক একলা মনে হয় নিজেকে। এই ত' দেখছ, খাচ্ছে আর ঘুমচ্ছে নাক ডাকিয়ে। যখন উঠবে—খাবার যোগাড়ে লেগে যাবে। ছেলে মেয়ে তিনটেকে নাওয়াবে খাওয়াবে। জন্তু জানোয়ারেও কাচ্চা-বাচ্চাকে খাওয়ায়, নিজেরা খায় আর ঘুমোয়। বেশীর মধ্যে গয়না কাপড় কিনছে। তাও পরে যে কোথাও বেরবে সে উপায়ও নেই।' ওই কাপড় গয়নার পুঁটলি দিবারাত্রের সাথী আমার, একমাত্র সাথী। কখনও হয়ত ন'মাসে ছ'মাসে একবার ওকে আমার প্রয়োজন হয়

মিনিট তিনেকের জন্যে, তারপর আর ওর কথা মনেও থাকে না। ও যে একটা মেয়েমানুষ তাও আমার মনে থাকে না সব সময়। কেউ নেই আমার ভাই, কেউ নেই দুনিয়ায়।"

কিছুই বললাম না, বলবার কিছু ছিলও না। বলব কি, ব্রজমাধবের টাকা আছে, দিবারাত্র আট জন পাহারা দেবার মানুষ আছে, আর আছে জুতোয় জুতোয় তালি বাজিয়ে সেলাম। অজস্র জুতোর তালি আর অজস্র সেলাম পান ব্রজমাধব দিনে রাতে। কি অভাব আছে ওঁর দুনিয়ায়! কে আসবে ওঁর বন্ধু হতে, সাথী হতে! শচীনের বাবা দারোগা ছিলেন, দারোগা জামাই করে গেছেন। মেয়েটি যে মুদী স্বামীর স্বপ্ন দেখত না তখন, তা-ই বা কে বলবে!

হয়ত তাও নয়, দারোগার মেয়ের হয়ত এই-ই ধারণা যে, দারোগার চেয়ে বড় স্বামী সে যখন পেয়েছে—তখন আর তার করবারই কি আছে। স্বামী ত' জেগে থাকবেই সারা রাত, নয়ত দারোগার চেয়ে বড় কিসে! তাই সে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় নাক ডাকিয়ে।

ঘুমাক নেলী ওর ছেলে-মেয়ে নিয়ে। জেগে থাকুক বেচারা ব্রজমাধব সেক্স এণ্ড ক্রাইমস্ আর উপনিষদ্ খুলে সারা রাত। কিন্তু আমার আর পোষাচ্ছে না। দু'টো রাতেই দম আটকাবার উপক্রম হয়েছে। একবার বেরুতেই হবে। হোটেল ঠিক করতে হবে একটা। হোটেলে উঠে শচীনকে তার করে জানিয়ে দোব যে, পোষাল না বলে চলে গেলাম তার ভগ্নী-পতির আশ্রয় ছেড়ে। তাতে খুশী হয়, চাকরিতে রাখবে, নয়ত তাড়িয়ে দেবে। কিছুমাত্র দুঃখ নেই।

কিন্তু কেন জানি না, ভয়ানক যেন দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন ব্রজমাধব। বললেন—"তবেই ত' আরও হাঙ্গামা বাড়ালে ভায়া। আচ্ছা, আজ যাচ্ছ যাও,কাজ কিন্তু মিটিয়ে এস একেবারে। শচীনকে, রাণী বৌকে আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দোব যে তোমায় কিছুদিন কাছে রাখতে চাই আমি, তোমায় না হলে আমার চলবে না। ওরা আর তোমায় জ্বালাবে না।"

মনে মনে বললাম, শুধু তারা নয়, তুমিও আর আমায় জ্বালাতে

পারবে না। কি আবদার, রাতের পর রাত আমি জাগব ওঁর সঙ্গে।
আহা, কি আমার পীর সাহেব রে!

ভোরের আলো ঘরে এসে ঢুকল। পাহারা বদল হল ঘরের চতুর্দিক থেকে। নতুন যারা এল, তারা সার বেঁধে দাঁড়াল বারান্দায়। ব্রজমাধব বেরিয়ে গিয়ে সেলাম নিয়ে এলেন। অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখে এলেন তাদের। বলা ত' যায় না, যার আসা উচিত তার বদলে অন্য কেউ যদি এসে থাকে খুন করবার জন্যে। সেলাম নিয়ে ব্রজমাধব স্নানের ঘরে চলে গেলেন। আমি গেলাম তৈরী হতে।

চা মুরগীর ডিম খেয়ে ব্রজমাধব গেলেন পূজার ঘরে। তার আগে টেলিফোন তুলে বললেন কয়েকটি রহস্যজনক কথা।

"দু'জন দাও। সাবধান, গায়ে আঁচড় না লাগে। একদম জানবে না। হুঁ—খুব সাবধান।" ফোন নামিয়ে আমায় বললেন—"তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু ভায়া, নয়ত ভয়ানক ভাবব আমি।"

নেলী বললে—"সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে দাদা। তাড়াতাড়ি ফিরো। খিচুড়ি রাঁধব, ভুনিখিচুড়ি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মুখে দেওয়া যাবে না।"

শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠল। শুধু রাঁধা খাওয়া আর ঘুম। জানোয়ারের বাড়া।

ওপরের খাতায় নীচের খাতায় নিজের নামটা খরচ লিখিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। পড়ুক, ভিজব আজ সারা দিনটা, ভিজলেও খানিক ঠাণ্ডা হবে মেজাজ। পা চালালাম জোর।

আর একবার বলছি, যে ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা আমি শোনাতে বসেছি। ত্রিশ মানে একেবারে ঠিক তিনে শূন্য ত্রিশ নয়, দু'পাঁচ বছর এধার ওধার হতে পারে। এইটুকু ধরে নিলেই হবে যে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর আগেকার কথা শোনাচ্ছি আমি।

সে সময় কলকাতার মানুষ এত বেশী বুড়িয়ে যেত না। এখনকার মত এতটা কাজের মানুষও হয়ে উঠতে পারে নি কেউ তখন। তার কারণ

তখন কলকাতায় বেশীর ভাগ মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ পেত। ভূমিষ্ঠ হত বাড়ীতে আঁতুড় ঘরের মেঝের ওপর। জন্মগ্রহণ কর্মটি বেশ ধীরে সুস্থে গুছিয়ে সুসম্পন্ন করত মানুষে। এখনকার মত ঐ প্রথম কর্মটি করার সময়েও তাড়াহুড়ো লাগাত না। এখন মানুষ ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগই পায় না কলকাতায়—হয় টেবিলস্থ। হাসপাতাল বা মেটার্নিটি হোমের ডেলিভারি—টেবিলের ওপর ডেলিভারি হয়। সেখানে ডাক্তার আর নার্সদের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা আছে। তাঁরা টেবিল খালি করার তাগিদে থাকেন। কারণ বাইরে সর্বক্ষণ এক পাল মানুষ জননী-জঠরে অপেক্ষা করছে টেবিলস্থ হওয়ার আশায়।

এই তাড়াহুড়ো করে জন্মগ্রহণ করার ফলেই এখন কলকাতার মানুষ এত তাড়াতাড়ি এত বেশী বুড়িয়ে যায়। বুড়িয়ে যাবার আর একটি কারণ হচ্ছে তখন প্রতিটি মানুষের জীবনে একটা উদম-যুগ থাকত। জন্মগ্রহণের পর কয়েকটা বছর সকলে পরম নিশ্চিন্তে কাটাতে পারত, যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে ঠিক সেই অবস্থায়। এখন সেই উদম-যুগটা একেবারে উঠে গেছে। ফলে প্রথম পাঁচটা বছর বেমালুম চুরি হয়ে গেল প্রত্যেকের জীবন থেকে। এখন সভ্য মানুষ সভ্য ভাবে টেবিলস্থ হয়ে তৎক্ষণাৎ একটা কিছু মাজায়-জড়াতে বাধ্য হয়। তারপর হাঁটতে শিখলে কড়া ইস্তিরি করা কড়া কাপড়ের হাঁটু পর্যন্ত নিম্নাঙ্গ আবরণীর ভেতর ঢুকে ধরিত্রীর ওপর ঘুরে বেড়ায়। ক্রমে সেই আবরণীর ঝুল বাড়তে থাকে, এসে পৌঁছে যায় দু'পায়ের পাতা পর্যন্ত। তখন সেই জীবটির যে বয়স কত তা বোঝাই যায় না। দু'ঠ্যাং-এর ক্ষুরধার ইস্তিরির ভাঁজ দু'হাতে সামলাতে সামলাতে সে এমন সব বোলচাল ঝাড়ে, এ হেন ব্যতিব্যস্ততার অভিনয় করে সর্বক্ষণ, চোখে মুখে এমন একটা কড়া ইস্তিরি করা মুখোশ এঁটে থাকে যে তাকে দেখে ধাক্কা খাবার ভয়ে পথ ছেড়ে দিতে হয়। কাজের মানুষের কাজের প্যাঁচে পড়ে কলকাতা শহর এখন শহর নেই, হয়ে উঠেছে একটা ঠেলাঠেলি গুঁতো-গুঁতি করার আখড়া। ছুটতে গেলে পদক্ষেপের জন্যে খানিকটা স্থান চাই, ছুটতে হয় কোথাও পৌঁছবার গরজে, পদক্ষেপের ভুঁইটুকু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে

এক জায়গা থেকে অন্যত্র পৌঁছে দেয়। মাত্র এইটুকুই এখন কলকাতার রাস্তার সার্থকতা। রাস্তা শুধু রাস্তাই এখন, এর বাড়া আর ছিটে ফোঁটা কিছু রাস্তার কাছ থেকে এখনকার মানুষ আশাও করে না, পায়ও না।

কিন্তু তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার একটা রেওয়াজ ছিল। সৃষ্টিকর্তা কপালের ওপর দু'দুটো দেখবার যন্ত্র আটকে দেবার দরুণ তখন মানুষে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত দেখার আনন্দে মশগুল হয়ে। যা দেখত তা হয়ত দেখার মত এমন কিছু নয়। তখন রাস্তায় এত রকমের শাড়ী ব্লাউজ পাদুকা হ্যাণ্ডব্যাগের মিছিল চলত না, তবু তখন লোকে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী অকাজে ঘুরে বেড়াত রাস্তায়। কাজের গরজে যারা ঘুরত তারাও ধাক্কা মেরে যেত না।

তখন ট্রামে-বাসে, বাসে-রিক্সায়, রিক্সায়-গরুর গাড়ীতে কারও সঙ্গে কারও ধাক্কা লাগত না সহজে। এমন কি হৃদয়ে হৃদয়ে ধাক্কাও অতি কম লাগত। হার্দিক সংঘর্ষণ যদি বা ঘটত কোথাও ত' নেপথ্যে ঘটত। এখনকার মত বাসে-ট্রামে, সিনেমায়-পার্কে, মাঠে-গাছতলায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আনাচে-কানাচে, লেকের ধারে, জু-গার্ডেনে, সর্বত্র হার্দিক সংঘর্ষণের স্ফুলিঙ্গ লোকের নাকের ডগায় জ্বলে উঠত না। অর্থাৎ কি না বেহদ্দ বেহায়াপনা দেখে তখন কেউ বাহবা দিত না, ও-সব কাণ্ড যে সব পাড়ায় ঘটত, সে সব পাড়ায় সহজে কেউ ঢুকতে চাইত না।

সেদিন সেই টিপটিপে বৃষ্টিতে অকৃত্রিম অকাজে ঘুরতে লাগলাম কলকাতার রাস্তায়। ছাতা একটা ছিল হাতে, সেটাও সর্বক্ষণ মাথার ওপর মেলে আকাশকে ভেঙ্‌চাতে ইচ্ছে করছিল না। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে আকাশ-যুদ্ধ দেখছিলাম। কালো মেঘে আর সাদা রোদে বেদম লড়াই চলছিল কলকাতার আকাশ দখল করার জন্যে। ডান দিকের মাথা-উঁচু বাড়ীগুলোর আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল সাদা মেঘের দল, হঠাৎ তারা মার-মার করে বেরিয়ে আসতে লাগল তাদের লুকোবার জায়গা ছেড়ে। বাঁ দিকের কালো মেঘেরা থমকে দাঁড়াল। তারপর লাগল জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি। দেখতে দেখতে ডান দিকের এরা, বাঁ দিকের ওদের বাঁ ধারের বাড়ীগুলোর পেছনে তাড়িয়ে

নিয়ে চলে গেল। সারা আকাশ ছেয়ে গেল চকচকে আলোয়। মনে মনে বললাম, বেশ হয়েছে, ছিচ্‌কাঁদুনে কালামুখোদের দূর করে দিয়েছে, ভালই হয়েছে। মনের আনন্দে হাঁটতে লাগলাম ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। রাস্তার মাঝখান দিয়েও তখন বেপরোয়া হাঁটা চলত। চার-চাকা, আট-চাকা, বার-চাকা-ওয়ালারা দু'পেয়েদের ঘাড়ে চড়বার জন্যে তাড়া করত না।

খানিক এগিয়েই যেই মোড় ঘুরেছি, অমনি চোখে পড়ল এক মহাসমারোহ কাণ্ড। ঠিক সামনেই মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সব ফাঁকটুকু জুড়ে কুচকুচে কালো নিরেট নিশ্ছিদ্র বিশাল একখানা মেঘ হু হু করে ছুটে আসছে। সাদা রোদ আর সাদা মেঘের দলকে দ'লে পিষে কোথায় যে তলিয়ে দিচ্ছে তাও বোঝার উপায় নেই। চক্ষের নিমেষে এসে পৌঁছে গেল মাথার ওপর। সভয়ে পেছন ফিরে দেখলাম, অনেক পেছনের বাড়ীগুলোর মাথার ওপর দিয়ে চোখের আড়ালে নেমে যাচ্ছে। অমনি হুড়হুড় করে পড়তে লাগল জল। জলের তোড়ে ছাতা যায় গুঁড়িয়ে। ছুটে গিয়ে ফুটপাথের ওপর উঠে একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে জামা-কাপড়ের জল ঝাড়াছি, আচমকা খেলাম একটা বেমক্কা ধাক্কা পেছন থেকে, সেই নিতান্ত অধাক্কার যুগেও। ছিটকে গিয়ে পড়লাম হাত পাঁচ-ছয় দূরে ফুটপাথ পার হয়ে রাস্তার ওপর। গুরুভার একটা পদার্থ সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার ঘাড়ে। পড়েই সেটা আমায় ছেড়ে দিলে। কোনও রকমে উঠে বসে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেই প্রচণ্ড জলের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে গেছে। যে দরজাটায় আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সেই দরজার মুখে চলছে ব্যাপারটা। এক হোঁৎকা সাহেব বাইরে থেকে এক বিশাল মেম-সাহেবকে আঁকড়ে ধরে টানছেন রাস্তায় নামাবার জন্যে। সাহেবের পেছনটাই দেখতে পাচ্ছি শুধু। কালো কাপড়ের এক ঢাউস প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট আছে পরণে। দু'কাঁধের ওপর থেকে সামনে পেছনে দু'টো কালো ফিতে নেমে প্যাণ্টকে আটকে রেখেছে। সাহেবের আড়ালে মেম-সাহেবকে ভাল করে দেখা গেল না, তবে তাঁর দেহটি যে কি মাপের তা বোঝা গেল।

কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালাম। ছাতাটা রয়েছে ওদের দরজায়, সেটার মায়া ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, ওদের দিকে এগোতেও ভয় করছে। ইতিমধ্যে সাহেব মেমসাহেবকে নামিয়ে ফেললেন রাস্তায়। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে মেমসাহেবের হুঙ্কার ধ্বনি কানে যেতে লাগল। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা। মেমসাহেবের কোমর ঝাপটে ধরেছেন পেছন থেকে সাহেব। সেই অবস্থায় সেই বৃষ্টির মধ্যে ঠেলতে ঠেলতে মেমকে এনে ফেললেন ফুটপাত ছাড়িয়ে আমার সামনে।

হঠাৎ মেমের কি হল মেমই জানেন। দুই থাবা দিয়ে ধরে ফেললেন আমার হাত দু'খানা। ধরেই হাউমাউ করে কান্না। কিছু বোঝবার আগেই মেমকে ছেড়ে সাহেব আমার ডান পাশে এসে জড়িয়ে ধরলেন বাঁ হাতে আমার গলা। ধরে মেমকে কি বললেন। ব্যাস, মেমের কান্নাকাটি ঘুচে গেল। ধাঁ করে তিনি তাঁর বিকটাকার মুখখানা আমার মুখের ওপর চেপে ধরে লাগালেন এক বোম্‌সেল চুমো। উৎকট মদের গন্ধে দম আটকে এল। ততক্ষণে মেম বাঁ পাশে এসে ডান হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমার কোমর। তারপর দু'জনে সেই অবস্থায় আমায় দু'ধার থেকে টানতে টানতে নিয়ে রাস্তায় নামলেন।

আরম্ভ হল আমার দুই কানের কাছে তাঁদের দৈত্য সঙ্গীত। দৈত্য সঙ্গীত ব্যাপারটা আছে কি না কোথাও—তা বলতে পারব না, কিন্তু সেদিন সেই ভয়ঙ্কর জলের মধ্যে দু'কানের গোড়ায় যে মহা সঙ্গীত আরম্ভ হল, সে সঙ্গীতকে কিছুতেই মানুষিক সঙ্গীত বলা চলে না। দৈত্য-দানোরা গান জুড়লে ঐ রকম বীভৎস একটা কিছু দাঁড়াতে পারে বলেই আমার ধারণা হল।

গান জুড়ে দিয়ে তাঁদের নাচবার সখ হল হঠাৎ। আরম্ভ হল আমার দু'পাশে সেই বিশাল বপু দু'টির হিন্দোল। সাহেব ডান হাত আর মেম বাঁ হাত আকাশের দিকে তুলে নাচন সুরু করে দিলেন। দু'জনের চাপে আর জলের তোড়ে দম আটকে এল আমার। অবশেষে ওঁদের পা হড়কালো। তিন জনে-তিন জনের সঙ্গে শেকল দিয়ে গাঁথা, তিন জনেই জড়াজড়ি করে পড়লাম পথের ওপর।

ওঁরা আমায় ছেড়ে দিলেন। তিন জনেই উঠে দাঁড়ালাম। তখন ওঁদের খেয়াল হল যে ভয়ানক বৃষ্টি পড়ছে আর ভয়ানক ভিজে গেছেন ওঁরা। থপথপ করে ছুটলেন বাড়ীর দিকে। চার পা গিয়েই সাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। আমার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—"ওঃ মাই ডিয়ার।"

মেমসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত দেখলেন আমায়। দৌড়ে এসে ধরলেন আমার হাতখানা। তারপরই ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রবল বিক্রমে পা চালালেন। এতটুকু বাধা দেবার আগেই টানের চোটে দরজা পার হয়ে ঢুকে পড়লাম তাঁদের ঘরের ভেতর। পেছনে দাঁড়িয়ে সাহেব আর একটা বিকট চিৎকার করলেন—"গুড্ গড, একদম ভিজে গেছি। পেগী যাও, শিগ্গীর কাপড় পাল্‌টে ফেল। আমরা এধারে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।"

মিষ্টার পেগ এবং মিসেস পেগীর সঙ্গে প্রায় সারা দিনটা কেটে গেল আমার। সাহেব কারও ওজর আপত্তি শোনার লোক নন। স্বহস্তে আমার জামা কাপড় খুলতে এলেন। বাধ্য হয়ে কাপড় জামা ছেড়ে ধোপদস্ত দু'খানা বিছানার চাদর পরলাম আর গায়ে জড়ালাম। সাহেব তাঁর পেন্টুলুন পরাতে চেয়েছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে আমার মত অন্ততঃ এক গণ্ডা জীব তাঁর খোলে প্রবেশ করতে পারে তখন আনলেন দু'খানা ধোয়া বিছানার চাদর। মেমসাহেব বেশভূষা করে একেবারে লেডি হয়ে এলেন। তখন একটু কফি খেতে বসতে হল। বসতেই হবে, আমার জামা কাপড় শুকোচ্ছে যে রান্না ঘরে। না শুকোলে যাব কি করে! কফি খেতে বসে শুনলাম, কেন মিঃ পেগ আছড়ে গিয়ে পড়েন আমার ঘাড়ে। সকাল থেকে বৃষ্টি নামার দরুণ ওঁদের মেজাজ একটু কেমন হালকা হয়ে যায়, কাজেই একটু পান করতে বসেন দু'জনে। পান করতে করতে সাহেবের সখ হয় বৃষ্টিতে গিয়ে নাচবার। টানাটানি করতে থাকেন স্ত্রীকে, একলা নেচে মজা নেই যে। টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছন দরজার কাছে। তখন মিসেস পেগীর মেজাজ এসে গেছে,

উনি মারেন সাহেবকে এক ধাক্কা। আমি যে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব ঠিক সেই সময়, এ ওঁরা জানবেন কি করে! ধাক্কার চোটে সাহেব গিয়ে পড়েন আমার ঘাড়ে। ফলে আমি, সাহেব দু'জনেই গড়াগড়ি খেতে থাকি রাস্তার ওপর।

মিসেস পেগী ঘোঁৎঘোঁৎ করে হাসতে লাগলেন—"ও ডিয়ার, ডিয়ার, সে যা দেখতে হল, ওই পুয়োর চ্যাপ ত' একেবারে চেপ্টে যাবার দাখিল।"—মিসেসের কোমর-বন্ধনী ফট্ করে ছিঁড়ে গেল হাসির চোটে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"মিঃ পেগ, আপনার মত বয়স্থ ভদ্রলোক, হঠাৎ রাস্তায় নাচতে নামলেন, দেখে প্রতিবেশীরা বা কি মনে করবে?"

সাহেব গর্জন করে উঠলেন—"প্রতিবেশী বি ড্যাম্‌ড! এ রকম বৃষ্টি কি সহজে হয় না/ক এ দেশে। আমার খুশী আমি নাচব আমার স্ত্রীর সঙ্গে, হোয়াট্ দি হেল্ আই কেয়ার ফর নেবারস্?"

অকাট্য যুক্তি। কথাটা পালটাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাদের দেশে খুবই বৃষ্টি হয় বুঝি?"

"আঃ—সে যদি তুমি একবার দেখতে। জান, কোথা থেকে আমরা আসছি? আমরা জন্মেছি শিলং পাহাড়ে, চেরাপুঞ্জীর কাছে। ডু ইউ নো হ্বাট্ প্লেস্? ইটস্ এ হেভেন।"—দু'হাত ওপর দিকে তুলে মেমসাহেব মাথার ওপরের ছাতটা দেখিয়ে দিলেন।

অতঃপর চলতে লাগল কথা। কথার সঙ্গে চলতে লাগল দু'জনের মুখে দু'টি শরীরের সঙ্গে মানানসই দুই চুরুট টানা। ছোট্ট ঘরখানি অতি বদ্‌খত ধোঁয়ায় বোঝাই হয়ে গেল। ক্রমে আসতে লাগল ডিসের পর ডিস। আলু ভাজা এল, ডিম ভাজা এল, মাছ ভাজা এল। এল বাদাম ভাজা, পাঁপর ভাজা, হালুয়া, মাংসের চপ। বেয়ারা, খানসামা, বয়, বাবুর্চি সব মিলিয়ে পেগেরা মাত্র একজনকে রেখেছেন। লোকটির বয়স হয়েছে। কিচ্ছু বলতে হল না তাকে। ধীরে সুস্থে এক-এক ডিস এনে সে রেখে দিতে লাগল টেবিলের ওপর। আমাদের মুখ চলতে লাগল, জিভ চলতে লাগল, কোনও মুশকিল নেই। যে দিচ্ছে সে জানে যে যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ মনিবরা খাবার টেবিল ছাড়বে না। মনিবরাও নিশ্চিন্ত

আছে যে যতক্ষণ বসে থাকব খেতে পাবই। ব্যাপার হচ্ছে, ওদের আলাদা বসবার ঘর নেই। হয় গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে বিছানায়, নয় খাবার টেবিলেই বসে থাকতে হবে। খাবার টেবিলে বসে চুপ করে থাকবে কেন, তাই সর্বক্ষণ খায়।

খেতে খেতে জানতে পারলাম যে এই এতটুকু-টুকু এন্তার বাচ্চা হয়েছে ওদের। হয়েছে আর মরেছে। অনেকগুলো মারা গেছে মিসেস পেগীর চাপে। ভয়ানক ঘুমকাতুরে কি না, তাই ঘুমোবার সময় বাচ্চার কথা মনে রাখতে পারতেন না মিসেস পেগী।

"তা আর কি হবে, ভগবান তাদের আত্মাগুলোকে শান্তিতে রাখুন।" —বলে মিষ্টার পেগ একটা এক পোয়া মাংসের চপ মুখে পুরে দিলেন।

মিসেস পেগী সখেদে বললেন—"ওরা থাকবে না বলেই এসেছিল। সেবার ত' একটা তোমার হাতের ওপরেই মারা গেল, শুধু একটু আদর করেছিলে বলে।"

পেগ বললেন—"যেতে দাও, যেতে দাও, ও সব কথা। ওতটুকু ইঁদুর বাচ্চার মত হলে বাঁচবে কি করে? যাক, তা এখন বন্ধু, তোমার কি করা হয়!"

বললাম—"কিছুই করি না এখন। কাজ খুঁজছি, যা দিনকাল পড়েছে।"

সাহেব ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে। মুখটা এগিয়ে আনলেন আমার মুখের কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে আগে কাজ-কর্ম করতে? কি করতে?"

বললাম—"ডকে কাজ করতাম।" কি কাজ করতাম তাও বললাম —"দেশে গিয়েছিলাম। এই মাত্র এসেছি, এখনও কাজের ঠিক করে উঠতে পারি নি।"

মিসেস পেগী জিজ্ঞাসা করলেন—"তা এখন আছ কোথায়?"

"তাও এখনও ঠিক করতে পারি নি।"

সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন মেমকে—"আঃ শুনছ না এই মাত্র এসেছে দেশ থেকে। দু'দিন না ঘুরলে থাকবার জায়গা পাবে কোথায়?"

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"তা এ পাড়ায় ঘুরছ কেন? এখানে ত' তোমাদের স্বজাতি কেউ থাকে না।"

ফ্যাসাদে পড়ে গেলাম! যা মুখে এল বলে ফেললাম—"আমার এক বন্ধু ছিল, তার নাম গোমেশ। সে আমার সঙ্গে কাজ করত। ঘুরে দেখছিলাম যদি তাকে খুঁজে পাই কোথাও।"

সাহেব একটা ঘুষি মারলেন টেবিলের ওপর—"ওঃ হ্যাঙ্গ দি গড, তা বন্ধুকে এখানে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? যেখানে কাজ করতে তোমরা, সেখানেই খুঁজলে পেতে।"

তখন গোমেশের জাহাজে গিয়ে সেলার ঠেঙান থেকে সব বলে গেলাম। শুধু বললাম না পুঁটুরের কথা। বললাম—"জাহাজ থেকে তাকে ভয়ানক অবস্থায় নামিয়ে দেয়। তারপর আর পাওয়া যাচ্ছে না গোমেশকে। ভাবলাম, এ পাড়ায় যদি সে আশ্রয় পেয়ে থাকে কারও কাছে—আপনারা সকলেই যখন তার স্বজাতি।"

মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছ?"

পেগ সাহেব আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, তুমি এমন কারও নাম জান যে গোমেশকে চিনত?"

একটু ভেবে বললাম বার্ড কোম্পানীর সেই সাহেবের কথা। এই পাড়াতেই এক মেমসাহেবের বাড়ীতে আসতেন যিনি, এসে বেসামাল হয়ে পড়তেন। গোমেশ তাঁকে তাঁর বাড়ী পৌঁছে দিত। তাঁর দয়াতেই বার্ড কোম্পানীর খাতায় গোমেশের নাম উঠেছিল। কিন্তু সে সাহেবের নাম ত' জানি না।

সাহেব বললেন—"ওয়েট এ মিনিট প্লিজ। এ পাড়ায় সে মেম থাকত তা তুমি জানলে কি করে?"

বললাম—"গোমেশ বলেছিল, পার্ক স্ট্রীটের এ ধারেই এক মেম-সাহেবের কাছে সে চাকরি পেয়েছিল।"

"কিন্তু এটা ত' পার্ক স্ট্রীট নয়! এটা ইলিয়ট রোড। ওয়াট এ নন্‌সেন্স। আচ্ছা দাঁড়াও"—বলে সাহেব ডান হাতের তর্জনীটি উঁচু করে বাঁ হাত দিয়ে ধরলেন। তারপর বেশ হিসেব করে বলতে লাগলেন—"এক নম্বর হচ্ছে, পার্ক স্ট্রীটের একটা 'গালের' বাড়ীতে এসে সে লোকটা বেসামাল হয়ে পড়ত। আর দু'নম্বর হচ্ছে"—বলে ধরলেন তর্জনীটি

ছেড়ে দিয়ে মধ্যমাটি। ধরে শেষ করলেন দু'নম্বরের হিসেব—"সেই লোকটা বার্ড কোম্পানীতে চাকরি করত। কি বল?"

বললাম—"এক্‌জ্যাক্‌ট্‌লি—"

"কিন্তু থার্ড থিং যা আমার জানা দরকার, সেটা হল এ ব্যাপারটা ঘটে কত দিন আগে?"—সাহেব অনামিকার মাথাটি ধরলেন।

"ধরুন, বছর দেড়েক। আমি আর গোমেশ এক সঙ্গে দেড় বছর কাজ করেছি ডকে।"

সাহেব সোজা হয়ে বসে আঙ্গুলের মাথা ধরা ছেড়ে দিয়ে বললেন—"নাউ, মাই ডিয়ার, তুমি মিসেসের সঙ্গে আর কাপ দুই কফি টান। আমি একজনকে ধরে আনছি, যদি বাই চান্স সে সজ্ঞানে থাকে।"—বলেই উঠে দরজা ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

কি থেকে কি দাঁড়িয়ে গেল। কি করে তখন ধারণা করব যে গোমেশের কথা শোনা-মাত্র পেগ সাহেব লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে যাবেন বাড়ী থেকে!

মিসেস পেগী জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"তাহলে এ পাড়ায় ঘুরছ কেন?"

দুম করে জবাব দিয়ে ফেললাম যা মুখে এল তাই। গোমেশের নামটাই আগে মুখে এল। কারণ একমাত্র গোমেশকেই চিনতাম, যে হল খৃষ্টান। আর অকপট সত্যি কথা হচ্ছে, কেন জানি না, পেগ-পেগীদের দেখে অনবরত গোমেশের কথা মনে উঠছিল। একবার বোধহয় ভেবেও ছিলাম যে, গোমেশের খোঁজটা অন্ততঃ নেওয়া উচিত। নেপেনদা' নিজেকে নিজে চালিয়ে চলতে পারবে। কিন্তু কাঠ-গোঁয়ার গোমেশটা যে কিছুই গুছিয়ে করতে বা বলতে পারে না। শুধু 'ডিস্‌ঘাসটিং' বলে আর থুতু ফেলে। গোমেশের মুখের সেই ভয়ানক অবস্থাটা ভুলতে পারছিলাম না। কেন একবার গোমেশের কথাটা ব্রজমাধবের গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম না। তখন এ জন্যে আফশোষ হচ্ছিল। সে বেঁচে উঠেছে আর সেরে গেছে, এইটুকু জানতে পারলেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। ওরা তাকে সরিয়েই বা ফেললে কোথায়?

যেখানে সরাক গোমেশকে এবার ঠিক জানতে পারবই। এই

আশাটুকু নিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়ে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম পেগ সাহেবের বাড়ী থেকে। তখন কি ভাবতেও পেরেছিলাম যে কি করতে কি করে বসেছি! কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ খোঁচাচ্ছি, এ কথা কি একবারও সন্দেহ হয়েছিল আমার? হয় নি, কি ভাবে ব্যাপারটা জট পাকিয়ে উঠছে তা ধারণা করতে পারলে অত জট পাকাতও না, আর শেষ পর্যন্ত সেই জট আমার গলাতেই ফাঁস হয়ে বসত না।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পেগ সাহেবের ঘরে ভিড় জমে গেল। শকুনির মত দেখতে একটা বুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন পেগ। বুড়ীটা তার দু'চোখ সম্পূর্ণ খোলে না। চীনে মেয়েদের মত ছাতার কাপড়ের লুঙ্গি আর ফিনফিনে এক টুকরো ন্যাকড়ার জামা গায়ে ছিল বুড়ীর। এক হাত লম্বা একটা কিম্ভুতকিমাকার পাইপ টানছিল সে। রক্ত মাংসের বাড়তি ভার একটুও ছিল না বুড়ীর শরীরে, শুধু একখানি কঙ্কাল। অর্থাৎ এতটুকু আবরণ ছিল না বুড়ীর কোথাও, ওর দিকে একবার নজর দিলেই ওর হাড়হদ্দ সব জানা হয়ে যায়!

খাতির করে বুড়ীকে বসিয়ে পেগ একটা মদের বোতল রাখলে তার সামনে। তারপর আরম্ভ করলে খোঁজ নিতে। বর্তমানে কোন জাতের কতগুলো মেয়ে থাকে কোন পাড়ায়, কোন কোন ফিটনওয়ালা তাদের কাছে কমিশন পায়, কার ঘরে বার্ড কোম্পানীর এক সাহেব এসে বেসামাল হয়ে পড়েন। এই জাতের হরেক রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন পেগ, বুড়ীকে। মাঝে মাঝে এক ছিটে এক ছিটে মদ দিলেন। ইতিমধ্যে একজন ভয়ঙ্কর দর্শন সাহেব একে একে বহু ফিটনওয়ালাকে নিয়ে এল। তাদের কাছ থেকে অনেক নাম ঠিকানা লিখে নিলেন মিঃ পেগ। বসে বসে দেখলাম পেগের ধৈর্যের বহর। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই, সমানে সকলের সঙ্গে একভাবে বকে যাচ্ছেন। শেষে সেই বুড়ীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বললেন ভয়ঙ্কর দর্শন সাহেবটিকে। বললেন—"জো, ক্লিয়ার দিস্ নুইসেন্স প্লিজ।"

জো সাহেব বাক্যব্যয় না করে বুড়ীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে এল পাঁচজন অতি চোয়াড় ফিরিঙ্গীদের

সঙ্গে নিয়ে। তখন সকলকে পেগ সাহেব বুঝিয়ে বললেন যে কি করতে হবে—"হারামজাদা পুলিশে গোমেশ ছোকরাকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসে শয়তান সেলারদের হাতে। তারপর থেকে তার সন্ধান নেই। মা মেরীর নাম নিয়ে শপথ কর সকলে, যে আমরা তাকে খুঁজে বার করবই। সবাই মনে করে যে আমরা খ্রীষ্টানরা একেবারে অসহায়, যা খুশী তাই করা যায় আমাদের সঙ্গে। এবার দেখিয়ে দিতে হবে আমরা কি করতে পারি।"

মা মেরীর নামে শপথ করা হয়ে গেল। আমায় বললেন পেগ সাহেব —"নাউ মাই বয়, তুমি যেতে পার এখন। কাল সকালে আসবে এখানে। আজ আমরা সেই বার্ড কোম্পানীর সাহেবের খোঁজ নেব। যে মেয়েটার কাছে তোমার বন্ধু কাজ করত তাকে খুঁজে পেলেই হবে। তখন সেই বার্ড কোম্পানীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কোথায় গেল তোমার বন্ধু গোমেশ? তার অবশ্য জানার কথা নয়, কিন্তু লোকটা ইন্টারেসটেড হতেও পারে। তারপর কি করা যাবে তা ভেবে দেখব। মোটের ওপর জেনে রাখ, বেঁচে থাক আর মরে যাক, তোমার বন্ধুর খোঁজ তুমি পাবেই।"

মিসেস পেগী জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে কোথায় তুমি যাবে এখন? থাকবে কোথায় আজ রাতটা?"

বললাম—"আরও দু'একজন বন্ধু আছে আমার, সে আমি বেশ থাকতে পারব।"

ওরা উঠে দাঁড়িয়ে একে একে আমার ডান হাতখানা ধরে ঝাঁকাল খানিকক্ষণ। সর্বশেষে পেগ সাহেব হাত ধরে বললেন—"লেট মি হোপ, ইওর স্টেটমেন্ট ইজ করেক্ট। মানে অনর্থক তুমি আমাদের বাঁদর নাচাচ্ছ না।"

বললাম—"তাহলে কি মনে কর যে আমি একটা পশু বা শয়তান?"

"না, তা মনে করতে হবে না আমাদের। কিন্তু কাল সকালেই এস তুমি। এখানে ব্রেকফাষ্ট করবে।"—সাহেব হাত ছেড়ে দিলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। চিকচিকে আলো আর রোদে প্রাণ খুলে হাসছে কলকাতা শহর। ভুনিখিচুড়ির কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল তেতলার একতলার সেই খাতা দু'খানার

কথা। সেই খাতা দু'খানায় যখন ফিরব বলে লিখে এসেছি, সে সময়টা চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে পার হয়ে গেছে। ফেরবার কথা মনে হতেই মনটা বিষিয়ে উঠল। ফেরা মানে আবার একটা রাত ব্রজমাধবের সঙ্গে এক বিছানায় কাটানো। বয়ে গেছে আমার ফিরতে। উলটো দিকে পা চালালাম। একটা রাত কোনও বাড়ীর রকে বা গঙ্গার ঘাটে কাটিয়ে দেব। কাল সকালেই ত' আসতে হবে এখানে। তখন দেখা যাবে, এরা কতদূর কি করলে। গোমেশের সন্ধান যদি বার করতে পারে ওরা, তাহলে চলে যাব গোমেশ যেখানে থাকে। গোমেশকে যদি খাড়া করতে পারা যায়, আবার দু'জনে কোথাও একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নেওয়া যাবে। মোটের ওপর ব্রজমাধবের ওখানে আর ফেরা নয়। কাল পুরীতে শচীনের কাছে চিঠি লিখে দেব যে, ওদের চাকরি করা আমার পোষাল না। সুতরাং—অনর্থক একটা ম্যানেজার না থাকলেও শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবীর অক্লেশে চলে যাবে। শচীন চিঠি পেয়ে মনে মনে হাসবে। মনে মনে বলবে—"এত ঠুনকো আত্মসম্মান জ্ঞান তোদের যে—"

যা খুশী তার, সে মনে করতে পারে। কিন্তু আমি আর ফিরছি না। স্ত্রী পাগল, ভগ্নীপতিটি বদ্ধ উন্মাদ। বোনটি নিরেট একটি জন্তুবিশেষ, শুধু খেতে জানে আর ঘুমতে জানে। আর নোংরামি—বহরমপুরের ঘোষ ভিলার সেই ঘরখানা, তার ছবিগুলো, সেই ঝি-গুলো আর সেই ছোট্ট মেয়েটা। মনে পড়লেই গা ঘিনঘিন করে। একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড যে হয় ওদের নিয়ে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে নাকি? সারা রাত কাটান শ্রীমতী শুক্তি-সুন্দরী সেই ব্যাপারে মেতে, যে জন্যে সকাল বেলা গঙ্গা স্নান না করে তিনি ছুঁতেও পারেন না স্বামীকে। আর এখানে ঐ ভগ্নীপতিটি, মরবার ভয়ে অষ্টপ্রহর আটটা পাহারাদার নিয়ে জেগে আছেন আর সেক্স এণ্ড ক্রাইমসের সঙ্গে উপনিষদ পড়ছেন। দূর, দূর এদের সংস্রবে মানুষ থাকে কখনও!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই ষণ্ডা দু'টোকে, ইচ্ছে করে ব্রজমাধবের সংস্রবে আসে নি কিন্তু ওরা। ওদের ধরে এনে ব্রজমাধবের মুঠোর মধ্যে দেওয়া হল। আচ্ছা, কি করছে তারা এখন! তাদের নিয়ে ব্রজমাধব করলে কি! যে অবস্থায় তাদের নিয়ে আসা হল, তারপর কি তারা এখনও

বেঁচে আছে! তেতলায় বসে নেলী যখন মায়ের বাড়ীর মাংস আর ভুনি-খিচুড়ির মশলা বাটাচ্ছে, তখন তারা দু'জন হয়ত একতলার কোনও ঘরে জল জল করে মরছে। বার বার কেঁপে উঠল সর্ব শরীর। ওই পাপ-পুরীতে আবার ঢোকার কথা ভাবতেও পারলাম না।

হঠাৎ দেখি, পোঁছে গেছি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। বহু লোক ঢুকছে লোহার বেড়ার ভেতর। মিটিং হচ্ছে। মাইক তখনও মানুষের মগজে গজায় নি বলে মাইল খানেক দূর থেকে কারও বক্তৃতা শোনা যেত না। লোকের ভিড়ে মিশে আমিও গিয়ে ঢুকলাম মাঠের মধ্যে।

মাচা বাঁধার প্রথাটি এখানকার মত তখন সর্বত্র চালু হয় নি। মাচা-মাইক ছাড়াই বক্তাকে বক্তৃতা দিতে হত তখন। বড় জোর একটা টেবিল জুটত বক্তার উঠে দাঁড়াবার জন্যে। একেবারে সামনে না গেলে বক্তাকে দেখা যেত না বা তাঁর বক্তৃতা শোনাও যেত না।

আমার ভাগ্যে বক্তাকে দেখার সুযোগ ঘটল না, শুনতেও পেলাম না তিনি কি বলছেন। তার বদলে হঠাৎ কাঁধের ওপর পড়ল লাঠির এক ঘা। পর মুহূর্তেই চতুর্দিক থেকে ভীষণ চাপের চোটে দম বন্ধ হয়ে এল। সেই অবস্থা থেকে কি করে যে উদ্ধার পেলাম বলতে পারব না। যখন চোখ মেলে দেখার আর মন দিয়ে কিছু বোঝার মত অবস্থা ফিরে পেলাম, তখন দেখি যে, শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। দু'পাশ থেকে দু'জন লাল পাগড়ি আমার দু'বগলের মধ্যে হাত পুরে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে তুলে পার্কের রেলিং ডিঙ্গিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। সেখান থেকে জনা তিনেক তুলে নিয়ে চড়িয়ে দিলে একটা জাল-মোড়া লরিতে। তৎক্ষণাৎ লরির ভেতর দু'জন এক হেঁচকায় টেনে নিয়ে বসিয়ে দিলে কয়েক জনের ঘাড়ের ওপর। ওই ভাবে আরও কয়েক জনকে তোলার পর জালের দরজা বন্ধ হল। বন্ধ দরজার বাইরে চার পাঁচজন লাল পাগড়ি দাঁড়িয়ে রইল রুল হাতে করে। লরি ছেড়ে দিলে। তখন সেই চলন্ত লরির মধ্যে আমরা গুছিয়ে দাঁড়ালাম। অর্থাৎ বস্তার মত কেউ কারও ওপর চেপে রইলাম না। বিকট চিৎকার উঠল লরির মধ্যে—"বন্দে মাতরম্।"

ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে লালবাজার। পঞ্চাশ বার 'বন্দে মাতরম্'

বলবার আগেই লরি গিয়ে ঢুকল লালবাজার থানায়। দরজা খোলা হল। একে একে নামানো হতে লাগল। নামাবার সময় আর আমাদের বস্তা বাণ্ডিল মনে করা হল না। কারও কপাল কেটেছে, কারও ভেঙ্গেছে হাত, কারও একটা চোখ এমন ফুলে উঠেছে যে মুখটাই গেছে বদলে। নামিয়ে সকলকে নিয়ে যাওয়া হল একটা ঘরে। সেখানে টেবিল-টেলিফোন-টাইপরাইটার নিয়ে এক জঁাদরেল অফিসার বসে আছেন। তিনি তাঁর খাতায় সকলের নাম, ধাম, পেশা, জাতি, বয়স—লিখতে লাগলেন। ভদ্রলোকের গোঁফের সখ আছে, গোঁফকে মোষের শিং বানিয়ে ছেড়েছেন একেবারে। সেই গোঁফ নাচিয়ে তিনি প্রশ্ন করতে লাগলেন আর লিখতে লাগলেন। জবাব দিতে দেরি হলেই বিকট ভ্রূভঙ্গি করে তাকাতে লাগলেন আমাদের দিকে। ছোট বেলায় যাত্রা দেখতাম, অনেকটা যাত্রার সেনাপ।তর মত তাঁর চাউনি। দেখে মনে হল, ইচ্ছে করলে তিনি কেটেও ফেলতে পারেন আমাদের।

জনা পাঁচ-সাতকে প্রশ্ন করা হয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোনটা। যাত্রা দলের সেনাপতি বাঁ হাতে কানে তুললেন ফোন। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর মুখে। চোখ কপালে উঠল,মোষের শিং নীচু দিকে ঝুলে পড়ল, মহা ব্যস্ত হয়ে তিনি আমার নাম উচ্চারণ করে চেঁচাতে লাগলেন।

এক পা এগিয়ে বললাম—"আমার নাম, কি বলছেন বলুন?" আমাকে কিছু না বলে তিনি টেলিফোনেই জবাব দিলেন—"আছেন স্যার, হাঁ এখানেই এসে পড়েছেন। আজ্ঞে না, কোনও আঘাত লাগে নি। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি কথা বলবেন? আজ্ঞে হাঁ স্যার, এই যে দিচ্ছি।"—টেলিফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে অতি বিনীত ভাবে বললেন—"এই নিন স্যার, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, নিজে মিঃ চৌধুরী ফোন করছেন—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।"—সব ক'টা দাঁত বার করে একান্ত ধন্য হয়ে গেছেন এই ভাবে হাসতে লাগলেন।

ফোনটা কানে তুললাম। ব্রজমাধব চৌধুরী অন্য এক প্রান্ত থেকে বললেন—"খেয়েছ ত' ঘা কতক?"

বললাম—"না, তেমন লাগে নি কোথাও।"

ও পাশ থেকে হুকুম হল—"ভাল ছেলের মত চলে এস বলছি এখনো। ওরা গাড়ীতে পাঠাবে। উঃ, সারা দিনটা কি দুর্ভাবনায় যে কাটল।"

সত্যিই দুর্ভাবনার রেশ ফুটে উঠল তাঁর গলায়। ফোন ছেড়ে দিলাম।

ভয়ানক চেঁচামেচি সুরু করেছেন ততক্ষণে সেই মোষের শিং-ওয়ালা প্রভু—"এই কুর্সি লে আও। আঃ, এ জানোয়ারদের নিয়ে আর পারা যায় না। এই বৃকভানু সিং, জলদি চা লে আও বাবুকো আস্তে।" তারপর দু'হাত কচলাতে কচলাতে আমাকে বললেন—"আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না স্যার, মানে আমরা কি করে বুঝব বলুন যে আপনি মিঃ ব্রজমাধব চৌধুরীর আত্মীয়। এমন বিশ্রী চাকরি আমার, একবার যে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করব, তারও ত' সময় নেই। তা স্যার, একটু বসুন। বসুন না আমার এই চেয়ারটাতেই। এখুনি একটা ব্যবস্থা করছি আপনার গাড়ীর।"

ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। সকলকে ঠেলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চার পাশে অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল। জনা তিনেক ছোকরা সামনে এসে ভাল করে দেখে নিলে আমায়। একজন পেছন থেকে বলেই ফেললে— "বিষ কেউটের ঝাড়। বাছাধন আজ ঘা কতক খেয়েছে আমাদের সঙ্গে।"

আর শুনতে হল না কারও মন্তব্য। গাড়ী পাওয়া গেছে। দু'জন সার্জেন্টকে সঙ্গে নিয়ে সেই মহাপ্রভু ঘরে ঢুকলেন। "আসুন স্যার আসুন, ভয়ানক কষ্ট হল আপনার। মিঃ চৌধুরী ভয়ানক ভাবছেন নিশ্চয়ই ওধারে।"

গাড়ীতে তুলে দিয়ে তিনি দু'হাত কচলাতে লাগলেন—"বলবেন স্যার, মিঃ চৌধুরীকে আমার নামটা। নাম তিনি জানেন অবিশ্যি। আমি হচ্ছি পুলিন পাল। আচ্ছা, নমস্কার স্যার, কালই একবার যাব আপনাদের ওখানে—হেঁ হেঁ—"

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

তেতলার দরজা পার হতেই নেলী বলে উঠল—"ধাঃ, এত দেরী করে ফিরলেন দাদা, খিচুড়িটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।"

ঘরের ভেতর থেকে ব্রজমাধব বললেন—"ট্যাস সাহেবের বাড়ী সারাটা দিন বসে বসে গিলেছে যে, ও তোমার খিচুড়ির পরোয়া করে কি না!"

চমকে উঠলাম ভয়ানক ভাবে। জানলেন কি করে ব্রজমাধব আমি সারা দিনে কি করেছি!

বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে ব্রজমাধব। বললেন—"যাও যাও, আগে জামা কাপড় ছেড়ে স্নান কর। কাদায় ধূলোয় যা অবস্থা হয়েছে। রক্ষে কর বাবা, স্বদেশী বক্তৃতা মাথায় থাকুক! বক্তৃতা শুনতে গেলে এই হাল হবার ভয়ে জীবনে বক্তৃতা শোনা হল না আমার।"

সহ্য হল না আর। বলে ফেললাম—"এ হাল হওয়ার দরুণ কে দায়ী? পুলিশই ত' এই সব অনর্থক হয়রানির মূল।"

ব্রজমাধব দু'হাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল তুলে বললেন—"জান তুমি কচু। পুলিশ কি করবে? তার চেয়ে বললেই পারতে, পুলিশের হাতের লাঠিগুলো দায়ী। কি মুশকিল রে বাবা, যাদের হুকুমে পুলিশ লাঠি চালায়—তারা দায়ী নয়, দায়ী হতে গেল কুড়ি টাকা মাইনের চাকরগুলো! দায়ী হচ্ছে সেই ব্লক-হেডেড্ গর্দভগুলো, যারা পাব্লিকের সামনে পাব্লিকের ওপর লাঠি চালাবার হুকুম দেয়। দিয়ে পাব্লিককে আরও ক্ষেপিয়ে তোলে। যাক্ গে, এ সব নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না দাদা। আরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এদের বোকামি দেখতে দেখতে আমার চুল পেকে গেল। যাও, তুমি স্নান করে এস গে। তারপর শুনি তোমার সেই ট্যাস বন্ধুটির কথা। কি যেন তার নামটা! শালার পুলিশে হতভাগাকে জাহাজে তুলে দিয়ে এল! আচ্ছা, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তাদের মজা।"

স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ সব কথা আপনি জানলেন কি করে?"

অম্লান বদনে ব্রজমাধব বললেন—"গুরুর দয়ায় ব্রাদার। গুরুজীর আশীর্বাদে অনেকের অনেক কথাই জানতে হয় আমাকে, তাই আটটা লোক দিনরাত আমায় পাহারা দেয়। চুলোয় যাক্ এখন সে সব কথা, আগে স্নানটা করে এস ত'। তারপর খাও কিছু, ট্যাসের ওখানে ত' শুধু কফি আর ডিম ভাজা খেয়েছ।"—বলে স্ত্রীকে হুকুম করলেন লুচি বানাতে।

স্নান করলাম। লুচি তরকারি খেলাম পেট ভরে। তারপর গিয়ে উঠলাম ব্রজমাধবের খাটের ওপর। ব্রজমাধব উপনিষদ্ পড়ছিলেন! উপনিষদের পাতা থেকে চোখ না তুলে ডান হাতে আমার দিকে একটা কাগজ ঠেলে দিলেন। বললেন—"পড়ে দেখ, ঠিক মেলে কি না।"

কাগজখানা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলাম। পড়তে পড়তে চক্ষু কপালে ওঠবার যোগাড় হল আমার। সকালে এখান থেকে বেরিয়ে যে রাস্তা দিয়ে যেখানে গিয়েছিলাম আমি, তার হুবহু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পেগ-পেগীদের সঙ্গে রাস্তায় গড়াগড়ির কথা বেশ রসিয়ে বলা হয়েছে। ওদের ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানার চাদর পরে খেতে বসার কথা বলা হয়েছে, মায় কি কি খেয়েছি সে বর্ণনাও ঠিক মিলে গেল। সেই বুড়ীটাকে আনা, তাকে ফেরত দেওয়া, ফিটনওয়ালাদের আসা, সেই জো সাহেব, ফিরিঙ্গীগুলো, মা মেরীর নামে শপথ, সব লেখা রয়েছে কাগজে। এমন কি গোমেশ নামটি পর্যন্ত বাদ যায় নি। শেষ পর্যন্ত পড়তে পড়তে হাত পা ঝিমঝিম করতে লাগল আমার। চোখের ওপর টাইপ করা অক্ষরগুলো জড়িয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রজমাধব উপনিষদ্ থেকে মুখ তুলে বললেন—"ভেবেছ ওই ফিরিঙ্গীগুলো তোমার বন্ধুকে খুঁজে বার করবে? ও শালারা এতক্ষণে মদ খেয়ে টঙ হয়ে পড়েছে। ওরা বড় জোর পার্ক সার্কাসের সেই ছুঁড়ীকে খুঁজে বার করবে, যার বাড়ীতে তোমার বন্ধু আগে কাজ করত। কিন্তু তাতে ফলটা কি হবে? যত সব—হুঁঃ।"

একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা শেষ করলেন ব্রজমাধব। তারপর টেলিফোন তুলে নিয়ে কাকে ডাকলেন। মিনিট দুই চুপ করে ধরে রইলেন টেলিফোনটা কানে। শেষে এই ক'টি কথা হল ইংরেজীতে।

"শোন হ্যারিশ, আমি চৌধুরী বলছি। আমি তোমার নামে রিপোর্ট দিচ্ছি যে, তোমরা গোমেশ নামে একটা ফিরিঙ্গীকে জাহাজের সেলারদের হাতে দিয়ে দাও। তারপর তার কি হল, কেউ জানে না।"

এক মিনিট চুপ। ব্রজমাধবের গলায় স্ফূর্তির ঢেউ উথলে উঠল।

"কি বললে? কবে হয়েছে, কোন জাহাজে হয়েছে, এসব আমি

তোমাদের বলতে যাব? হা হা হা হা, তার আগে আমি আমার এক পাটি জুতো চিবিয়ে খেয়ে ফেলব বরং। মিঃ হ্যারিশ, ব্রজমাধব চৌধুরী একটা গর্দভ নয়। এটা একটা মার্ডার কেস, সেটুকু মাথায় ঢুকেছে তোমার? আরও জেনে সুখী হও যে, গোমেশ ছোকরাটি আমার লোক ছিল। সে সরকারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক ছিল।"

আবার এক মিনিট চুপ। এবার ব্রজমাধবের গলা থেকে আগুন ছুটতে লাগল—"ইয়েস মিঃ হ্যারিশ, তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে অনর্গল আর্মস্ এ্যামুনিশন নামছে, তা দিয়ে খুন করা হচ্ছে দেশের কর্তব্যরত অফিসারদের, আর তোমরা বিনা পয়সায় হুইস্কি টানছ কাষ্টম অফিসারের সঙ্গে বসে। ওয়েল থ্যাঙ্ক ইউ। আমি ব্রজমাধব চৌধুরী এবার একটু দেখতে চাই যে, সরকার বাহাদুরের পোর্ট পুলিশ চাঙ্গা হয় কি না।"

বেশ একটু লম্বা সময় ব্রজমাধব ধরে রইলেন ফোনটা কানে। তার পর সহজ গলায় বললেন—"গড্ হেলপ্ মি টু বিলিভ ইউ। ওন্‌লি টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তোমায় সময় দিতে পারি। দেখ, পার ত' চেষ্টা কর তাকে বার করতে। ব্যাপারটা কত দিনের মধ্যে ঘটেছে তাও তোমায় বলব না। ধর আজ থেকে এক বছরের মধ্যে। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, তোমার টাইমেই ঘটেছে ব্যাপারটা। এইটুকু জেনে সন্তুষ্ট হও। তুমি তখনও চার্জ নাও নি এ কথা বলে এস্কেপ করতে পারবে না। ওয়েল, মনে রেখ ওন্‌লি টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স।"

বেশ আওয়াজ করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ব্রজমাধব। আমার দিকে ফিরে বললেন—"এখন রাত নটা। কাল রাত নটার মধ্যে ওরা আমায় জানাবে সেই গোমেশ ছোকরার কি হল। চুপ করে বসে থাক, তোমার বন্ধুকে এখানে তোমার সামনে এনে হাজির করছি। নাও এখন, পাড় দাবা, এক চাল বসা যাক।"

পর দিন সকালে এল টেলিগ্রাম।—"পুরী চলে এস এই মুহূর্তে, শুকতারার অবস্থা খারাপ।"

টেলিগ্রাম যখন এল, ব্রজমাধব তখন পূজার ঘরে। নেলী বললে—

"তখনই জানতাম যে অবস্থা খারাপ হবে। দাদার সঙ্গে বৌদি ছ'টো দিনও কাটাতে পারে না।"

বিকেলের দিকে গাড়ী, চুপ করে বসে রইলাম। ব্রজমাধব পূজার ঘর থেকে বেরলে টেলিগ্রাম দেখিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব। নেলী কিন্তু তখনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, রাত্রে আমি গাড়ীতে কি কি খাব তার ফর্দ করতে বসে গেল। লুচি, আলুর দম, হালুয়া আর বেগুন ভাজা। বাস্তবিক বলছি, চটে উঠলাম ওর কাণ্ড দেখে। বললাম—"একটা মানুষের যে কি হল সেখানে তার ঠিক নেই—আর তুমি, গাড়ীতে কি খাব তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে খুন হচ্ছ।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হেসে উঠল নেলী—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড। বৌদিকে আপনি আমার চেয়ে বেশী চেনেন কি না। গিয়ে দেখবেন, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আপনার শুকতারার সবই ঠিক আছে, এতটুকু টসকায় নি কোথাও। ছটফট করে মরছেন তিনি বহরমপুরের সেই ঝি-গুলোর জন্যে। সেবার আমাদের সঙ্গে দার্জিলিং গিয়েও ঐ রকম হল। দাদা বলে তাই সহ্য করে, অন্য মানুষ হলে—হ্যাঁ—"

অন্য মানুষ হলে অন্য ব্যবস্থা করত, এ আমিও জানি। কিন্তু শচীন অন্য মানুষ নয়, সে শচীনই। অন্য মানুষে যা পারে শচীন তা পারে না, এ জ্ঞান আমারও আছে। কিন্তু কি সহ্য করে শচীন? কেন নেলীর বৌদি নেলীর দাদার সঙ্গে কোথাও গিয়ে ছ'টো দিন কাটাতে পারে না? কেন সে ছটফট করে মরে সেই ঝি-গুলোর জন্যে? আর এ সব কথা এরাই বা জানলে কি করে? কি বিশ্রী কাণ্ড!

হঠাৎ আমার কান মুখ জ্বালা করে উঠল। বহরমপুরের সেই ছবিগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। রাগে জ্বলে উঠল সর্ব শরীর। যাচ্ছি আমি পুরীতে। গিয়ে যদি দেখি যে কিছুই হয় নি শুকতারার, শুধু শুধু সে পালিয়ে আসতে চাইছে বহরমপুরে—তাহলে সোজা ভাষায় তার মুখের ওপর বলে আসব যে, তার মত ছোটলোকের কাছে চাকরি করার চেয়ে না খেয়ে মরাও ঢের ভাল আমার। ব্যাস—

টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠল নেলী—"একি! উনি পুজোর

ঘরে থাকলে ত' ফোন দেবার হুকুম নেই !" চোখ বড় বড় করে সে ছুটল পাশের ঘরে। এক মিনিট পরে ফোন ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পড়ল ব্রজমাধবের পূজার ঘরের সামনে। দুম দাম করে ঘা দিতে লাগল দরজায়—"শুনছ, এই শোন না, রাজসাহীর কমিশনারের ওপর বোমা ফেলেছে আর—"

দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ব্রজমাধব। খালি গা, একখানা রক্তবস্ত্র পরে আছেন তিনি, কপালে একটা সিন্দূরের ফোঁটা। দু'চোখের অবস্থা কেমন যেন ঢুলুঢুলু। স্ত্রীকে এক পাশে সরিয়ে যে ঘরে ফোন আছে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন—"হ্যাঁ ওদের প্রত্যেকটিকে চাই, এবারে আমি আর ছাড়ছি না। বিষ দাঁত উপড়ে ফেলবই।"

তারপর অনেকক্ষণ আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না ও ঘরে। নিঃশব্দে আমার সামনে বসে নেলী কুটনো কুটতে লাগল।

জুতোর শব্দ হল দোরের কাছে। মুখ তুলে দেখলাম ঘরে ঢুকছে এক খাকী-পরা সাহেব। চোস্ত ইস্তিরি করা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা খাকী প্যান্ট, কোমরে প্রায় এক বিঘত চওড়া চকচকে কালো চামড়ার বেল্ট, তাতে ঝুলছে পিস্তল সুদ্ধ চামড়ার খাপ, খাকী সার্টের বুকের ওপর দিয়ে কাঁধে গিয়ে উঠেছে চামড়ার একটা ফালি, বগলে রয়েছে একটা পুলিশী টুপি। ঐ সাজে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেখে বঁটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেলী। আকুল কণ্ঠে বলে উঠল—"একি ? এসব পরলে যে আজ আবার !"

হা হা করে খুব হালকা গলায় হেসে উঠলেন ব্রজমাধব। বললেন—"শোন ভায়া, শোন তোমার বোনের কথা। পুলিশের চাকরি করব, মাইনে পাব, উনি টাকাগুলো বাক্সে পুরে চাবির গোছাটা পিঠে ঝুলিয়ে বেড়াবেন। আর পুলিশের জামা-কাপড় গায়ে দিতে দেখলেই চক্ষু চড়ক-গাছে তুলবেন। ওর দাদার মত বিয়ে করে আমি জমিদারি পাই নি ত'—"

নেলী ও সব কথায় কানও দিলে না। এবার তার গলা ভেঙে পড়ল কান্নায়।—"আবার বেরচ্ছ বুঝি কোথাও ?"

"আজ্ঞে না, এক পা বেরব না। আপনার চরণের তলায় বসে থাকব। একটা কন্‌ফারেন্স হবে একটু পরে। বড় সাহেবরা আসছেন। তাঁদের

সামনে ত' আর নটবর সেজে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসা যায় না।"

"ঠিক বলছ ত'?"

"বিশ্বাস না হয়, নীচে খবর নিও। আচ্ছা এখন একটু খাইয়ে দাও কিছু।"

নেলী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ব্রজমাধব আমার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"শান্তিতে এরা থাকতে দেবে না দেখছি। যাক্ ভায়া, তোমার কিন্তু আজ বেরনো চলবে না কোথাও। আজ আর তোমার পেছনে লোক দিতে পারব না।"

বললাম—"কেন লোক দেবেন আমার পেছনে? কি করেছি আমি।"

"কি করেছ?"—জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন ব্রজমাধব কয়েক মুহূর্ত। দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে বললেন—"আমার কাছে থেকেছ এই রাত ক'টা, আমার এখান থেকে বেরিয়েছ—ঢুকেছ। তোমার জাত গেছে ব্রাদার, কেউ বলতে পারে না, তোমায় খুন করবার জন্যে তারা ওৎ পেতে আছে কি না।"

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—"কারা তারা! আমায় খুন করবে কেন?"

সেই এক সুরে ব্রজমাধব বলে গেলেন—"তারা এ দেশের স্বাধীনতা আনবে। আমার কাছে আছ যখন দু'টো দিন, তখন তুমি তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছ। তাই তোমায় খুন করবে।"

বললাম—"এ আপনার ভুল ধারণা। আমাকে কিন্তু আজ যেতে হবেই। এই দেখুন টেলিগ্রাম।"

টেলিগ্রামটার ওপর চোখ বুলিয়ে ব্রজমাধব বললেন—"যত ন্যাষ্টি কাণ্ডকারখানা।" একটু সময় চুপ করে থেকে কি ভাবলেন। হঠাৎ যেন একটা পথ খুঁজে পেয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, যাবে তুমি নিশ্চয়ই, যখন তোমার মনিবের হুকুম এসেছে তখন যাবে বৈ কি! আর—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আজই যাও তুমি সেখানে, নিয়ে এস রাণী বৌকে। আমি চিঠি দোব, এখানে আসলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। হ্যাঁ—খুবই ভাল হবে এখন তিনি এলে"—বলতে বলতে ব্রজমাধব অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। মুখ তুলে ওপর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চাউনি দেখে মনে হল, তিনি যেন অনেক দূরের অনেক কিছু দেখছেন তন্ময় হয়ে।

॥ তিন ॥

না, কেউ আমায় খুন করতে আসে নি গাড়ীতে। আসলেও পারত কি না সন্দেহ। ব্রজমাধব আমায় জানান নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার সহযাত্রী দু'জন আমার পাহারাদার। টিকিট ব্রজমাধব কিনিয়ে আনিয়ে দিলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট। গাড়ীতে চারজন শুয়ে যেতে পারে। কিন্তু গেলাম আমরা তিন জনে। আমি ঘুমতে ঘুমতে, আমার সহযাত্রী দু'জন কিন্তু একটিবারের জন্যে চোখ বুজলেন না, ঠায় বসে রইলেন দু'জনে জেগে। আলাপ করবার চেষ্টা করলাম। একজন দু'কান দেখিয়ে হাত নাড়লেন, অর্থাৎ বদ্ধ কালা, শুনবেন কি করে! আর একজন এমন এক ভাষায় কিচির মিচির করে উঠলেন যে, হাসি চাপতে আমায় অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হল। সুতরাং নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পুরীতে গিয়ে পৌঁছলাম।

গাড়ী থেকে প্ল্যাটফরমের ওপর পা দিতেই কানে গেল—"এলি তাহলে তুই, আঃ বাঁচলাম।"—আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলে শচীন। চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। এ ক'দিনের মধ্যে কি করে এতটা বুড়ো হয়ে গেল ও! চোখের কোল বসে গেছে, কপালের ওপর থেকে চুলগুলো খানিক পেছিয়ে গেছে, গাল দু'টো বেশ একটু ডাবা, আর দাড়িও কামায় নি কয়েক দিন। তাছাড়া কাঁধ দু'টোও যেন ধনুকের মত বেঁকে গেছে ওর। কুঁজো হয়ে কখনও হাঁটতে দেখি নি শচীনকে। তার চলন দেখে মনে হল, বেশ কুঁজো হয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে। প্ল্যাটফরমের বাইরে এসে ঘোড়ার গাড়ীতে উঠলাম দু'জনে।

অনেকক্ষণ এক ভাবে জানলার বাইরে চেয়ে বসে রইল শচীন। গাড়ী চলছে ত' চলছেই। শুনেছিলাম ওরা সমুদ্রের ধারে হোটেলে থাকে, হোটেলটা ষ্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়। প্রায় ঘণ্টা খানেক গাড়ী চলবার পরেও যখন দেখলাম সমুদ্রের ধারে পৌঁছলাম না, তখন জিজ্ঞাসা করলাম—"হোটেল আর কত দূরে রে?"

গাড়ীর মধ্যে মুখ ফিরিয়ে শচীন বললে—"আমরা একটু ঘুরে যাচ্ছি। তোর সঙ্গে হু'টো কথা আছে আমার। ওকে তুই নিয়ে যা ভাই।"

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায়! অসুখ খুব বাড়াবাড়ি নাকি?"

শচীন বেশ চেষ্টা করে থেমে থেমে বললে—"হ্যাঁ, তা বাড়াবাড়ি বৈ কি। আমার সঙ্গে থাকলে ওর অসুখ সারবে না, ও শুকিয়ে যাবে আমার চোখের ওপর। তার চেয়ে ওকে নিয়ে যা তুই এখান থেকে।"

বললাম—"আর তুই এখানে একলা থাকবি নাকি?"

"না না, একলা থাকব কেন। থাকব এই সমুদ্রের সঙ্গে। ঐ দেখ সমুদ্র, আমরা সমুদ্রের ধারে এসে পড়েছি।"

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গাড়া থামাতে বললে শচীন। বললে—"আয়, বসি একটু সমুদ্রের ধারে। এখনও রোদ ওঠে নি।"

নামলাম, নেমে জলের ধারে গিয়ে বসলাম হু'জনে। আমার জীবনের প্রথম সমুদ্র দর্শন। দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম সামনে। আর কখনও অত দূরে দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছয় নি, অমন ভয়ানক ভাবে আছড়ে এসে পড়তেও কোনও কিছুকে দেখি নি জীবনে। আর রঙ, আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্ততঃ রঙের জন্যেও সমুদ্র অতুলনীয় জগতে। কালো নয়, সাদা নয়, নীল, হলদে, বেগুনে, পাঁশুটে এ সব কিছুই নয়। এ এক অতি অপূর্ব বর্ণ। নীলাম্বু হল সমুদ্রের আর একটি নাম, কারণ সমুদ্র নাকি নীল। কিন্তু আমি বলছি, সমুদ্রের রঙ নীলও নয়। মানুষের মনের রঙ কি রকম তা কি কেউ বলতে পারে? আমি পারি, সমুদ্রের রঙ মানুষের মনের মত। মানুষের মনের রঙ সমুদ্রের রঙের মত। রঙে রঙ মিলিয়ে যায় বলেই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ মন হারিয়ে ফেলে।

সেই কথাটাই শেষ পর্যন্ত বললে শচীন। বললে—"কি আশ্চর্য মানুষের মন, কি বিচিত্র তার গড়ন, কি অদ্ভুত তার পছন্দ-অপছন্দ। ঠিক এই সমুদ্রের মত। সারাটা জীবন এই ভাবে সমুদ্রের ধারে বসে কান পেতে শুনলেও কি এতটুকু হদিস পাওয়া যাবে, কি আছে এই সমুদ্রের মনের মধ্যে, কেন ও এভাবে অনবরত মাথা খুঁড়ে মরছে বালির ওপর!

এই যে অবিরাম কেঁদে চলেছে সমুদ্র হা হা হা হা করে, এ কান্নার মানে কি? যাবে না, কিছুতেই টের পাওয়া যাবে না সমুদ্রের মনের কথা। বৃথা চেষ্টা, একদম অনর্থক বেফয়দা মেহনত।"

একটু দম নিয়ে শচীন আকুল অনুনয় করলে আমায়—"নিয়ে যা ভাই, ওকে তুই সরিয়ে নিয়ে যা এখান থেকে। আমায় বাঁচা।"

ওর যা বলার তা বলা হয়ে গেল। কান পেতে শুনতে লাগলাম সমুদ্রের কান্না। দেখতে লাগলাম চোখের সামনে তার মাথা কোটাকুটি। উঃ, কি অসহায়। সেই প্রথম সমুদ্র দর্শনের দিন সর্বাগ্রে যে কথাটি আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তা হচ্ছে সমুদ্রের মত অসহায়, অসহায় আর অসহ্য বেদনায় অস্থির, ছুনিয়ায় আর কিছুই নেই। সমুদ্রের অসীম বেদনার এতটুকু অংশ নিতে পারে এমন একটি প্রাণীও নেই ছুনিয়ায়। তাই সমুদ্র ছুনিয়ার একেবারে একান্তে পড়ে অষ্টপ্রহর অহর্নিশ গুমরে গুমরে কাঁদছে।

বেশ গুছিয়ে নিলাম মনে মনে আমার বক্তব্য। এতটুকু ঝাঁজ রাখলাম না গলায়। বললাম—"আমি ভাই এবার রেহাই পেতে চাই তোদের ব্যাপার থেকে। তোদের মধ্যে কি গণ্ডগোল আছে, তোরা জানিস। এর মধ্যে আমার মাথা গলানো উচিত নয়। আমি বিয়ে থা করি নি, এ সব ঝঞ্ঝাটের আমি বুঝিই বা কি বল। তাছাড়া লোকে বলবে কি? একদিন হয়ত তোর আমার মধ্যেই ভুল বোঝাবুঝি স্বরু হয়ে যাবে, এখন থেকে সাবধান না হলে। তাই আমি কলকাতা থেকে ঠিক করে এসেছি যে এবার আমি তোদের কাছ থেকে ছুটি নেব।"

সমুদ্রের ওপারে কি আছে তাই বোধ হয় এক মনে দেখতে লাগল শচীন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। আমার কথাগুলো শুনল কি না, তাও বুঝতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন নিজেকেই নিজে বললে—"তাই যা। নয়ত তোর জীবনটাও বিষিয়ে যাবে হয়ত। না, তোর আমার মধ্যে কোনও দিন ভুল বোঝাবুঝি হবার ভয় নেই। এর মধ্যে কোথাও কিছু মাত্র ভুল বোঝার সম্ভাবনা নেই। কোনও কালে রাণী কোনও পুরুষকে সহ্য করতে পারবে না। পুরুষকে সে পুরুষ বলেই মনে করে না।

তুমি, আমি, পৃথিবীসুদ্ধ কাউকেই নয়। যে দুরন্ত ব্যাধি জন্মের সঙ্গে সে নিয়ে এসেছে, তার হাত থেকে একমাত্র আত্মহত্যা ছাড়া উদ্ধার হবার কোন পন্থা নেই তার। সেদিন কোন এক পরম লগ্নে তুই তাকে শুকতারা বলেছিলি, ঐ নামটায় তার নেশা ধরে গেছে। ঐ নামে ডাক দিলে সে কিছুক্ষণ মানুষ থাকে, তারপর আবার যা-কে-তাই। বাপ-ঠাকুর্দা' চোদ্দ পুরুষের বিষাক্ত রক্তের ঋণ তাকে শোধ করতেই হবে।"

আলগোছে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিন্তু সে ব্যাধিটা কি ?"

"আন্দাজ কর নিজে। একটু মাথা ঘামা, বুঝতে পারবি। রাণী আমায় বলেছে, যে, তুই তার ঘরে ঢুকেছিলি, যে রাত্রে আমি শিউড়িতে যাই। ছবিগুলো দেখেছিস, ঝি-গুলোকে দেখেছিস, ছোট একটা মেয়েকেও দেখেছিস, এ থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারিস নি তুই ? অন্ততঃ একটা কিছু ধারণা ত' নিশ্চয়ই করেছিস। ওই সমস্ত দেখে কি ধারণা হয়েছে তোর মনে, আগে তাই বল ?"

বললাম—"কিছুই ধারণা হয় নি আমার। শুধু ভয়ানক বিশ্রী লেগেছিল ব্যাপারটা। ভেবেছিলাম, একদিন জিজ্ঞাসা করব তোকে।"

তখন শচীন শোনাল এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। শুধু অবিশ্বাস্য নয়, অমন উদ্ভট কাণ্ড কারখানা যে ঘটতে পারে কোথাও তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। শচীনের দাদাশ্বশুর বহু টাকা খরচ করে ঐ ছবিগুলো আঁকান। দুর্দান্ত প্রজাদের সায়েস্তা করবার জন্যে তিনি এক অপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন মাথা খাটিয়ে। ঐ ছবিগুলো আর আয়নাগুলো যে ঘরে টাঙানো থাকত, সেই ঘরের ভেতর অবাধ্য প্রজাটিকে এনে বসানো হত। কতকগুলো পোষা নারী ছিল তাঁর। তাদের মদ খাইয়ে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেওয়া হত সেই ঘরে। সারা রাত প্রজাটিকে ঐ ছবিগুলোর মাঝখানে বসে দেখতে হত উন্মত্ত নারীদের বীভৎস কামড়া কামড়ি। লোকটা হয় পাগল হয়ে যেত, নয়ত তার মনোবল এমন ভাবে ভেঙে পড়ত যে, সে কেঁচো হয়ে বেরিয়ে আসত ঘর থেকে। কস্মিন কালেও আর মাথা তুলতে পারত না।

শচীনের শ্বশুর পিতৃ সম্পত্তির সঙ্গে ঐ ছবিগুলোও পেলেন। তিনি

কিন্তু প্রজা শাসনের কাজে ওগুলোকে ব্যবহার করলেন না। ডোম হাড়ী বাগ্‌দীদের ঘর থেকে যৌবনপুষ্ট মেয়েদের আমদানী করলেন। নিজে তিনি তাদের অঙ্গস্পর্শ করেন নি কখনও। বিশ্রী এক ব্যাধির দরুণ তা করার উপায় ছিল না তাঁর। সেই মেয়েগুলোকে ঐ ছবি-টাঙানো ঘরের মধ্যে পুরে সারা রাত তিনি তাদের উন্মত্ততা দেখে মশগুল থাকতেন। শেষ জীবনে কয়েকটা বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থাকতে হয় তাঁকে। তাঁর মেয়ে বড় হয়েছে তখন। সব কিছু বুঝতে শিখেছে। মেয়ের মা মেয়েকে তিন বছরের রেখে মারা গেলেন। মেয়েকে সামলাবার কেউ রইল না। তখন বাপের পোষা সেই ঝি-গুলোর পাল্লায় পড়ে গেল মেয়ে। লুকিয়ে তারা ওকে বাপের বিলাস ঘরে নিয়ে গেল। ছবিগুলো দেখাল। সেই কচি বয়সেই মেয়ে মেতে উঠল তাদের সঙ্গে! পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বাপ জানতেও পারলেন না যে কি বিষ তাঁর মেয়ে গিলছে—তাঁর চোখের আড়ালে। জানলেও তখন তাঁর বাধা দেবার শক্তি ছিল না। তিনি ঠিক করলেন, এমন একটি জামাই চাই, যে তাঁর ছেলের স্থান অধিকার করবে, যাকে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে শান্তিতে মরতে পারবেন।

শচীনের বাবা সম্পত্তির লোভে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরদিন জমিদার জগত্তারণ জামাইকে কাছে ডেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে অকপটে সব ব্যক্ত করলেন। আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে তাঁর দোষে তাঁর কন্যাকে যেন জামাই ত্যাগ না করে।

শচীন প্রতিজ্ঞা করেছিল, এবং আজও সেই প্রতিজ্ঞা প্রাণ পণে রক্ষা করে চলেছে। অবাধ স্বাধীনতা সে দিয়েছে স্ত্রীকে। আশা করেছে যে, একদিন স্ত্রী বুঝবে তার ভুল, স্বামীকে স্বামী বলে মানবে। নারীত্ব ফিরে পাবে সে, পুরুষত্বকে মূল্য দিতে শিখবে।

না, সে আশা আর নেই। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সে অদ্ভুত অভিনয় করে! দয়া-মায়া-প্রেম-করুণা-শিক্ষা-শালীনতা-লজ্জা-ঘেন্না এই সমস্ত দুর্লভ সামগ্রী দিয়ে গড়া মমতাময়ী এক মানবী সারা দিন শচীনের পাশে পাশে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় অন্তর্ধান করে সেই দেবী মূর্তি, তার বদলে বেহায়া এক শয়তানী

আত্মপ্রকাশ করে। কিছুতেই সে তখন স্বামীকে সহ্য করতে পারে না। নিজের নরকে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সারা রাত কাটায়। বাধা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে ফল হয়েছে সাংঘাতিক। বিষ খেতে গেছে, গলায় দড়ি দিতে গেছে। কিংবা আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে, যেমন গাছের ফুল রোদ লাগলে শুকিয়ে যায়।

ওভাবে শুকিয়ে যাওয়াটা শচীন সহ্য করতে পারে না। থাকুক ও বেঁচে, তাজা হয়ে থাকুক ও—ওর ব্যাধি নিয়ে। শচীন আমৃত্যু অপেক্ষা করবে ওর জন্যে দূরে বসে। তবু ওকে মারতে পারবে না।

সব শুনে বললাম—"তা এখন আমায় কি করতে হবে শুনি?"

শচীন বললে—"ওকে বহরমপুরে রেখে দিয়ে তোর যেখানে খুশী চলে যাবি। আর তোকে আমি আটকে রাখব না।"

বললাম—"সে কাজটা তুই-ই কর না কেন?"

ব্যাকুল কণ্ঠে শচীন বললে—"না ভাই, কিছুতেই আমি আর সে বাড়ীতে ঢুকব না। কিছুতেই নয়, এবার সেখানে গেলে আমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে।"

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—"কিন্তু তোকে ছেড়ে উনি যেতে চাইবেন বলে ত' মনে হচ্ছে না আমার।"

"না, তা সহজে হবে না। এই আর এক জ্বালা। আমাকেও থাকতে হবে ওর সঙ্গে! থেকে দগ্ধে মরতে হবে। আমি না গেলে ও কিছুতেই যাবে না সেখানে। ঐ ভাবে তিলে তিলে আমার চোখের সামনে শুকিয়ে মরবে।"

মুখে এল—মরুক। ওই আপদ ম'লেই পাপ চুকে যায়। কিন্তু মুখে এলেই বলা চলে না সব কিছু। বললাম—"আচ্ছা এখন চল ত' তাঁর কাছে। দেখি না, তিনি কি বলেন।"

উঠলাম দু'জনে বালি ঝেড়ে। সমুদ্র সমানে গোমরাতে লাগল।

তিন দিন তিন রাত কেটে গেল সমুদ্রের কান্না শুনে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে গেলাম দেবতা দর্শন করতে। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে দেবতা

দর্শনের আগে এমন এক কুৎসিত কাণ্ডের দর্শন ঘটল যে আর ও-মুখো হবার এতটুকু স্পৃহা রইল না চিত্তে। মন্দিরে ঢুকে দেখলাম, দেবতার সামনে খালি গা, গলায় পৈতে ঝোলান দশ বার জন মানুষ ধস্তাধস্তি করছে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে তারা মিশে গেল ভিড়ের সঙ্গে। তাদের মাঝখান থেকে ছাড়া পেয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে চাইতে লাগলেন চারিদিকে। সামনেই পুলিশ রয়েছে, পুলিশের এক ইনস্পেক্টার একটু তফাতে বসে আছেন টেবিল পেতে। ভদ্রলোক সেই টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে, তাঁর হাতের আঙটি দু'টো কেড়ে নিয়ে গেল পাণ্ডারা। কোন পাণ্ডা তাকে পাকড়াও করবে, এই নিয়ে পাণ্ডাদের মধ্যেই আপসে ঝগড়া লেগে যায়। ফলে যাত্রীর হাত পা ঘাড় চুল ধ'রে টানাটানি জুড়ে দেয় তারা। সেই হুড়োহুড়ির সুযোগে তাঁর আঙটি দু'টো ছিনিয়ে নিয়েছে কে।

প্রচুর পান দোক্তা মুখে থাকার দরুণ পুলিশ পুঙ্গব কথা বলতে পারলেন না। ইশারায় হুকুম দিলেন, ভদ্রলোককে মন্দির থেকে বার করে দেবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে হুকুম তামিল করা হল। ঠুঁটো দেবতা ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইলেন। চারিদিক থেকে গলায় পৈতে-ওয়ালারা ফূর্তিতে অট্টহাস্য করে উঠল। আমিও বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে চুপচাপ। দেবতা দর্শন আমার কপালে ঘটল না।

দেবতার মহিমা দেবতারাই বুঝতে পারেন না, ত' আমি কোন ছার। পুরীতে আছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু আর আছে সমুদ্র। প্রভু আমায় খেদালেন তাঁর মহিমা দেখিয়ে, সমুদ্র আমায় তিষ্ঠতে দিলে না অবিরাম তার কান্না শুনিয়ে। যে দু'জন মানুষের কাছে গেছি, তারা এমন শোচনীয় অবস্থায় দিন রাত কাটাতে লাগল যে ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকবার প্রবৃত্তি হল না।

শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী অসহ্য রকমের সুন্দরী হয়ে উঠেছেন। একেই তাঁর গড়ন লম্বা, শরীর পাতলা, মুখখানি রোগা ধরণের। তার ওপর তিনি বার-ব্রত-উপবাস আরম্ভ করে দিয়েছেন। সদা সর্বদা একটা রুক্ষ অনাসক্তির পলস্তরা দিয়ে সযত্নে ঢেকে রেখেছেন নিজেকে। খুব

সরু-পাড় ধুতি পরছেন, চুলে তেল দিচ্ছেন না, চুল বাঁধছেনও না। গহনা-পত্র সব খুলে ফেলেছেন। সহজে কথা বলেন না কারও সঙ্গে, হোটেল থেকে বেরোন না এক পা। সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। যেন ঘুমিয়েই আছেন সদা সর্বদা।

কয়েকটা দিন আগে, যেদিন শিউড়ি থেকে টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছল বহরমপুরে, সেদিন জেগে উঠেছিলেন ইনি। জেগে উঠেছিলেন বললে ভুল হবে, বলা উচিত দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, পিঠে বেণী দুলিয়ে, বেগুনী রঙের জ্বলন্ত বেনারসী পরে হুকুমের পর হুকুম দিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন সকলকে। যে ভাবে হোক, প্রজাদের ওপর প্রতিশোধ নেবার হুকুম দিয়েছিলেন কর্মচারীদের। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে মোটা চাঁদা দিয়েছিলেন প্রজা শায়েস্তা করার মূল্য স্বরূপ। তারপর হাসপাতালে গিয়ে স্বামীকে তুলে আনার সময় সেই চটুল রহস্যময় কথাবার্তা, স্বামীকে নিয়ে পুরীর গাড়ীতে ওঠার সময় চোখ-মুখের দীপ্তি, সবই মনে পড়ে গেল। এই ক'দিনের মধ্যে এমন কি ঘটল যার ফলে এ হেন অবস্থা হল ওঁর! যেন নিভে জুড়িয়ে একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।

আমাকে দেখেও বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা ঔৎসুক্য দেখালেন না। এমন কি বিছানা ছেড়ে নেমেও এলেন না। শান্ত নির্জীব কণ্ঠে বললেন—"এই যে, আসুন।" তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

অনেকক্ষণ বসে রইলাম তাঁর খাটের পাশে। শেষে উঠে গেলাম ঘর ছেড়ে। বন্ধু শচীনেরও প্রায় ঐ অবস্থা। তবে সে ঠায় শুয়ে থাকছে না বিছানায়। দিন রাতের অনেকটা সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে জলের ধারে বসে থাকছে। কথা কওয়া বন্ধ করেছে প্রায়, এমন কি স্ত্রীকে আমার সঙ্গে বহরমপুরে পাঠাবার কথাটাও আর তুললে না।

এ অবস্থায় মানুষ টি'কতে পারে কতক্ষণ। তিন রাত পার হবার পর ঠিক করলাম ওদের কাছ থেকে বিদায় নেব। কিন্তু কথাটা কি ভাবে তোলা যায় ভেবে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুই কৃপা করলেন।

দুপুর বেলা শচীন বললে—"তাহলে আজ বিকেলের গাড়ীতে তোরা

যা কলকাতায়। ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাবে ব্রজমাধব। সে যখন লিখেছে, তখন তার ওখানে একবার যাওয়া উচিত।"

মনে পড়ে গেল, খামে বন্ধ একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়েছিলেন ব্রজমাধব। এসে সর্বপ্রথম সে চিঠিখানি আমি শচীনকে দিই। শচীন তখন খোলে নি চিঠিখানা, পকেটে পুরে রেখেছিল। হঠাৎ চিঠির কথা উঠতে খেয়াল হল কি বলেছিলেন ব্রজমাধব শচীনের টেলিগ্রাম দেখে। বেশ উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন—"হ্যাঁ নিয়ে এস এখানে রাণী বৌকে, এখানে আসলেই তিনি ভাল হয়ে উঠবেন।"

ব্রজমাধবের আগ্রহের কথাটা বললাম শচীনকে।

বললাম—"এখন কিছু দিন কলকাতায় থাকলেও হয়ত উপকার হবে শুকতারার। ওঁরা যখন আগ্রহ দেখাচ্ছেন ওঁদের কাছে নিয়ে যাবার—"

"আঃ, থাম্ থাম্। সে আর একটা শয়তানির আড্ডা"—চিৎকার করে উঠল শচীন। প্রায় মিনিট দুই চুপ করে থেকে একটু সামলে নিলে নিজেকে, নিয়ে নিদারুণ ঘৃণায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—"এই বৌটি আর ঐ জামাইটি, আমার বাবা এই দুইটি জীবন্ত পাপকে আমাদের দুই ভাই-বোনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। এরা দু'জন এক সঙ্গে মিললে এমন নরকাগ্নি জ্বলে ওঠে—" কথার মাঝখানে ঝপ করে থেমে গেল। যেন জোর করে তার মুখ চেপে ধরলে কে। দু'হাতে নিজে দু'মুঠো চুল ধরে প্রাণ পণে টানাটানি করতে লাগল। চুপ করে বসে রইলাম তার সামনে। কি যে বলা যায় ভেবে পেলাম না।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে মুখোমুখি বসে রইলাম দু'জনে। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল শুকতারা, উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে বললে—"চৌধুরীর ওপর গুলি চলেছে।"

আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—"কে বলেছে ?"

"একজন পুলিশ অফিসার এই কাগজখানা দিয়ে গেল এই মাত্র। কলকাতা থেকে এখানকার পুলিশ অফিসে জানিয়েছে, তাড়াতাড়ি যাতে আমরা খবরটা পাই সেই ব্যবস্থা করতে বলেছে। চৌধুরী আমাকে যেতে বলেছে। তার হুঁশ আছে এখনও, নয়ত এত কাণ্ড করলে কি করে !"

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা তিন জন। বেশ কিছুক্ষণ পরে শচীন ডান হাতটা মুটো করে টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলল—"তারা ওকে ছাড়বে না, নেবেই একদিন—এ আমি জানি। যতই সাবধান থাকুক ও, একশ-টা লোক দিনরাত ওকে পাহারা দিলেও ও রেহাই পাবে না, এ কথা আমি ওকে বহু বার বলেছি।"

শুকতারা নয়, শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী প্রশ্ন করলেন—"কারা তারা ?"

যে সুরে সেদিন শিউড়িতে ওঁর হরিহর গোমস্তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সেই সুর বেরল হঠাৎ গলা দিয়ে। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি আবার জ্বলে উঠেছে সেই আগুন, জেগে উঠেছেন তিনি, ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ দু'টো ছোট করে চেয়ে আছেন শচীনের মুখের দিকে।

শচীন জবাব দিলে—"যারা দেশ স্বাধীন করবার জন্যে বুকের রক্ত ঢালছে।"

শুক্তিসুন্দরী দেবী যেন শুনতেও পেলেন না জবাবটা। বললেন—"আমি যাব, একটু পরেই গাড়ী আছে।"

এতটুকু উত্তেজিত না হয়েই শচীন বললে—"হ্যাঁ, সেই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ আমাদের। আজ বিকেলের গাড়ীতেই তোমরা যাবে।"

"তার মানে! তুমি যাবে না ?"

"না, আমার সেখানে কোনও কাজ নেই।"—নির্লিপ্ত কণ্ঠে কথা ক'টি বলে শচীন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়ী ছাড়ল।

গাড়ীতে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাশে জায়গা পাওয়া গেল না। শুয়ে আসবার জন্যে অনেক আগেই বড়-লোকেরা বার্থ রিজার্ভ করে রেখেছেন। হোটেলের ম্যানেজার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। এক শেঠজী তাঁর পত্নীকে নিয়ে ফিরছিলেন একখানা ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করে। তাঁদের বয়স হয়েছে। শেঠজীর সঙ্গে শচীনের পরিচয় হয়েছিল হোটেলে। বড় জমিদার শুনে তাঁরা খাতির করা সুরু করেছিলেন। হোটেলের ম্যানেজার যখন শেঠজীকে জানালেন যে জমিদার-পত্নীকে গাড়ীতে স্থান

দিলে ভয়ানক উপকার করা হয়, কারণ জমিদারের ভগ্নীপতি, কলকাতার মস্ত এক পুলিশ অফিসার খুবই অসুস্থ, তখন শেঠজী গলে গেলেন একেবারে। শেঠ-পত্নীর সঙ্গে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী এক বেঞ্চিতে বসলেন। থার্ড ক্লাশে উঠলাম আমি ইন্টার ক্লাশের টিকিট নিয়ে। যথারীতি মাঝের ক্লাশে মাঝামাঝি শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা মারমুখো হয়ে চলেছেন বাক্স-পেঁটরা, ছেলে-মেয়ে-বউ সবাইকে শুইয়ে নিয়ে।

ষ্টেশনে শচীন এসেছিল আমাদের তুলে দিতে। স্ত্রীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানালার ধারে। ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ী পর্যন্ত দেখে এলাম আমি, কোথাও একটু ঠাঁই মেলে কি না। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালাম ওর পাশে। কোথাও তিল ধরণের জায়গা নেই, গাড়ী ছাড়লে যে কোন দরজায় লাফিয়ে উঠলেই হবে।

সময় হল। গার্ড সাহেব সবুজ ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরলেন। শচীন তখন খুব শান্ত গলায় বললে—"সাবধানে থেক তোমরা, কিছুতে জড়িয়ে পড়ো না যেন। আমরা কোনও পক্ষের শত্রু হয়ে না উঠি।"

গাড়ী চলতে সুরু করল। আমায় বললে শচীন—"যা, এবার তুই উঠে পড় কোথাও।"

সামনের দিকে দৌড়লাম। উঠে পড়লাম একটা হাতল ধরে। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম তখনও শচীন হাঁটছে গাড়ীর সঙ্গে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম জানালা থেকে একখানি হাত বেরিয়ে আছে আর সেই হাতখানি ধরে হাঁটছে শচীন। দরজা ঠেলে কোনও রকমে আমি ভেতরে উঠে পড়লাম!

সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হল। গাড়ীর ভেতর দাঁড়িয়ে থাকার স্থানটুকু মিলল, এজন্যে নিজের কপালকে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। দরজার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যারা চলল তাদের অবস্থা দেখে নিজের বরাতটিকে নেহাত খেলো ভাবতে সাহস হল না। ইচ্ছে ছিল, দু'একবার নেমে দেখে আসব বন্ধুপত্নীকে, মানে আমার মনিব ঠাকরুণকে। ইচ্ছেটা মনের মধ্যে চেপে রাখতে হল। নামতে হয়ত পারব, কিন্তু আবার গাড়ীর ভেতর উঠে আসতে পারব কি না এই দুশ্চিন্তায় দরজার বাইরে মাথা গলাতে সাহস হল না।

হাওড়ায় ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় প্রথম মুখ খুললেন আমার মনিব ঠাকরুণ। বললেন—"ভেতরে এসে বসুন।"

যথা আজ্ঞা, ভেতরেই উঠে বসলাম। পুল পেরিয়ে গাড়ী যখন এ পারে উঠছে তখন বললেন—"চৌধুরী কোথায় আছে এখন তাই বা কে জানে, হয়ত হাসপাতালেই আছে।"

উত্তর দেবার কিছুই নেই। আমারও ঐ চিন্তা—ব্রজমাধবকে কি অবস্থায় দেখব গিয়ে! গুলিটা শরীরের কোনখানে লেগেছে! মুখ, মাথা, বুক, পেট বাদ দিয়ে হাতে পায়ে যদি কোথাও লেগে থাকে, তাহলেই রক্ষে। হাতটা পা-টা কেটে বাদ দিলেও মানুষ বাঁচে। নয়ত—

"ভালই আছে, কি বলুন? নয়ত খবর পাঠাল কি করে?"

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম আমার দিকে চেয়ে আছেন তিনি উত্তরের জন্যে। এ রকম প্রশ্ন লোকে করে, 'তা ত' বটেই' গোছের জবাব শোনার আশায়। সেই রকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম আমি, বলতে হল না।

নিজের কথার জবাব নিজেই তিনি দিলেন—"অত সহজে চৌধুরীকে ঘায়েল করতে পারবে না কেউ। পারুক না পারুক, ও চাকরি আর করতে হবে না ওকে। প্রাণ হাতে নিয়ে চাকরি করা! চুলোয় যাক চাকরি, এবার আমি ওদের জোর করে নিয়ে যাব কলকাতা থেকে।"

শুনে ভয়ানক হাসি পেয়ে গেল আমার। ব্রজমাধব চৌধুরীকে কেউ জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে চলেছে, এই অসম্ভব ব্যাপারটা কল্পনা করতেই হাসি পেয়ে গেল। তার চেয়ে এ কথা কল্পনা করা ঢের সহজ যে, ব্রজমাধব ডকে গিয়ে টিণ্ডেলের কাজ নিয়েছেন, আর 'আড়িয়া হাবিস' করে মাল ওঠাচ্ছেন, মাল নামাচ্ছেন।

হঠাৎ থামল গাড়ী। একজন সার্জেণ্ট এসে ড্রাইভারকে কি বললে। ড্রাইভার পিছন ফিরে আমাকে বললে—"এ রাস্তায় গাড়ী ঢুকতে দেবে না।"

"কেন?"

সার্জেণ্ট জানালায় মুখ দিয়ে বললে—"এ রাস্তায় এখন ট্রাফিক বন্ধ আছে।"—বলতে বলতে তার নজর পড়ল আমার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে

গলার সুর পালটে গেল—"আই থিংক, আপনারা মিঃ চৌধুরীর ওখানে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"একটু অপেক্ষা করুন, ব্যবস্থা করছি।"—বলে চলে গেল সার্জেন্ট।

মিনিট তিনেক পরে একজন বাঙালী অফিসার এসে বললেন—"নামুন ট্যাক্সি থেকে একটু কষ্ট করে আপনারা। এই গাড়ীতে যান।

নামলাম। নেমে পেছনের পুলিশের গাড়ীতে উঠে বসলাম। দু'-মিনিটের মধ্যে চৌধুরীর সেই আস্তানার সামনে গাড়ী থামল এবং যে ব্যক্তিটিকে প্রথম দেখলাম গাড়ীর পাশে তিনি অন্য কেউ না, স্বয়ং ব্রজমাধব চৌধুরী। ডান হাতখানায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—গলার সঙ্গে ঝুলছে। বাঁ হাতে গাড়ীর দরজা খুলে মহোল্লাসে বলতে লাগলেন—"আসুন, আসুন, রাণীজী আসুন। তা রাজা কই ? তিনি আসেন নি বুঝি, তা বেশ হয়েছে। তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই, স্বয়ং রাণীজী যখন এসে পড়েছেন। আসুন, গরীবের আস্তানা ধন্য হোক।"

নামতে নামতে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী বললেন—"স্বভাব কিছুতে বদলাবে না, তবে যে শুনে এলাম গুলি খেয়েছ ?"

"আজ্ঞে হাঁ, তা খেয়েছি। মানে এই ডান হাতখানা খেয়েছে গুলি, আমি খাই নি। তা ওতে কিছু যাবে-আসবে না। আপনার ননদ এ অধমকে একটি হাত খোয়া গেলেও চাকরিতে বহাল রেখেছেন। এখনও তাড়ান নি।"

"তাড়ানো একান্ত উচিত ছিল।"—বললেন শুকতারা দেবী।

ফুটপাত পার হয়ে উঠলাম আমরা বাড়ীর মধ্যে। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তেতলায় উঠলাম। তেতলার দরজা খোলা রয়েছে। নেলী দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। থপথপ করে তিন চারটে ধাপ নেমে এসে জড়িয়ে ধরলে তার বৌদিকে। তারপর ওদের পিছু পিছু আমি আর ব্রজমাধব গিয়ে ঢুকলাম দরজার ভেতর। দরজা বন্ধ হল।

ব্রজমাধব চৌধুরীর ডান হাতখানা কেটে ফেলতে হয় নি। হবেও না কোনও কালে। আততায়ী গুলি ছোঁড়বার সুযোগ পায় নি। তার

আগেই ব্রজমাধব লাফিয়ে পড়েছিলেন তার ঘাড়ে। সেই ধস্তাধস্তির সময় একটা গুলি বেরিয়ে ব্রজমাধবের ডান হাতের কব্জির ওপর থেকে এক খাবলা মাংস নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘা শুকোবার জন্যে ও ভাবে হাতটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গলার সঙ্গে।

মাংস উড়ে যেতেও ব্রজমাধব কাবু হন নি। খুনেটাকে কাবু করে ধরে এনেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার মুখ থেকে এমন সব মূল্যবান তথ্য বার করে ফেলেছেন যে এবার গুষ্টিসুদ্ধ সবাইকে জাহান্নামে পাঠিয়ে তবে ছাড়বেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল গোমেশের সংবাদ জানতে পেরেছেন ব্রজমাধব। আমার দিকে ফিরে বাঁ হাতের তর্জনীটি উঁচিয়ে বললেন—"আর এই একজন সাধু পুরুষ, অর্ধেক কথা পেটে রেখে বাকীটা ওগরাবে। জাহাজ থেকে গোমেশকে কোথায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কারা তাকে তুলে নিয়ে যায়, কোথায় নিয়ে গিয়ে তাকে রাখে, এ সমস্ত কিছু জান না তুমি? তোমার সেই পেগ সাহেবেরা বার করবে গোমেশকে? বার্ড কোম্পানীর সেই মাতালটা খুঁজে পাবে তোমার বন্ধুকে? খামকা লাগিয়ে দিয়েছ খুনোখুনি, বার্ড কোম্পানীর কুলিরা আর ট্যাঁস ফিরিঙ্গীরা এক জোট হয়ে ডকের পুলিশগুলোকে ধরে ঠেঙাচ্ছে।"

বললাম—"ঠেঙানোই উচিত। কেন তারা গোমেশকে তুলে দিয়ে আসে জাহাজের সেই নরপিশাচদের হাতে?"

মহাস্ফূর্তিতে ব্রজমাধব বললেন—"তা এক রকম উচিত ফলই পাচ্ছে ওরা। হ্যারিস এখন মাথা খুঁড়ে মরুক। হয়ত এ জন্যে পোর্টে লেবার ষ্ট্রাইকও হয়ে যেতে পারে। গোমেশকে হাতে পেলে আমিও ওদের সহজে ছাড়ব না। কিন্তু আর এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছ তোমরা সেলার চারটেকে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে। ওই দুষ্কর্মটি কারা করলে, তাদের খুঁজে বার করবার জন্যে ওপর থেকে আসছে ভীষণ চাপ। সেলার ক'টা ছিল জার্মান। তাদের গভর্নমেণ্ট সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তাদের সঙ্গে কোকেন ছিল, কিন্তু তারা কোকেনের চোরা কারবার করছিল, এ অজুহাত ধোপে টেঁকবে না। কারণ দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে, ওই জাতটার

হাজার দোষ থাকলেও ওরা ওসব ছ্যাঁচড়া কারবার করে না। এ দেশের বন্দরে বিদেশী জাহাজ এলে তার নাবিকরা যদি এসিডে পোড়ে তাহলে কোন দেশই যে জাহাজ পাঠাতে চাইবে না এখানে। তাই আমাদের গভর্নমেণ্ট উঠে পড়ে লেগেছে, যারা সেলার পুড়িয়েছে তাদের খুঁজে বার করার জন্যে। জটটা এমন ভাবে পাকিয়ে উঠেছে যে, পোর্ট পুলিশ, সি. আই. ডি., আবগারি পুলিশ সকলের টনক নড়ে উঠেছে। মাঝখান থেকে আমি খুঁজে পেয়েছি আসল মালদের। এবার রাঘব বোয়াল থেকে চুনো-পুঁটি পর্যন্ত ছেঁকে তুলব। এখন সেই ছুঁড়িকে একবার হাতে পেলে হয়।”

এই পর্যন্ত বলে তাঁর শ্যালক-জায়ার দিকে ফিরে বললেন—“এবার দেবী, আপনার তুষ্টির জন্যে এমন এক চিজ দিচ্ছি, যাকে খেলিয়ে মজা পাবেন, আপনার হাতে পড়লে ক’দিনে সে সিধে হয়—তা আমায় দেখতে হবে। কি বিচ্ছু মেয়ে মানুষ রে বাবা! তিনটি বছর আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে বেড়াচ্ছে। একশ’টা নামই আছে তার, একশ’ রকম রূপ ধরতে জানে। হোটেলের ঝি, খোলার বাড়ীর বেশ্যা, নার্স, স্কুলমাষ্টারণী, সধবা, বিধবা, উড়ে, মেড়ো, মুসলমান—যখন যেটা সুবিধে হয়। যতদূর খবর পেয়েছি, নিজে হাতে গুলি করে মেরেছে অনেককে। এম-এ পাশ করেছে। মস্ত বড় দল নিয়ে খিদিরপুরের বেশ্যা পাড়ায় বসে বন্দুক রিভলভারের কারবার ফেঁদে ছিল। ওর হাত দিয়ে কত যে অস্ত্রশস্ত্র ঢুকেছে এই দেশে কে তার হিসেব রাখে। এঁর স্বামী মহারাজ এমন একজন লোক যাঁকে অর্ধেক পৃথিবীর লোক খুঁজছে। যারা তাঁকে আগে হাতে পাবে, তারা তৎক্ষণাৎ তাঁর শ্রীঅঙ্গটি ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়ে প্রাণ খুলে স্ফূর্তি করবে। সে মহাপুরুষ এখন এদেশে।বরাজ কচ্ছেন কিনা, তা জানতে পারব শ্রীমতীকে হাতে পেলে। শ্রীমতীর মুখ থেকে সব কথা বার করা তোমার কাজ, দেবী। তাকে শায়েস্তা করতে একমাত্র তুমিই পারবে। ভায়া ত’ তাকে দু’চারবার দেখেছ। নিশ্চয়ই চিনতে পারবে তুমি।”

ব্রজমাধব উঠে গেলেন। আলমারী খুলে বার করে আনলেন একখানা এলবাম। এলবাম থেকে একটা ফোটো খুলে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। একবার চেয়েই কাঠ হয়ে গেলাম আমি। ফোটোতে আছে একটি হাসি।

এমন হাসি তুনিয়ার কেউ হাসতে পারে না। হাসছে একটি গেরস্ত ঘরের বউ। সারা গায়ে গহনা, পরনে দামী বেনারসী, মাথায় ঘোমটা দেওয়া, বউটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। ভয়ানক একটা কিছু মজার ব্যাপার ঘটেছে নিশ্চয়ই তার চোখের সামনে। তাই সে হাসছে। হাসবার আগে নিশ্চয়ই একবার বিচিত্র সুরে বলে উঠেছিল—ছি ছি ছি ছি ছি। চোখ তু'টিতে সেই সুরের রেশ থরথর করে কাঁপছে।

বললাম—"হাঁ, চিনি এঁকে।"

ব্রজমাধব বুড়ো আঙ্গুল উচিয়ে বললেন—"চেন তুমি কচু। মাত্র দিন চার পাঁচ হয়ত দেখেছ তুমি, তাতেই চিনে ফেলবে? আচ্ছা বলত, কি জান তুমি এঁর সম্বন্ধে?"

বললাম—"জানি যে এঁরা ভয়ঙ্কর লোক। আফিম কোকেনের ব্যাপার নিয়ে থাকেন।"

হো হো করে হেসে উঠলেন ব্রজমাধব। বললেন—"ঢ্যাঁড়শ বেগুন কুমড়ো মূলো এই সব জিনিষের কারবার করেন না? শোন বন্ধু, শোন, এমন সব জিনিষের কারবার করেন এঁরা, যে ভাইস্‌রয় সাহেব থেকে সুরু করে পুলিশ সাহেব পর্যন্ত সবাইয়ের চোখের ঘুম ঘুচে যাবার যোগাড় হয়েছে। বছরে আধ ডজন হিসেবে কমিশনার সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লোপাট হয়ে যাচ্ছে দেশ থেকে এঁর ঐ হাসির গুণে। বাংলা দেশের হাকিম হবার জন্যে বিলেতে সাহেব মিলছে না। তু' কোটি গাঁট বিলিতী কাপড় পোড়ালে বা তু' কোটি টন নুন জ্বাল দিলেও ইংরেজের এক গাছি গোঁফ পাকত না, কিন্তু বাংলা দেশের এই বৌটি আর এঁর স্বামীর জ্বালায় ইংরেজের মুখে শুয়োরের মাংস রুচছে না। এ দেশের লেখাপড়া জানা প্রতিটি ছেলেমেয়ে একটি বার এঁদের চোখে দেখবার জন্যে পাগল। অতি-বড় ভীরুর হাতে রিভলভার তুলে দিয়ে ইনি যখন হুকুম করেন—যাও অমুককে খুন করে এস—তখন সে দ্বিরুক্তি না করে ছুটে যায় রিভলভার চালাতে। মারা আর মরা' এই তু'টো অতি তুচ্ছ ব্যাপার লুকিয়ে আছে ঐ হাসিতে। মানুষের জীবনের এতটুকু মূল্য নেই এঁর কাছে, মরণেরও

নেই। তাই উনি একটা আহাম্মক আগাছাকে পাঠিয়েছিলেন আমার জন্যে। আমার ইস্তক-বিস্তি-কাবার করবার জন্যে উনি ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। ও কাজটা অনেকে অনেকবার করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুঃখ হল, উনি আমায় নেহাতই অবজ্ঞা করেন। মনে করেন, আমি একটা মানুষই নই। তাই একটা ভনভনে মাছি পাঠালেন আমায় মারবার জন্যে। 'ছিঃ'—"

'ছিঃ'—এই ছোট্ট শব্দটুকু দিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন ব্রজমাধব। রাগ দুঃখ অভিমান এমন কি অনেকটা সম্ভ্রমও বটে। এতক্ষণ একভাবে চেয়ে ছিলেন শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী ব্রজমাধবের মুখের দিকে। হঠাৎ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—"দেখি ফোটোখানা।"

ফোটোখানা দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ফোটোখানার ওপর। দেখতে দেখতে তাঁর মুখের চেহারা পালটাতে লাগল। চোখ দু'টো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। ঠোঁট দু'খানাও যেন কি রকম ছুঁচলো হয়ে উঠল। ঘাম দেখা দিল কপালে, নাকে, ঠোঁটের ওপর। একটু একটু কাঁপতে লাগল হাত দু'টো। নাকের ফোঁড় দু'টো একটু ফুলে উঠল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। ফিস ফিস করে বললেন তিনি ফোটো থেকে চোখ না তুলেই—"কবে এঁকে পাচ্ছি আমি?"

রস উথলে উঠল ব্রজমাধবের গলায়—"আহা হা, একেবারে জরজর হয়ে উঠলেন যে এঁর বিরহে। পাবেন, দু' একদিনের মধ্যেই পাবেন। জ্যান্ত হোক, মরা হোক এঁর ঐ তনুখানি আমার হাতে আসবেই এবার। আর আমি তৎক্ষণাৎ সেখানি আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করে ধন্য হব। বলে দিয়েছি যে, ধরতে পারলে এখানে আনার দরকারই নেই, বহরমপুর জেলে আটকে রাখতে হবে। তারপর আপনি গিয়ে তাঁর ভার নেবেন। আপনার সেই লীলা-কুঞ্জে তাঁকে তুলে দিয়ে আসা হবে। য' রাত্রি খুশী রাখবেন। কাকে-বকে টের পাবে না, কোথায় তাঁকে সরিয়ে ফেলেছি! তারপর আমি দেখে নেব, কত বুদ্ধি আছে ওঁর পেটে। ওঁর ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই আমায় মারতে চেয়েছিলেন বলে, কিন্তু যারা উপযুক্ত নয়, যারা নেহাতই বাংলা দেশের আদুরে গোপাল, তাদের উনি কেন

লাগান এই আগুন খেলায়। কেন অনর্থক খামখেয়ালী করেন এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে। ওঁকে—আমি—ব্রজমাধব চৌধুরী এইটুকু বুঝিয়ে দিতে চাই যে, ও পথে নামাটা স্ত্রীলোকের উচিত হয় নি। নেমেছেন বেশ করেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত হালকা করে দেখছেন কেন উনি? যাকে তাকে ধরে কেন লাগাচ্ছেন এ কাজে। ওঁকে বোঝাব যে আমি ব্রজমাধব চৌধুরী ওঁর চেয়ে দেশ স্বাধীন করার কাজ ভাল করে করছি। আগাছা পরগাছা যা কিছু পাচ্ছি হাতের কাছে সব উপড়ে নির্মূল করে দিয়ে যাচ্ছি। আমার হাতের ভেতর দিয়ে গলে যারা যাচ্ছে তারা এমন ভাবে তৈরী হয়ে যাচ্ছে যে ভাঙবে ত' মচকাবে না কিছুতে। যদি কোনও দিন এ দেশের স্বাধীনতা আসে ত' আসবে শুধু তাদেরই জন্যে যারা ব্রজমাধবের কামার-শালার ভেতর দিয়ে আগুনে পুড়ে পার হয়ে যাচ্ছে।"

নেলী এতক্ষণ ও পাশ ফিরে শুয়ে কোলের বাচ্চাটাকে বোধ হয় দুধ দিচ্ছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে বলে বসল—"যদি তাকে সত্যিই পাও বৌদি তাহলে আমাকে একবার দেখিও। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব, বার করে দেব দেশ উদ্ধার করা, ওঁকে মারবার জন্যে মানুষ পাঠানো—দাঁড়া"—হাঁপাতে লাগল নেলী।

তার দিকে চেয়ে ব্রজমাধব আর শুক্তিসুন্দরী দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠলেন।

ছটফট করে কাটালাম রাতটা। সেই প্রথম একলা একটা ঘরে রাত কাটাতে পেলাম ব্রজমাধবের বাড়ীতে। ও ঘরে নেলীর সঙ্গে শুলেন নেলীর বৌদি, ব্রজমাধব তাঁর খাটের ওপর জেগে বসে রইলেন উপনিষদ্ খুলে। আমি ছুটি চাইলাম। বললাম—"গাড়ীতে দাঁড়িয়ে এসেছি সারা রাত। পাশের ঘরে একটু শুই গিয়ে। না ঘুমলে এবার জ্বর আসবে।"

বই থেকে মুখ না তুলে ব্রজমাধব বললেন—"বেশ ত'।"

অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ালাম সারা রাত। ছাতের ওপর খট্‌খট্‌ মস্‌মস্‌ শব্দে দু'জন পাহারাদার হাঁটতে লাগল। পাশের ঘরে ব্রজমাধবের গলা শুনতে পেলাম মাঝে মাঝে। শুনলাম, তিনি সুর করে পড়ছেন —

"সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্মাণি।"

আর একবার শুনতে পেলাম তিনি টেলিফোনে কথা বললেন। কি বললেন শুনতে পেলাম না, তবে মনে হল বিষম ধমকা-ধমকি করলেন কাকে। তারপর ও ঘরের সকলে জেগে উঠল। নেলী পেড়াপীড়ি করতে লাগল তার বৌদিকে, একখানি গান গাইবার জন্যে। জানতাম না যে শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী গান জানেন। শুধু জানেন না, এমন জানা জানেন যে কান পেতে শুনতে হয়। তিনি গাইতে লাগলেন—

"পিয়া বিনা গুজরা গেই রয়না রয়না।
আজু হাঁ নেহি আওয়ে বার সখিমে তড় পত হঁ ঘেড়ি, ঘেড়ি পলছন।"

আমি সঙ্কল্প করলাম। একটু আগে ব্রজমাধব শোনালেন—
"সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্।"

সঙ্কল্প মনের চেয়ে বড়। মনকে আমল না দিয়ে সঙ্কল্প করে ফেললাম আমি। রাত ভোর হলেই পালাব। যে ভাবে হোক, যে করে হোক ছুরি বৌদিকে বাঁচাতে হবে। তাতে যদি মরতে হয় সো ভি আচ্ছা।

কি করা কর্তব্য আর কি করা কর্তব্য নয়, এইটুকু বেছে নেওয়ার নাম সঙ্কল্প করা। সঙ্কল্প করা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয় কিন্তু সেই সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করা অন্য ব্যাপার। ব্রজমাধবের চোখে ধুলো দিয়ে তিন-তলা, দোতলা, একতলার তিনটে গাঁট পার হয়ে রাস্তায় নামতে হবে। কোনও রকমে যদি তা সম্ভব হয়ও, কিন্তু পালিয়েছি, টের পাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজমাধব তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের ছোটাবেন পেছনে। আমাকে ফিরিয়ে আনতে ওঁর অতি অল্প সময়ই লাগবে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ওদের দলে ছিলাম আমি, ছবি বৌদিকে দেখেছি, পুঁটুরে গেছি, ইত্যাদি সব জেনেও ব্রজমাধব আমাকে এরেষ্ট করলেন না কেন! আরও কিছু ভেতরের কথা আমি লুকোচ্ছি কি না তা জানবারও ত' চেষ্টা করলেন না! আমি যে বোমা-পিস্তলওয়ালাদের দলের লোক নই, এ সম্বন্ধে উনি নিঃসন্দেহ হলেন কেমন করে? কি করে উনি জানলেন যে আমিই ওঁকে খুন করব না? এক ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে উনি রাত কাটাচ্ছেন কোন সাহসে?

দুম দুম করে দরজায় ঘা পড়ল। বাইরে থেকে ব্রজমাধব বললেন—"খোল ভায়া, দরজাটা খোল এবার। সারাটা রাত ত' অবিরাম হেঁটে হেঁটে ঘুমলে।"

দরজা খুলতে হল। ঘরে ঢুকে ব্রজমাধব চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন আমার বিছানায়। বললেন—"আঃ—আমিই একটু শুয়ে নি। এখনও ত' ছোঁও নি তুমি বিছানাটা। একজন মানুষ না শুলে বিছানাটাই বা ভাববে কি। যাক্—কি ঠিক করলে?"

ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"কিসের কি ঠিক করলাম?"

"এই পালাবার সম্বন্ধে।"

"কি করে জানলেন যে আমি পালাবার কথা ভাবছি?"

"তার বেশী আর তুমি কি ভাবতে পার! শোন ব্রাদার, পালালেও এবার আমি তোমার পেছনে লোক ছোটাব না। শুধু মনে রেখ আমি তোমার শত্রু নই। কিন্তু অপর পক্ষ যদি তোমায় হাতে পায় ত' ছেড়ে দেবে না।"

"এ আপনার মিথ্যে ভয়, কি করেছি আমি তাদের?"

"তুমি আমায় তাদের সমস্ত সুড়ুক-সন্ধান দিয়েছ, তাই ত' তাদের আমি ধরে ধরে আনছি।"

"কখ্খনো নয়, একটি কথাও আমি বলি নি তাদের সম্বন্ধে।"

"কিন্তু তারা যে তাই মনে করে।"

"কে বলেছে আপনাকে?"

"কে বলেছে? দেখতে চাও? গায়ে দাও তোমার জামাটা, চল আমার সঙ্গে নীচে। দেখিয়ে দিচ্ছি।"

জামাটা গলিয়ে বললাম—"চলুন।"

সিঁড়ির দরজা পার হয়ে ব্রজমাধব বললেন—"একটা কথা বলে দিচ্ছি, টুঁ শব্দটি করতে পারবে না সেখানে। তুমি যে আছ সেখানে তাও জানাতে পারবে না। নিজের চোখে যা দেখবে, নিজের কানে যা শুনবে তাতে মাথা গরম করবে না। চুপচাপ ওপরে উঠে আসবে। কি?"

পেছন ফিরে আমার মুখের দিকে তাকালেন ব্রজমাধব। আমি শুধু ঘাড় নাড়লাম।

তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলা থেকে একতলায় নেমে গেলাম। দোতলা থেকে একতলায় নামলাম কিন্তু অন্য এক সিঁড়ি দিয়ে। দোতলার একখানা ঘরের মধ্যে একটা গর্ত। সেই গর্তের মুখ থেকে ঘোরান সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। বহুবার জুতোয় জুতোয় আওয়াজ হল, অনেক ডান হাত অনেক কপালে গিয়ে উঠল। অত ভোরে অতগুলি মানুষকে জেগে থাকতে দেখে সত্যিই বেশ আশ্চর্য হলাম।

ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে যে ঘরে আমরা নামলাম, সে ঘরের এক কোণে একখানা টেবিলের সামনে মস্ত-টাক মাথায় একজন ভদ্রলোক মাথা নীচু করে বসে কি লিখছিলেন। পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের মুখভাবের এতটুকু পরিবর্তন হল না। মোটেই আশ্চর্য হলেন না তিনি আমাদের দেখে। শুধু একটু হাসলেন।

"কি খবর সান্যাল?"—চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন ব্রজমাধব।

"সব ঠিক আছে স্যার।"—আরও চাপা গলায় ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

"কাগজ পত্র তৈরী?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"দাও আমায়। ভেতরে যাচ্ছি আমি।"

নিঃশব্দে খানকয়েক কাগজ ব্রজমাধবের হাতে তুলে দিলেন ভদ্রলোক।

"আমার এই বন্ধুটিকে ওয়াচ হোলে দাঁড় করিয়ে দাও। দরজা খুলতে বল।"

ভদ্রলোক একটা বোতাম টিপলেন। একজন প্রকাণ্ড পাঠান ঘরে

ঢুকে সেলাম ঠুকলে, ব্রজমাধব বেরিয়ে গেলেন তাকে নিয়ে। তখন ডান পাশের আলমারীটা খুলে ভদ্রলোক ইশারায় আমায় উঠতে বললেন আলমারীর মধ্যে। আলমারীর মধ্যে দাঁড়াতেই দেখা গেল ও পাশের ঘরের ভেতরটা। একটা মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেয়।

ভাল করে দেখে নিলাম ঘরের মধ্যে আর কি আছে। কিছু নেই, তিন দিকের তিনটে দেওয়াল দেখতে পেলাম। দেওয়ালের গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত নেই। সাদা ধপ্ ধপ্ করছে দেওয়ালগুলো, জানলা দরজার চিহ্ন মাত্র নেই। একটা জলের জায়গা বা একটা গেলাস—এরকমও কিছু দেখতে পেলাম না। অনাবৃত মেঝের ওপর মানুষটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। খুব জোরাল আলো জ্বলছে ঘরে। সেই আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল লোকটার সারা পিঠে লম্বা লম্বা কালো দাগ। প্রায় উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। এক চিলতে ন্যাকড়া মাত্র জড়ানো আছে তার কোমরে।

ওপাশের দেওয়ালে একটা ফাঁক হল। ব্রজমাধব ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। ডান হাতখানা গলা থেকে তিনি খুলে এসেছেন। কব্জির ওপর একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। ফাঁকটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বেমালুম মিলিয়ে গেল দেওয়ালের সঙ্গে।

ব্রজমাধব এসে দাঁড়ালেন লোকটির মাথার কাছে। গলায় প্রচুর পরিমাণ দরদ ঢেলে বললেন—"কি দাদা, ঘুমিয়েছেন নাকি? এবার উঠুন।"

অতি কষ্টে একটু একটু করে উঠে বসল লোকটি। বসে ঘাড় সোজা করে মুখখানা তুললে। তৎক্ষণাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। পিঠে চাপ পড়তে চমকে উঠে ফিরে তাকালাম। টাক মাথায় ভদ্রলোক ঠিক আমার পেছনে আলমারীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ডান হাতের তর্জনীটি দিয়ে নিজের দুই ঠোঁট চেপে ধরেছেন, বাঁ হাতখানা আমার গায়ের ওপর। ভদ্রলোকের দুই চোখ থেকে একটা ঠাণ্ডা আলো ঠিকরে পড়ছে। আবার ফিরে দাঁড়ালাম। ওঘরের লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ব্রজমাধবের মুখের দিকে। না—চিনতে আমার একটুও হল না তাকে।

নেপেনদা' বলতে লাগল মস্ত এক কাহিনী। ব্রজমাধব মিলিয়ে নিতে লাগলেন তাঁর হাতের কাগজের সঙ্গে। সব বলা শেষ করে নেপেনদা' বললে, কারা তাকে রিভলভার দিয়েছিল। তাদের নাম বলতে পারলে না নেপেনদা'। হুবহু বর্ণনা দিলে একটি নারীর আর একটি পুরুষের। দাঁতে দাঁত চেপে আমি শুনে গেলাম।

ব্রজমাধব জিজ্ঞাসা করলেন—"আমাকে আর কাকে খুন করতে বলেছিল তারা?"

নেপেনদা' আমার নাম করলে। হয় ব্রজমাধবকে নয় আমাকে।

ব্রজমাধব বললেন—"আমার ওপর তাদের রাগটা না হয় বুঝি আমি পুলিশের চাকরি করি। আমাকে একদিন মরতেও হবে তাদের হাতে। কিন্তু সে বেচারা কি দোষ করলে! নেহাত ভাল মানুষ ছোকরা, কারও অনিষ্ট করে না কখনও।"

অর্ধমৃত নেপেনদা'র মুখ থেকে আগুনের হলকা বেরতে লাগল আমিই নাকি যত নষ্টের মূল। আমার মত কাল-সাপকে খুন করে মরতে পারলেও নেপেনদা'র মরে সুখ হত। তারা আমায় কিছুতে বাঁচতে দে না। একজন দু'জন দশজন হয়ত মরবে, তবু তারা আমায় নিকে করবেই। দেশের এত বড় শত্রু আমি যে আমার রক্ত দেশের মাটি ওপর না পড়লে দেশ মাতৃকার দুরন্ত পিপাসার কিছুতে শান্তি হচ্ছে না ওপরে উঠে এলাম নেপেনদা'র কথাগুলো বুকের মধ্যে নিয়ে। ব্রজমাধ ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুই বললেন না আমায় নেপেনদা' সম্বন্ধে বললেন এমন কথা যা কল্পনাও করতে পারি নি!

"মনে আছে ভায়া গুরুদেব কি বলেছিলেন তোমায়?"

ঘাড় নাড়লাম।

"ব্যাস, গুরু মন্ত্র জপ করে যাও, ভয় কোর না, মনোবল অক্ষুন্ন থাকুক ওদের গুরুবল নেই, তাই ভয়ে যা-তা করে বসে। তোমার আমার (ভয় নেই, আমাদের গুরুবল আছে।"

ঘাড় হেঁট করে শুনলাম কথাগুলো। ব্রজমাধবের ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ হল।

আমায় আর পালাতে হল না। পালিয়ে রেহাই পেতে চেয়ে ছিলাম ব্রজমাধবের হাত থেকে, যে কোন উপায়ে হোক ছুরি বৌদির কাছে পৌঁছে বুক পেতে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাঁচাতে চেয়ে ছিলাম। অনেক কিছুই মনে মনে ভেঙে ছিলাম আর গড়ে ছিলাম। সব ভেস্তে গেল। পলায়ন পিছু পিছু তাড়া করে এসে আমায় পাকড়াও করলে।

সেইদিনই শ্রীমতী শুক্তিসুন্দরী দেবী ঠিক করলেন যে বহরমপুর ফিরে যাবেন। একটা কিছু একবার ঠিক করলে তা থেকে তাঁকে নড়ানো সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং বিকেলের গাড়ীতে চড়ে বসলাম আমরা শেয়ালদা' থেকে। নিশ্চয়ই উপযুক্ত পাহারার ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি ব্রজমাধব চৌধুরী। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না।

কৃষ্ণনগর পার হবার পর অন্ধকার মাঠের মধ্যে হঠাৎ থামল গাড়ী। গাড়ীর আলো নিভে গেল ঝপ করে। অন্ধকারে দেখতে পেলাম ছ'পাশের জানালা দিয়ে কয়েকজন লোক লাফিয়ে পড়ল গাড়ীর মধ্যে। মাত্র আমরা ছ'জন বসে ছিলাম গাড়ীতে। চক্ষের নিমেষে তারা শুকতারার মুখ বেঁধে ফেললে। বাধা দেবার সুযোগ পেলাম না আমি। উঠে দাঁড়াবার আগেই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম পিঠে। ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম এক কোণে। আর উঠতে হল না। পিঠের ওপর গুরুভার কি একটা চাপল সেই মুহূর্তে। আমার মুখটা চেপে ধরে রইল গাড়ীর মেঝের ওপর। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল। আর কিছুই টের পেলাম না।

॥ চার ॥

নিজের নিঃশ্বাস গুণে গুণে সময় মেপেছে কেউ কখনও!

শ্বাস-টানা আর শ্বাস-ফেলা, শ্বাস-ফেলা আর শ্বাস-টানা, এক দুই তিন চার, দশ বিশ পঞ্চাশ শ' হাজার লক্ষ কোটি। একটুও শক্ত নয় গোণা, শুধু গুণে যাওয়া, জীবন ভোর গুণে যাওয়া শুধু। শ্বাস-প্রশ্বাস টানা আর ফেলা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমানে চলে। খেতে খেতে, ঘুমতে ঘুমতে, কথা বলতে বলতে, পথ চলতে চলতে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, বসে, যখন যে কোনও অবস্থায় থাকি না কেন—শ্বাস-টানা আর শ্বাস-ফেলা কর্মটি চলছেই। রাজা আর রাজদ্রোহী, পণ্ডিত আর পাষণ্ড, বুজরুক আর বিরহী, সবাই সমানে করে চলেছে ঐ নেহাত অপ্রয়োজনীয় কাজটি একান্ত অবহেলায়, নিতান্ত অন্যমনস্ক হয়ে, দুর্দান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ যখন এই কাজটি থামার উপক্রম হয়—ঘনিয়ে আসে টানা-ফেলার চরম বিরতির পরম লগ্নটি—তখন হাহাকার করে উঠি। সারা জীবনে সজ্ঞানে গোটা কতক শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলবার অবকাশ পাই নি বলে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে। সজ্ঞানে কতটুকু সময় বেঁচে থেকেছি জীবনে, তার হিসেব খতাতে গিয়ে যখন দেখা যায় যে, লাভের ঘরে কয়েকটা মুহূর্তও থিতচ্ছে না, তখন হায় হায় করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই থাকে না। বড্ড দেরিতে, একেবারে শেষ মুহূর্তে এ জ্ঞানটা হয়, যখন হয় তখন শ্বাস-টানা আর শ্বাস-ফেলা কর্মটিও শেষ হয়ে যায়।

আমি কিন্তু বহু বহু শ্বাস-প্রশ্বাস ভয়ানক রকম সজ্ঞানে টেনেছিলাম আর ফেলেছিলাম। তার মানে এ জীবনে অনেকটা সময় আমি বাঁচার মত বেঁচে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। সে সময়টুকুর মধ্যে কতবার সূর্যদেব উদয় হয়েছিলেন, অস্ত গিয়েছিলেন তাও বলতে পারব না। ও কর্মগুলি সূয্যি ঠাকুর যদি করেও থাকেন যথা নিয়মে ঘড়ির কাঁটা ধরে তাহলে তা আমার অজ্ঞাতে করেছেন। এমন স্থানে আমাকে রাখা

হয়েছিল যেখানে সূর্যদেব মাথা গলাতে সাহস করেন নি। তাই আমি দিন রাতের হিসেব রাখতে পারি নি। হিসেব রেখেছিলাম আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের। টানা-ফেলার অন্তিম মুহূর্ত এগিয়ে আসছিল পা টিপে টিপে, আর আমি বসে বসে গুণছিলাম আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। গুণে গুণে হিসেব রাখছিলাম নিজের টি"কে থাকার মেয়াদটুকুর। কারণ, বিচার আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

কারা করলে বিচার, কিসের বিচার করলে তারা, বিচারের প্রয়োজনই বা ছিল কোথায়, সেইটেই আমার কাছে রয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। অন্তহীন অন্ধকারে জ্বলে উঠল দু'টো টর্চ, জ্বলন্ত টর্চ ধরে যারা এগিয়ে এল তারা রইল অন্ধকারে মিলিয়ে। আমার সামনে নামিয়ে দেওয়া হল একটা মাটির কলসীতে এক কলসী জল—আর দু'খানা পাঁউরুটি। তারপর শোনান হল বিচারের রায়। নেপথ্যে—মানে আমার অনুপস্থিতিতে সমাপ্ত হয়ে গেছে আমার বিচার। দেশদ্রোহী আমি, দেশের সর্বনাশ করা আমার পেশা—এই অপরাধে আমায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু দণ্ডটি কর্মে পরিণত হতে একটু দেরী হবে। কারণ এখনও তিনি বাইরে রয়েছেন। তিনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

ফস্ করে মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আমার—"কেন?"

অন্ধকারের অন্তরালে দু'টো কণ্ঠ থেকেই একসঙ্গে ভয়ানক আশ্চর্য হবার সুর বেরিয়ে এল—"কেন কি!"

বুঝতে পারলাম, পাকা গলার আওয়াজ নয়। সাধা গলা কাঁপে না অত সহজে। এরা মারতে এসেছে কিন্তু মরতে শেখে নি এখনও।

তাই হাসি পেয়ে গেল ভয়ানক।

আরও আশ্চর্য হয়ে ওদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে—"হাসছ যে?"

বললাম—"ভাই, হাসা-কাঁদা এ দু'টো কর্ম করার স্বাধীনতা ত' এখনও আমার আছে। তোমাদের দেওয়া দণ্ড পাবার সৌভাগ্য হল আমার, এই জন্যে হাসছি। মানে, তোমরা দেশ উদ্ধার করার ব্রত

নিয়েছ, আমার মত নগণ্য জীবের জন্যে এত মাথা ঘামাচ্ছ, এত কষ্ট করছ, এটা ত' কম কথা নয়।"

বোধ হয় চটে গেল ওরা।

কড়া সুরে বললে—"লজ্জা করে না তোমার? এ ভাবে মরতে লজ্জা করে না?"

গায়ে মাখলাম না চড়া সুর। বললাম—"কিন্তু কি ভাবে যে মরব, তাই যে ছাই এখনও জানতে পারলাম না। তিনি না ফেরা পর্যন্ত তাও হয়ত জানতে পারব না।"

"না, আমরা কেউ তা ঠিক করতে পারব না। তিনি এসে সে হুকুম দেবেন। ততদিন থাক তুমি এইভাবে বেঁচে।"

বললাম—"বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার। অবশ্য এইভাবে রুটি আর জল যদি ঠিক সময় আসে। কিন্তু তিনি কে? যাঁর জন্যে এত বড় কাজটা মুলতুবী রাখতে হচ্ছে।"

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ। ওরা বোধহয় ভাবতে লাগল তাঁর নামটা আমায় বলা উচিত কিনা। শেষে বলেই ফেললে। বিচার করে দেখলে বোধহয়, আমাকে তাঁর নামটা শোনালেও কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। আমি যখন চলেই যাচ্ছি। বললে—অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বললে—"দিদি এসে বলবেন, কি ভাবে তোমায় মারা হবে। দিদি ভিন্ন অন্য কেউ সে হুকুম দিতে পারে না।"

শুনে খুশী হলাম। অপরিসীম নিশ্চিন্তও হলাম। বললাম—"বেশ, বেশ। এতক্ষণে বাঁচা গেল। দিদি যখন নিজে এসে হুকুম দেবেন, তখন মরতে নিশ্চয়ই ভয়ানক কষ্টটা আর হবে না।"

"তার মানে?"—এবার সত্যিই ধমকের মত শোনাল। ভাবল বোধ হয় যে আমি মস্করা করছি ওদের সঙ্গে।

অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে বললাম—"তোমরা অনর্থক রাগ করছ ভাই। সত্যি বলছি, মরতে আমার তেমন ভয় নেই। কিন্তু ঐ গলায় দড়ি-টড়ি দিয়ে যদি টাঙিয়ে রাখা হয়, এই ভাবনায় আমি মরছি। দিদি যখন নিজে হুকুম দেবেন, তখন তাঁর কাছে একটু কান্নাকাটি করলেই হবে।

হাজার হলেও তিনি স্ত্রীলোক। আর কিছু নয়, তাঁর কাছ থেকে এইটুকু ভিক্ষে করব যে হয় বিষ খাইয়ে না হয় আচমকা গুলি করে মারা হোক আমায়। ব্যাস,—এর বেশী আর কিছু নয়!"

শুনে ওরা ধাতস্থ হল। খুন করা আর খুন দেখার আনন্দ উথলে উঠল ওদের গলায়। একজন বললে—"সে গুড়ে বালি, দিদি আমাদের সে দিদি নয় যে চোখের জলে গলে যাবেন।"

আর একজন শেষ করলে কথাটা—"সেবার বেনারসের সেই লোকটাকে সবাই বলেছিল গুলি করে মারতে! দিদি হুকুম দিলেন, হাত পা বেঁধে ব্যাসকাশীর জঙ্গলে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে ফেলে রেখে আসতে। সাতদিন পরে আমরা দেখে এসেছিলাম বড় বড় লাল পিঁপড়েয় ছেঁকে ধরেছে লোকটাকে। খুবলে খুবলে খেয়েছে তার চোখ দু'টো।"

প্রথম জনের গলাটা আবার একটু কেঁপে উঠল।

বললে—"তোমার মত নিমকহারামকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত, তা একমাত্র দিদিই ঠিক করবেন। থাক আর কয়েকটা দিন বেঁচে।"

টর্চ দু'টো নিভে গেল।

বেঁচে রইলাম। একান্ত সজাগ হয়ে রইলাম বেঁচে। বেঁচে রয়েছি তার প্রমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। খুব সাবধানে টান-ফেলা গুণতে গুণতে বেঁচে রইলাম দিদির আসার অপেক্ষায়।

দিদি আসছেন। নিশ্চয়ই আসবেন দিদি। দিদি না এলে আমার উদ্ধার পাওয়া হবে না। দিদি আসছেন চুকিয়ে দিতে, মিটিয়ে দিতে এ জীবনের টানা-ফেলার, নেওয়া-দেওয়ার হিসেবটুকু। উপায় নিয়ে মাথা ঘামাবেন দিদি, যে উপায়ে চট করে নেমে আসবে আরও কালো একখানা পর্দা আমার দুই চোখের ওপর। সে পর্দার ওপারে নিশ্চয়ই এত অন্ধকার নেই। এই কলঙ্কের মত কুৎসিত অন্ধকারের গ্রাস থেকে মুক্তি দিতে আসছেন আমার দিদি। মুক্তিময়ী মৃত্যুরূপা দিদি ঠিকই আসছেন তাঁর হাতের কাজ সামলে। যথা সময়ে ঠিক আসবেনই। আর যাই হোক,

এই অন্ধকার গর্তে আমায় ফেলে রেখে দিদি কখনও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না।

জলও রয়েছে, রুটিও রয়েছে, হাত বাড়ালেই পেতে পারি। সাবধানে খরচ করছি, পাছে ফুরিয়ে যায়। ফুরিয়ে গেলেই সর্বনাশ। ওরা যদি আমার কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে থাকে কাজের চাপে। অসম্ভব নয় ভুলে যাওয়া। দেশের কাজ কি না, দেশটা আবার নেহাত ছোটও নয়। কে বলতে পারে কাজের টানে তারা এতক্ষণে দেশের অন্য প্রান্তে পেঁাছে যায় নি! তাহলেই সেরেছে। ঐ রুটিটুকু আর জলটুকু সম্বল করে বেঁচে থাকতে হবে কতদিন, তাই বা কে জানে! দিদির ফুরসত যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ ত' আমার নিষ্কৃতি নেই।

দিদি আসছেন। এসে পড়লেন বলে। আর লাখ পাঁচেক বার শ্বাস-প্রশ্বাস গোণার মধ্যে ঠিকই এসে পেঁাছবেন। এসেই বলবেন—"ছি ছি ছি ছি ছি, ও-মা, এতক্ষণ তুমি অন্ধকারে একলাটি বসে আছ আমার জন্যে, ছি ছি ছি ছি ছি।"

চমকে উঠলাম। অসম্ভব রকমের একটা ধাক্কা খেলাম ভেতর থেকে। ছি ছি ছি ছি ছি, একি জঘন্য কল্পনা আমার! কি বিশ্রী আশা! কে বলেছে আমার ছুরি বৌদি আসবে! ছুরি বৌদি এসে হুকুম দেবে কি করে মারতে হবে আমাকে! ছুরি বৌদি বেনারসের সেই লোকটাকে পিঁপড়ের মুখে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখতে হুকুম দিয়েছিল! কে বললে আমায় সে কথা? ছুরি বৌদি সম্বন্ধে আর একবার এ রকম জঘন্য কথা বলার সাহস দেখালে আমার সামনে, তৎক্ষণাৎ তার টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব। ছি ছি ছি ছি ছি।

হাঁপাতে লাগলাম উত্তেজনায়। জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়তে লাগল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গুণতে লাগলাম সেগুলো—"এক দুই তিন চার পাঁচ—"

গুণছি, গুণেই চলেছি, সাবধানে গুণে যাচ্ছি। একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও না ফসকায় কোনও মতে। যতক্ষণ বাঁচব, জেনে বাঁচব, সজ্ঞানে বেঁচে থাকব। একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও অপচয় হতে দেব না। শেষ শ্বাসটি ফেলব

যখন, তখনও গোণা থামবে না। নির্ভুল নির্মম হবে আমার গণনা। যারা মারতে আসবে তাদের নির্বিকার চিত্তে শুনিয়ে যাব সেই গণনার ফল। বলব—"বাঁচার মত বাঁচতে যদি চাও, ত' সজ্ঞানে বেঁচে থাক কিছুক্ষণ। খানিকটা সময় নিজের জন্য ব্যয় কর। বেঁচে যে আছ তার প্রমাণ দাও।"

আচ্ছা—শুকতারা কি বেঁচে আছে এখনও! তাকেও কি এইভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে জীইয়ে! মরণকে কি ভাবে ফাঁকি দিতে হয় সে কি তা জানে! হায় রে হায়, কেন এ মতলবটা আগে আমার মাথায় আসে নি! তাহলে তাকেও শিখিয়ে দিতাম, গুণে গুণে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা—একটি শ্বাস-প্রশ্বাসকেও ফসকে যেতে না দেওয়া—হন্যে কুকুরের মত শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখা। এই তিনটি প্রতিজ্ঞা পালন করলে মরণকেও ফাঁকি দেওয়া অতি সহজ। মরণ কখন আসবে, কি রূপ ধরে আসবে, এ চিন্তা করার ফুরসতও নেই। গোণার নেশায় মশগুল থাকলে গোণাই চলবে শুধু। মরণ এসে মরণের কাজ সেরে চলে যাবে, আমি টেরও পাব না।

কিন্তু শুকতারা কি বেঁচে আছে এখনও! শচীন কি এখনও সংবাদ পায় নি যে তার রাণীকে এরা ধরে এনেছে! ব্রজমাধব কি করছেন এখন?

ব্রজমাধব চৌধুরী আর তাঁর গুরুদেব। গুরুদেব বলেছিলেন আমায়—"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক।" সে আশীর্বাদ বিফল হয় নি। মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার মন্ত্র পেয়ে গেছি। গুণছি, একটি একটি করে শ্বাস-প্রশ্বাস গুণছি। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট—

"কে! কে ওখানে?"—প্রায় চীৎকার করে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীরে অতি শান্ত গলায় ঠিক আমার পাশ থেকে কে বললে—"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক তোমার।"

তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল আমার একটা হাত। টান পড়ল হাতে। উঠে দাঁড়ালাম। কানের কাছে আবার শুনতে পেলাম সেই কণ্ঠ—"এস, আমার সঙ্গে।" ভাঙা-চোরা এবড়ো-খেবড়ো সিঁড়িতে বার দু'য়েক উঠলাম সেই হাত ধরে। দেখা গেল একটু আলো। আলো অন্ধকারের প্রাণ, অথবা এও বলা চলে প্রাণই হচ্ছে আলো, অন্ধকার হল মৃত্যু!

সেদিন প্রথম বুঝলাম, তারার কত আলো। বুঝলাম—বাঁচা আর মরার মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য। আলোয় থাকা আর অন্ধকারে থাকার মধ্যে যেটুকু তফাৎ সেইটুকুই মাত্র। এর বেশী আর কিছুই নয়।

তারার আলোয় ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁর পিছু পিছু আরও অনেকক্ষণ চলতে হল। তারপর খোলা মাঠ। ধান ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে চলতে লাগালাম। তখনও গোণা বন্ধ হয় নি আমার, গুণেই চলেছি এক মনে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস। হঠাৎ থামতে হল। যাঁর পিছু-পিছু হাঁটছিলাম তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

গোণা বন্ধ হল। হুঁশ ফিরে পেলাম তখন। তাকালাম তাঁর মুখের দিকে।

"একটা কাজ করতে পারবে বাবা ?"

এ কি সুর! যেন ভিক্ষা চাইছেন। এই মাত্র যিনি আমায় তুলে আনলেন মৃত্যুগহ্বর থেকে তিনি চাইছেন আমার কাছে ভিক্ষা! কথা বেরল না আমার গলা দিয়ে, শুধু তাঁর হাত দু'টি ধরে ফেললাম।

"শোন বাবা, দুরি আমার মেয়ে, আমার নিজের মেয়ে সে। ওকে আর ওর দাদাকে নির্ভয় হবার মন্ত্র দিয়েছিলাম। সে মন্ত্র আমার বিফল হয় নি। ওর দাদাকে তুমি দেখেছ। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। মরবার সময়ও সে ভয় পাবে না। কিন্তু বাবা, দুরি হল মেয়ে। সে মরত, তাঁকে ফাঁসি দিত, সেও ছিল অনেক ভাল। কিন্তু ব্রজমাধব তাকে ধরে সেই পাগলী বৌটার হাতে দিয়েছে। বহরমপুরে দুরিকে নিয়ে সে যে এখন কি করছে বাবা—"

"তাহলে শুকতারাকে এরা ধরে আনে নি!"

"না, তাকে ত' এদের দরকার ছিল না তখন। তুমি তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তাই তারা তোমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"কেন আমি শত্রু হলাম তাদের? কি করেছি আমি? কেন দুরি বৌদি আমায় শত্রু মনে করলেন ?"

"দুরি তোমায় শত্রু মনে করেনি ত'। সে জানেও না তোমায় মারবার ব্যবস্থা হয়েছে। সে বা আমার ছেলে যদি জানত তোমার অবস্থা, তাহলে আগে তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা করত।"

"আপনার ছেলে কে ?"

"তাকে তুমি দেখেছ, বাবা। খিদিরপুরে মুন্সিগঞ্জে প্রথম দিন যাকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, যে তোমাকে ওয়াটগঞ্জ থেকে গাড়ী করে নিয়ে আসে, যে তোমার বন্ধু গোমেশকে ডক থেকে পুঁটুরে নিয়ে যায়।"

"মানে! উনি ছুরি বৌদির স্বামী নন ? মানে, দাদা হলেন ছুরি বৌদিরও দাদা! তাহলে ছুরি বৌদি, বৌদি কেন ? ওঁর স্বামী কে ?"

"তাকেও দেখছ তুমি। যে কাবলীওয়ালা সেজে তোমার পেছনে গিয়েছিল। ভবানীপুরে তার সঙ্গে এক বাড়ীতে একরাত কাটিয়েছ তুমি।"

স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম ব্রজমাধব চৌধুরীর গুরুর মুখের দিকে। তিনি বলে যেতে লাগলেন—"আমার জামাই সে, রক্তের লোভ তার অপরিসীম। অনর্থক অনেক কাজ অনেক সময় সে করে। সে দেশকে ভালবাসে, না, তার খুনের নেশাকে বেশী ভালবাসে, তাই আমি ভাবি অনেক সময়। ছুরি গেল, ছেলেটাও গেল, শুধু শুধু তার খেয়ালের দাম দিতে দু'দুটো মানুষ ম'ল। দেশের তাতে কতটুকু উপকার হল!"

এতক্ষণ পরে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল বৃদ্ধের। ছেলে-মেয়ের জন্যে—না, দেশের জন্যে তা ধরতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"দাদা কোথায় ? কি হল দাদার ?"

ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—"সেও ধরা পড়েছে। বড় একটা কেউ বাকী নেই আর। শুধু ধরা পড়ে নি আমার জামাই। জানতাম আমি সে এই করবে। সকলকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে দেশ ছেড়ে পালাবে। তাই ত' এসেছি বাবা তোমার কাছে। একমাত্র তুমি এখন বাঁচাতে পার আমার মেয়েটাকে। সে মরুক তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু সে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচুক।"

একটুখানি চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার শিষ্য ব্রজমাধবকে বলুন না কেন! তিনি ত' বাঁচাতে পারেন।"

"তা আর সম্ভব নয়। তোমার গায়ে হাত দেওয়ার জন্যে ব্রজমাধব এখন আর কাউকে ছাড়বে না।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর সামনে।

অনেক দূরে ট্রেণের শব্দ পাওয়া গেল। "জিজ্ঞাসা করলাম— ট্রেণের আওয়াজ পাচ্ছি। কোথা দিয়ে চলেছে ঐ গাড়ী!"

"গাড়ী আসছে কলকাতা থেকে, লালগোলা যাবে। এখানে থামবে গাড়ীখানা। পলাশী ষ্টেশন এই বাগানটার ওধারে।

বললাম—"তাহলে বহরমপুরেই ত' যাচ্ছে গাড়ীখানা। আমি যাব এই গাড়ীতে?"

চুপ করে রইলেন তিনি।

বললাম—"আবার কোথায় আপনার দেখা পাব বলুন। ছুরি বৌদিকে আমি আনবই।"

বললেন—"ছুরি তা জানে। আচ্ছা, আর আমি যাব না বাবা তোমার সঙ্গে। এই নাও ধর, কয়েকটা টাকা আছে, সঙ্গে রাখ। এই বাগানটার ওধারেই ষ্টেশন।"

হেঁট হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিলাম। আর একবার তিনি আশীর্বাদ করলেন—"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

পলাশী, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর কোর্ট।

এক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ী পৌঁছল। সেই এক ঘণ্টা আমার জীবনে দীর্ঘতম ঘণ্টা একটি। কিছুতে শেষ হতে চায় না পথ, কিছুতে পার হতে চায় না সময়। মরবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে শ্বাস-প্রশ্বাস গোণা ঢের সহজ। ছুটতে ছুটতে ও কাজটি করা মোটেই সম্ভব নয়।

বহরমপুর ঘোষ ভিলার সামনে যখন নামলাম ঘোড়ার গাড়ী থেকে, তখন ঘুমিয়ে আছে বাড়ীটা। গলি দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ধারে পৌঁছে দেখি, আমার কপালের জোরে ফট্‌কে মালী তখন মাল টেনে ঘাটে বসে নেত্য ঝিয়ের কানে কানে মনের কথা বলছে। বাগানের দরজা, দালানের দরজা সব খোলা পেলাম! বিনা বাধায় উঠে গেলাম দোতলায়। পৌঁছে গেলাম সেই দরজাটার সামনে, যে দরজার ওপিঠে শুকতারার নিজস্ব মহল। পায়ের ওপর দেহটাকে খাড়া রাখা সামর্থে কুলোচ্ছে না তখন।

বসে পড়লাম দরজার গায়ে হেলান দিয়ে। হাল ছেড়ে দিলাম একেবারে। করবারই বা আছে কি আর! দরজা ভাঙা কিছুতেই সম্ভব নয়। হাতে পায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। দাঁড়িয়ে থাকার মত দমও নেই আর। খুলুক দরজা ওরা, তারপর যা হবার হবে। আর কি করতে পারি আমি!

দরজার পেছনে আছে ছুরি বৌদি, আছে শুকতারা। ছ'জনেই আছে। ছ'জনকেই পেয়েছি হাতের মুঠোয়। ভোর হোক রাত, খুলুক ওরা দরজা। তখন দেখা যাবে।

কতক্ষণ সেই ভাবে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ চমকে উঠলাম। খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালাম তৎক্ষণাৎ। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম দালানটার শেষ প্রান্তে। দীর্ঘ সময় মৃত্যুর মত অন্ধকারের ভেতর থাকার দরুণ বোধহয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম। অন্ধকারের মাঝে অন্ধকার ছায়া দেখলাম। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে একটা ছায়া মূর্তি। সরে দাঁড়ালাম—থামের গায়ের সঙ্গে মিশে।

ছায়া মূর্তিটি অত্যন্ত ছোট। সে এসে সন্তর্পণে দরজার গর্তে চাবি ঢোকালে। খিট্ করে সামান্য একটু শব্দ হল। তৎক্ষণাৎ এক লাফে দাঁড়ালাম গিয়ে তার পেছনে। টপ্ করে তুলে নিলাম তার ছোট্ট দেহখানি। এক হাতে চেপে ধরলাম তার মুখ। ভয়ে নয়, ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে। গা দিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলাম ঘরে। ঢুকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ছুটলাম।

আর একটা দরজা পার হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে দেখলাম। যে ধারের দরজাটা খোলা আছে, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাতলা পর্দার ভিতর দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। বিছানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন ছুরি বৌদি। মাত্র একটা সেমিজ পরে আছেন তিনি। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বুক পিঠের ওপর। অদ্ভুত চাউনি তাঁর চোখে। সে চাউনিতে ভয় নেই, বিদ্বেষ নেই, এমন কি রাগ পর্যন্ত নেই। আছে শুধু ঘৃণা, অনাবিল অন্তর্বেদনা আর ক্ষমাহীন ঘৃণা ধিকিধিকি জ্বলছে সেই চোখ ছ'টিতে।

ঠিক তাঁর সামনে আমার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছে শুকতারা। রক্তের মত লাল রঙের একখানা কাপড় পরেছে সে, আঁচলটা জড়িয়েছে

কোমরে। একটা লম্বা বিনুনি ঝুলছে তার পিঠে। সেই বিনুনিটার সঙ্গে মানানসই একখানা কালো চাবুক তার হাতে।

চতুর্দিকে ছবি আর আয়নাগুলো সব ঠিক আছে। ঘরে অন্য কেউ নেই।

হিস হিস করে উঠল শুকতারা—"আজ তৃতীয় রাত। দু'দিন তুমি দেখেছ আমি কি করতে পারি। তাতেও তুমি শায়েস্তা হলে না? এখনও বল সে কোথায়? নয়ত তোমার চামড়া ছাড়িয়ে নেব এই চাবুক দিয়ে।"

খুব শান্ত স্বরে দুরি বৌদি বললেন—"অনেকবার বলেছি, আবার বলছি, সে কোথায় আমি জানি না। জানলে আমি তাকে বাঁচাতে ছুটতাম আগে। সে আমায় বৌদি বলে ডেকেছে। সে আমাকে ছাড়া কাউকে আর জানে না।"

ছপাং করে আওয়াজ হল চাবুকের। দুরি বৌদি একটু কেঁপে উঠলেন। শুকতারা খিলখিল করে হেসে উঠল।

তারপর সে হাঁক দিয়ে উঠল।

"কোথা গেলি তোরা, এধারে আয়। খুলে নে ঐ সেমিজটা।"

দু'পাশের দরজা দিয়ে চারটে ঝি ছুটে এল। তাদের পরণেও অতি সামান্য আবরণ আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা দুরি বৌদির ওপর। ফালা ফালা করে ছিঁড়তে লাগল তাঁর জামাটা।

প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলাম—"শুকতারা।"

ভয়ানক চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল শুকতারা। চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দুরি বৌদির গায়ে।

পর্দা সরিয়ে এক লাফে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম—"শুকতারা, আমি—আমি ফিরে এসেছি।"

দু'হাতে জড়িয়ে ধরলে আমাকে। বুকের ওপর মাথাটা রেখে বললে—"আঃ, ভাই, বাঁচলাম, বাঁচলাম আমি। আমি যে মুখ দেখাতে পারতাম না তোমার বন্ধুর কাছে।"

শুকতারার হাতের বাঁধন ছাড়ালাম জোর করে। দুরি বৌদিকে ছেড়ে দিয়ে ঝি-গুলো একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বোকার মত চেয়েছিল আমার দিকে। বৌদি তাঁর ছেঁড়া জামাটা দিয়ে কোনও রকমে নিজেকে আবৃত

করে হেঁট মুখে বসেছিলেন। একটানে বিছানা থেকে একখানা চাদর তুলে বৌদির গায়ে ফেলে দিলাম। বললাম—"চল বৌদি, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়—চল—ওঠ শিগ্‌গির।"

মুখ তুলে বৌদি বললেন—"কোথায় ভাই?"

"তোমার বাবার কাছে।"

বৌদি অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বললেন—"চল"—হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

হাত ধরে নামিয়ে আনলাম বিছানা থেকে। টেনে নিয়ে চললাম দরজার দিকে।

ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল শুকতারা আমাদের সামনে। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে সে। আকুল কণ্ঠে বললে—"আমায় নিয়ে যাবে না তোমরা? একলা এখানে আমি থাকব কেমন করে?"

ছুরি বৌদি আর এক হাতে জাপটে ধরলেন তাকে। আমরা তিন-জনেই বেরিয়ে এলাম দরজা পার হয়ে। তিনজনে তিনজনকে আঁকড়ে ধরে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। চাকর-বাকর-ঝি-বামুন-দারোয়ান সবাই জেগে উঠেছে তখন। নীচের তলায় সবাই দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। থাকুক—অনেক জোড়া চোখের সামনে দিয়ে আমরা তিনজনে তিন-জনকে ধরে উপস্থিত হলাম বাইরের ঘরে। ভোরের আলো তখন বাইরের ঘরের কাচের জানালার ভেতর দিয়ে তার সাদা হাসি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আকাশের কোণে আকাশের শুকতারা ঢুলছিল হয়ত তখনও—রজনীর আঁখি থেকে তিমিরের স্বপ্ন তখনও হয়ত মোছে নি, ধরণীর বুকে নামবার জন্যে পায়ের নূপুর বাঁধা হয়ত শেষ হয় নি তখনও উষার।

ছুরি বৌদি তখনও ছেড়ে দেন নি মাটির শুকতারাকে, আমি ছাড়ি নি ছুরি বৌদিকে, আর ঘোষ ভিলার বিভীষিকা ছাড়ে নি আমাদের তিনজনকে।

বাইরের ঘরের রাস্তার দিকের দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম আমরা। মুখ তুলে দেখলাম, অনেক দিন পরে দেখলাম আকাশকে।

আকাশ মুখ মুচকে হাসছে আমাদের দিকে চেয়ে। সে হাসিতে কি লুকিয়েছিল আকাশই জানে, চাতুরী ছিল না নিশ্চয়ই, ছিল হয়ত সামান্য একটু পরিহাস। পরিহাস কি! তাও হয়ত নয়, ছিল অনুকম্পা। অনুকম্পাও হয়ত নয়, ছিল ত্রাস। সেই ত্রাসকেই আমি হাসি বলে ভুল করেছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে অকপট ত্রাস ফুটে ওঠে মানুষের মুখে চোখে তাকে আমরা ভক্তির ছটা বা স্বর্গের জ্যোতি বলে ভুল করে থাকি।

ঘোষ ভিলার সামনের রাস্তাটার নাভিঃশ্বাস উঠেছিল কি তখন! অমন ভাবে ধুঁকছিল কেন রাস্তাটা? প্রচণ্ড নেশা করলে যেমন রক্তবর্ণ ঘোলাটে চোখ হয়, তেমনি চোখে চেয়েছিল রাস্তাটা আমাদের পানে। যেন বলতে চাইছিল—নেমো না, কিছুতেই পা দিও না তোমরা আমার বুকে, তোমাদের ভার আমি সহ্য করতে পারব না।

ককিয়ে উঠল সেই মরণাপন্ন পথ, দূরে দেখা গেল জ্বলছে দু'টো চক্ষু। তীরবেগে এগিয়ে আসছে চোখ দু'টো আমাদের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এসে পৌঁছে গেল আমাদের কাছে।

থামল এসে গাড়ীখানা আমাদের তিনজনের বুক ঘেঁষে।

লাফ মেরে নামলেন ব্রজমাধব চৌধুরী। নেমেই দু'হাতে জাপটে ধরলেন আমায়। কানে গেল আর একজনের কণ্ঠস্বর—"ছুরি, বেঁচে আছিস এখনও।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনবার আওয়াজ হল—দুম দুম দুম। মর্মন্তুদ আর্তনাদ করে উঠল কে। ছুরি বৌদি চিৎকার করে উঠলেন—"কে! কে করলে এ কাজ?"

ব্রজমাধব ছেড়ে দিলেন আমায়। পাশে চেয়ে দেখি, ছুরি বৌদি বসে পড়েছেন মাটিতে, আর শুকতারা ঢলে পড়েছে তাঁর বুকের ওপর। ছুরি বৌদির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দাদা, চোখে মুখে তাঁর অনাবিল আতঙ্ক। গাড়ী থেকে নামল শচীন, তার রিভলভারটা তখনও রয়েছে তার হাতে।

আর্তনাদ করে উঠলেন ব্রজমাধব—"কে! কে করলে এ কাজ?"

নির্লিপ্ত কণ্ঠে শচীন বললে—"আমি।"

অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফেটে পড়ল ছুরি বৌদির বুক—"কেন? কেন তুমি মারতে গেলে ওকে? কি করেছিল ও তোমার?"

শান্ত সহজ সুরে শচীন বললে—"কিছুই নয়। আমার কি করবে ও? ওর মরা দরকার ছিল তাই ম'ল।"

ব্রজমাধব ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন? কেন মরা দরকার ছিল রাণী বৌ-এর? কেন?

ধীরে সুস্থে বলে গেল শচীন—"কেন! ওর বেঁচে থাকার প্রয়োজন যে মিটে গেল। আর ও বেঁচে থেকে করবে কি? ওকে দিয়ে আরও কিছু কাজ করাবার মতলব ছিল না কি তোমার?"

ব্রজমাধব ভেঙে পড়লেন একেবারে—"আমি! রাণী বৌকে মারলে তুমি আমার জন্যে!"

'এতটুকু উত্তাপ নেই শচীনের কথায়। যেন গল্প করে চলল ও—

"না চৌধুরী, তা নয়। কেউ দায়ী নয় ওর মরণের জন্যে। আমার অধিকার আছে, আমি ওকে শান্তি দিতে পারি। ওকে বাঁচাতে পারি এই দুনিয়ার অতি জঘন্য খেয়োখেয়ির খপ্পর থেকে। এখানে থেকে ও করবে কি? এখানে থাকতে হলে হয় খাদ্য, নয় খাদক হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। তাই ত' ছিল ও। জঘন্য একটা রোগ ছিল ওর। সেই রোগের সুযোগটুকু তুমি তোমার কাজে লাগাচ্ছিলে। সে প্রয়োজনও যে মিটে গেল। তুমি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাধু হয়ে সাধন-ভজন করতে চলেছ হিমালয়ে। তোমার গুরুপুত্র, গুরুকন্যা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে হয়ত আরও ভাল করে দেশের কাজে নামবেন। আমার বন্ধুটি নিশ্চয়ই আমাদের ছায়া মাড়াবে না এর পর। তারপর ও বেঁচে থেকে করত কি? করত কি ও, ওর ঘৃণিত জীবন নিয়ে?—"

শচীনের কথা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠলাম—"শচীন, ভাই, করলি কি তুই? চিরকালের জন্যে আমার শুকতারাকে নিবিয়ে দিলি?"

ছুরি বৌদি কেঁদে উঠলেন—"কিন্তু ও যে ভাল হয়ে গেল, এবার যে ওকে নিয়ে আমি—"

শচীন হেসে উঠল। বললে—"আবার সেই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—

মানে এবার ওকে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে কাজে লাগাতেন। না, সে সুযোগ আমি দেব না কাউকে। কারও কোনও কাজেই আর ও লাগবে না, এই ব্যবস্থাই করলাম। ওকে মুক্তি দিলাম। দুনিয়া নিজের চালে চলুক, আমার কোন দুঃখ নেই। আমার অধিকার আছে আমার স্ত্রীকে রক্ষা করার। তা-ই আমি করলাম।"

অধিকার।

নিতান্ত নিরীহ একটি কথা। অতি অবুঝ যে সেও বলার দরকার হলে জোর গলায় বলে—নিজের অধিকার রক্ষা করার অধিকার সকলেরই আছে। বদ্ধ বোকাও বোঝে, কোথায় কখন তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। পাগল মনে করে যে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল তুলে রাস্তাময় ছিটানো কর্মটি তার অধিকারভুক্ত। সে অধিকারে বাধা দিতে গেলে সে মারতে তাড়া করে। রাস্তার কুকুরের অধিকার গৃহস্থের দরজা জুড়ে শুয়ে থাকার। তাকে সেখান থেকে ওঠাতে গেলে সে ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ জানায়। যেমন আমাদের সরকারী দপ্তরখানার অধিকার সকলকে অপমানজনক ভাষায় চিঠি লেখার। একান্ত ভদ্র ভাষায় অতি অবনত হয়ে অত্যন্ত জরুরী কোনও কিছুর জন্যে দরখাস্ত করলে, দপ্তরখানার ঘুম ভাঙতে লাগে ছ'মাস। কিন্তু ওখান থেকে যখন চিঠি আসবে তখন তার ভাষা হচ্ছে এই—তোমাকে জানানো যাচ্ছে যে, এ সম্বন্ধে তোমার যা বলবার আছে তা সাত দিনের মধ্যে না বললে তোমার আবেদন আর বিবেচনা করা হবে না।—সবই অধিকারের প্রশ্ন। কারও অধিকার জুতো মারার, কারও অধিকার মুখ বুজে জুতো খাওয়ার। কে কার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

কিন্তু কার কোনখানে কতটুকু অধিকার এ ঠিক করবে কে। মন ঠিক করে, কতদূর কার অধিকারের চৌহদ্দি। সে চৌহদ্দিতে মাথা গলাতে গেলে মাথা ভাঙতে সাধ যায় মনের। তখন মন সঙ্কল্পের দ্বারস্থ হয়। তাই মনের চেয়ে সঙ্কল্প বড়।

ব্রজমাধবের গুরুজী ব্রজমাধবকে শিখিয়েছিলেন—

> **সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্, যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ**
> **মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি, তামু নাম্নীরয়তি, নাম্নি মন্ত্রা**
> **একং ভবন্তি, মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি।**

মনকে আমল দিতেন না কখনও ব্রজমাধব চৌধুরী। সত্যাই তিনি মনে করতেন যে দেশ স্বাধীন করার কাজই করছেন তিনি। স্বাধীনতা ব্যাপারটা সম্বন্ধে এক অত্যাশ্চর্য ধারণা ছিল তাঁর। বলতেন—"ইংরেজের চেয়ে ঢের বড় শত্রু আছে আমাদের। ইংরেজকে তাড়ালে ইংরেজ হয়ত পাত্‌তাড়ি গুটবে একদিন। কিন্তু সেই শত্রুগুলো রয়ে যাবে যে তখনও। তাদের সমূলে নির্মূল করার উপায় কি? কেউ ভাবে সে কথা? ধারণা করতে পারে কেউ—যে দয়া, মায়া, প্রেম, করুণা ইত্যাদি মিষ্টিমিষ্টি মনের বিকারগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে নির্বিচারে ধ্বংস করতে হবে যত আগাছা পরগাছা দেশের। টেবিল চেয়ার দখল করে কাগজ আর দলিলের গাদা বুকে নিয়ে সারা জীবন যে সব কলের পুতুল দেশ জুড়ে বসে আছে, যারা ইংরেজের পোষা রক্ত-শোষা-জোঁক, যাদের রক্তের প্রতিটি কণায় দাসত্বের পোকা গিজগিজ করছে, সেগুলোকে ত' আর ইংরেজ জাহাজ ভরতি করে তুলে নিয়ে যাবে না এ দেশ থেকে। তাদের প্রত্যেকটিকে ধ্বংস করবার জন্যে যে মহাযজ্ঞের আগুন জ্বালাতে হবে, সে আগুন জ্বালাবে কে! কৈ তারা, যারা আত্ম-পর বিবেচনা করবে না, শত্রুকে শত্রু ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, যারা হৃদয়দৌর্বল্যকে দু' পায়ে দলে জাতির মুক্তি যজ্ঞে লক্ষ কোটি বলিদান দেবে অনায়াসে অক্লেশে। তা যদি না হয়, সেই বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবার উপযুক্ত ঋত্বিক যদি না জন্মায় দেশে, তাহলে জেনে রাখ, ইংরেজ চলে যাবার পর দেশটা শ্মশান হয়ে দাঁড়াবে। দেশ জুড়ে নির্লজ্জ হ্যাংলামো আর কুণ্ঠাহীন ছেঁচড়ামোর এমন প্রলয় নাচন সুরু করবে এই ইংরেজের পোষা কুকুর-শেয়ালের পাল, যে ওদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দেশের মানুষ আবার পরাধীনতাই কামনা করবে তখন।"

ব্রজমাধবের সঙ্কল্প ছিল অত্যাচারের আগুনে পুড়িয়ে এমন কতকগুলি

খাঁটি সোনা বানাবার, যারা সংস্কৃতি ঐতিহ্য কৃষ্টি ইত্যাদি ছিঁচকাঁদুনে বুলি আওড়ে নিজেদের ভোলাবে না। যাদের শোনাতে হবে না—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সঙ্কল্প রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। গুরুপুত্র, গুরু-কন্যাকে রেহাই দিতে হয়েছিল ব্রজমাধবকে। বোধহয় সেই হৃদয়-দৌর্বল্যকে জয় করার জন্যেই তিনি স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত এমন কি প্রাণের ভয় পর্যন্ত তুচ্ছ করে সন্ন্যাস নেবার সঙ্কল্প করিলেন। লোটা-কম্বল ঘাড়ে নিয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন, তা কেউ জানল না। সঙ্কল্প করার অধিকার রক্ষা হল তাঁর।

আর সেই বিচিত্র সুরের ছি ছি ছি ছি ছি শোনা গেল না কখনও। হঠাৎ হুরি বৌদির বয়সটা এক লাফে বিশ বছর পার হয়ে গেল। তাঁর দাদা লেগে গেলেন হুনিয়া সুদ্ধ সবাইকে শায়েস্তা করার কাজে। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি, অপ্রয়োজনে আধখানি কথাও মুখ থেকে বার করতেন না। মহাশক্তিসম্পন্ন শত্রুকে পরাস্ত করতে হলে কতদূর পর্যন্ত নিজেকে সব দিক থেকে নির্বিরোধী নির্বিশঙ্ক করে গড়ে তুলতে হয়, তা তিনি জানতেন। পিতার আদর্শ আর শিক্ষাকে সার্থক রূপ দিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনে। ইংরেজ তাঁর শত্রু ছিল না, রাগে অপমানে হিংস্র হয়ে তিনি ইংরেজকে তাড়াতে নামেন নি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের এ দেশ ছেড়ে যাওয়া প্রয়োজন, সুতরাং ইংরেজকে যেতে বাধ্য করতে হবে। তা করবার জন্যে প্রয়োজন হলে জীবন-নেওয়া আর জীবন-দেওয়া এ দু'টো কর্মকেই একান্ত অবহেলায় সুসম্পন্ন করতে হবে, এই ছিল তাঁর ব্রত। তাই তাঁর কাজে-কর্মে, কথায়-বার্তায় উত্তাপ ছিল না একটুও। ছিল বুদ্ধির আলো আর কৌতুক মিশ্রিত রসিকতা। একবার কি কথায় ব্রজমাধব বলেছিলেন, "ইংরেজের অতবড় শত্রু আর কেউ নেই দেশে। কিন্তু ইংরেজ যতটা সম্মানের চক্ষে দেখে ওঁকে তা তারা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকেও দেখে না।" সর্ব অবস্থায় অবিচলিত থাকার—অতি আশ্চর্য শক্তি ছিল তাঁর। সেই শক্তি তিনি

হারালেন। হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন রাগে অপমানে। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন কোথায় তলিয়ে গেল। আসমুদ্র-হিমাচল জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আমি আর হুরি বৌদি ছায়ার মত রইলাম তাঁর দু'পাশে। তাঁর প্রতিটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার অধিকার ছিল আমাদের। সে অধিকার রক্ষা করবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলাম।

ফলে ইংরেজ বললে, "গুলি করে হোক, ফাঁসি দিয়ে হোক, যে কোনও উপায়ে হোক, তোমার দফা রফা করার অধিকার আছে আমার। সে অধিকার আমি বজায় রাখবই।" ফলে একদিন আবিষ্কার করলাম যে হুরি বৌদি, তাঁর দাদা, দেশের স্বাধীনতা, কোনও কিছুই আর সামনে নেই আমার। আছে ইংরেজ অর্থাৎ ইংরেজের মাইনে খাওয়া চাকর-বাকরের দল। তারা আর আমি সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁত বার করে হাসছি আমি তাদের দিকে চেয়ে আর তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে মেতে উঠেছি মরণ খেলায়। মরণ খেলার নেশায় মেতে, কেটে গেল দশ-দশটা বছর। কোথা দিয়ে, কেমন ভাবে, কি করে, তার হিসেব দিতে গেলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব আজ।

দশটা বছর ঘৃণা বিদ্বেষ রেষারেষির প্রচণ্ড উত্তেজনায় মাতাল হয়ে ছুটে বেড়ালাম উল্কাপিণ্ডের মত। কতবার কত হুরি বৌদি, কত শুকতারা, কত ব্রজমাধব কত রূপে এসে ধাক্কা দিয়ে গেল মনের দরজায়। হাসি-কান্নায়, প্রেমে-করুণায় টইটুম্বুর জীবনের মহাপাত্র কতবার এগিয়ে এল ঠোঁটের কাছে। কে খেয়াল রাখে সেদিকে! জ্বরের ঘোরে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় যখন রুগীর, তখন তার মুখের কাছে মহৌষধের পাত্রটা নিয়ে গেলে সে আছাড় মারবেই। যখন বিকার কেটে যায়, জ্বর পড়ে আসে, তখন রুগী জানতে চায় ইতিমধ্যে কতবার সূর্য উদয় হয়েছে, অস্ত গেছে। কতবার আকাশে মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকেছে, আবার কখন সব পরিষ্কার হয়ে আলোয় আলো হয়ে গেছে—জানতে চায় সে, কে কে এসেছিল তার খোঁজ নিতে সেই বিকারের সময়, কে কি বলে গেল, কে কি রেখে গেল তার জন্যে। তারপর বেহুঁশ দিনগুলো যে কতবড় লোকসান তার জীবনে তার হিসেব খতিয়ে দেখে পাশ ফিরে চোখ বুজে শুয়ে।

আচম্বিতে আমিও একদিন হুঁশ ফিরে পেলাম। হুঁশ ফিরে পেলাম দম ফুরিয়ে যাবার পর। তখন দেখি যে আমি নিজেই কবে ফুরিয়ে গেছি। একদম দেউলে হয়ে বসে আছি পথের ধারে। ছুনিয়া একটুও ওলটায় নি, পালটায় নি। কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় নি কোনখানে। সবাই সামনে এগিয়ে চলে গেছে আপন পথে। শুধু আমি নিজের বিষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছি যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিলাম ঠিক সেইখানেই।

"ভয় জয় কর, মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকুক"—এ আশীর্বাদ ষোল আনা সফল হয়েছে আমার জীবনে। ভয় কাকে বলে, তা ভুলেই গেছি। ছল-চাতুরী আর উপস্থিত-বুদ্ধির খেলায় হিমশিম খেয়ে গেছে অপর-পক্ষ। শচীন বলেছিল, "একমাত্র খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনও সম্বন্ধ নেই এই ছুনিয়ায়।" শচীনের সেই মহামূল্য বাণী—ষোল ছু'গুণে বত্রিশ আনা সার্থক হয়েছে আমারই জীবনে। যারা আমায় চেনে, জানে বা যারা শুধু নামটাই শুনেছে আমার, তারা সবাই বেমালুম ভুলে গেছে যে আমি একটা মানুষ। একবাক্যে সবাই মেনে নিয়েছে যে হৃদয় বলতে কোনও বস্তুর বালাই আমার মধ্যে নেই। আমি একটা যন্ত্র মাত্র, আমার মত নির্বিচারে ধ্বংস করার এতবড় যন্ত্র আর একটিও নেই কোথাও। ভয় জয় করতে গিয়ে এই করে বসে আছি যে আমার নাম শুনলেই মানুষে কেঁপে ওঠে। আমার ছায়াকে সকলে ঘৃণা করে। কারও এতটুকু কল্যাণে কস্মিনকালেও আমি লাগব না, আমার সংস্পর্শে আসা আর যমের সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র ফারাক নেই, এই জ্ঞানে সবাই প্রাণপণে এড়িয়ে চলে আমাকে।

সেই সুরু হল শুভ হওয়ার পালা। ষেটেরা পূজোর দিন থেকে 'শুভ হোক, মঙ্গল হোক' বলে যত আশীর্বাদ যত ভাবে বর্ষিত হয়েছে এই মুণ্ডটার ওপর, তার ফল ফলতে আরম্ভ হল তখন থেকে। জড়িয়ে পড়ার দায় এড়াবার জন্যে পালিয়ে বাঁচবার পন্থা খুঁজে মরার আর প্রয়োজনই রইল না জীবনে। বিশ্ব-সংসার ছড়্দাড়্ শব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে মুখের ওপর। পোড়ার মুখ লুকবার জন্যে মুখ নিয়ে পালাতে

হল। সেই থেকে কারও কপালের সঙ্গে এ কপালের ঠোক্কর লাগে নি কখনও। রাগ, হিংসা, দ্বেষ, প্রেম, করুণা, ভালবাসা—সব ক'টা ব্যাধি থেকে মুক্তি পেলাম। বেঁচে থাকার মত বেঁচে থাকতে পেলাম না বলে মরার মত মরলাম তখন।

এবং আজও মরে বেঁচে আছি।

অন্তরীক্ষে কোথায় কে যেন নিশ্চিন্তে বসে কলকাঠি নাড়ছেন। অন্ধকারকে গ্রাস করার জন্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন আলোর দেবতা, মহা-সুষুপ্তিতে নিমগ্না ধরিত্রীর ঘুম ভাঙাবার আয়োজন চলছে নিঃশব্দে। ধীরে ধীরে কাছে সরে আসছে একটি পরম লগ্ন। শুনতে পাচ্ছি তার পা ফেলার শব্দ—ধক্ ধক্ ধক্ ধক্।

ধক্ ধক্ ধক্ ধক্—এক তালে চলেছে শব্দটা। স্তব্ধতার অতল সমুদ্রে যেন এক তালে দাঁড়ের আঘাত পড়ছে। এগিয়ে আসছে, ক্রমাগত এগিয়ে আসছে কে দাঁড় বেয়ে। কান পেতে শুনছি আর গুণছি। গুণতে গুণতে কি রকম যেন গোলমাল হয়ে গেল। হঠাৎ কখন হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে—সেই ধক্ ধক্ শব্দের মধ্যে। মিশে গেছি, একেবারে এক হয়ে গেছি সেই শব্দের সঙ্গে। আমি নেই, আমার আমিত্বটুকু শব্দময় হয়ে গেছে। শব্দটা উঠেছে যেন আমারই বুকের ভেতর থেকে। একটানা সেই ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দটুকু ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই কোথাও। এতবড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু জেগে আছে সেই শব্দ আর তার সঙ্গে জেগে আছে সময়। শব্দটা হল সময়ের হৃৎস্পন্দন। সময়টা শুধু জেগে আছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটি ক্ষণ সময়ের সঙ্গে মিশে। সেই ক্ষণটি আসছে আমারই জন্যে শুধু।

ব্রাহ্মমুহূর্ত!

অন্ধকারকে গ্রাস করার জন্যে অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন আলোর দেবতা। অন্ধকারের অন্তরালে আত্মরক্ষা করে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই আর। তৈরী হলাম।

একবার পিছন ফিরে চাইলাম। বেশ ভাল করে আর একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—রইল না কি কোথাও কিছু বাকি?

না—নেই। সমস্ত চুকে বুকে গেছে। দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ-

সর্ববিধ ঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি। শুধু তাই নয়, নিজের কাছেও ঋণমুক্ত হয়ে পড়েছি কাল থেকে।

"দত্ত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো মানুষেভ্যশ্চ যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যশ্চ মানুষেভ্যস্তু আত্মনঃ॥"

নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করা চাই। কারণ,

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥"

তিন জাতের ঋণ থেকে মুক্তি চাই আগে,তারপর—মোক্ষ ধর্মের সেবা। অতএব যথাবিহিত শ্রাদ্ধাদি সমাপন করে ফেলেছি। এখন আর ভাবনা কি! সেই সঙ্গে আরও দু'টি কর্ম সম্পাদন করতে হয়েছে।

"ওঁ ঐঁ ক্লীঁ হুং"—এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে গলা থেকে পৈতেটি খুলে ঘি মাখিয়ে দু'হাতে ধরে প্রার্থনা করেছি—

"ওঁ ব্রহ্মসূত্র নমস্তেঽস্তু নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে।
নবদেব স্বরূপায় নবগুণযুতায় চ॥
ত্রিশক্তিরূপিণে তুভ্যং নমোনিত্যস্বরূপিণে।
ত্রিধাভূতায় নবভিঃ সূত্রৈস্তুভ্যং নমোনমঃ॥
রক্ষিতবাংশ্চ মাং নিত্যং স্কন্ধদেশে বিরাজিতঃ।
নিরন্তরং ত্বয়া চাহং চালিতো ব্রহ্মবর্ত্মনি॥
সমরাহূয়তে বহ্নৌ সমিদ্ধে মন্ত্রসংস্কৃতে।
ময়ি প্রসন্নো বহ্ন্যাগ্নৌ প্রবিশ ত্বং যথাবিধি॥
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রায় পরং পদমবাপ্নুয়াম্।
গুণাতীত পদং লব্ধা ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াম্॥"

ঘি-মাখানো প্রসন্ন পৈতেটিকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়েছি এই মন্ত্র আওড়ে—

"ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা।"

পৈতেটির যথোচিত সদ্‌গতি করে শিখাটিকেও যথাস্থানে প্রেরণ করেছি। শিখা বলতে কস্মিন্‌কালে কিছুই ছিল না মাথায়। সত্য সত্য সেটির সৃষ্টি হয়েছিল মাথা মোড়াবার ফলে। "ক্লীঁ"—এই মন্ত্র উচ্চারণ

করে এক গুরুভ্রাতা কচ করে সেটি কেটে আমার হাতে দিলেন। তখন সেটিকেও ঘিয়ে জুব্‌ড়ে মন্ত্র পড়লাম—

"ব্রহ্মপুত্রি শিখে ত্বং হি বাণীরূপা সনাতনী।
দীয়তে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোঽস্তু তে॥"

শিখাসূত্র শেষ হলে পর গুরুদেব কানে মহামন্ত্র দান করলেন—

"তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

হে মহাপ্রাজ্ঞ "তত্ত্বমসি।" তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাকে "হংস" ও "সোঽহং" চিন্তা কর। এবং স্বভাবে অর্থাৎ আত্মভাবে বা ব্রহ্মভাবে তদ্‌গত হয়ে সুখে বিচরণ কর।

মহামন্ত্রটি দান করে গুরুই আগে প্রণাম করলেন—

"নমস্তুভ্যং নমোমহ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ
ত্বমেব তদহমেব বিশ্বরূপং নমোঽস্তু তে॥"

তোমায় নমস্কার—আমাকেও নমস্কার, তোমাকে ও আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ, তুমিই পরব্রহ্ম, তোমাকে পুনরায় নমস্কার করি।

তারপর আর কি বলার আছে! করবারই বা আছে কি! না করবার অবশ্য অনেক কিছু রইল। যেমন—

"ধাতু প্রতিগ্রহং নিন্দাম্ অনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।
রেতস্ত্যাগমসূয়াঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জয়েৎ॥"
"সর্বত্র সমদৃষ্টিঃস্যাৎ কীটে দেবে তথা নরে।
সর্বং ব্রহ্মেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সর্বকর্মসু॥"
"সদন্নেবা কদন্নেবা লোষ্ট্রে কাঞ্চনেঽপি বা।
সমবুদ্ধির্ভবেৎ যস্য স সন্ন্যাসী প্রকীর্তিতঃ॥"
"দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ॥"
"শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষালাপবর্জিতঃ।
সর্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসী প্রকীর্তিতঃ॥"
"অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্।
ন যাচেত্ত ভক্ষণার্থী স সন্ন্যাসীতি কীর্তিতঃ।"

এই মহাবাক্য ক'টি আর একবার মনে মনে আওড়ে পিছন ফিরলাম। এখন বিচরণ করতে হবে।

ডাক পড়ল পিছনে—

"তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাবাহো মাং ত্যক্ত্বা ন হি গচ্ছতু।
শিষ্য পরমহংসত্বং তৎসমো নাস্তি ভূতলে॥
ত্বমেব জগতাং বন্ধুস্ত্বমেব সর্ব পুজিতঃ॥
ত্বমেব পরমোহংসস্তিষ্ঠ তিষ্ঠতু মা ব্রজ॥"

এ আবার কি!

আবার পিছু ডাকা কেন? সব যখন শেষ হয়ে গেল তখন নিষ্কৃতি পেতে বাধা কোথায়? ঘুরে দাঁড়ালাম। আদেশ হল—

"ব্রাহ্মমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা কর। একটি রাত আমার কাছে বসে "তত্ত্বমসি" মহামন্ত্র জপ কর। বার বার নিজে নিজেকে শোনাও—

"ন শত্রুর্ন মিত্রং গুরু নৈব শিষ্য।
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।"

রাত শেষ হয়ে আসবে যখন, তখন তোমায় শোনাব শিববাক্য। তুমি কি হলে, কি ভাবে তোমায় চলতে হবে, দেহ রক্ষার জন্যে কি উপায় তোমায় অবলম্বন করতে হবে, সবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সদাশিব বলেছেন। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াটুকুই মাত্র হয়েছে তোমার, কিন্তু এখনও চাবিকাঠিটি হাতে পাও নি। কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই চাবিকাঠিটি দেব তোমার হাতে। সেটি না পেলে সেখানে পৌঁছে ত' দুয়ার খুলতে পারবে না।"

অতএব থামতে হল। এরই নাম নাকি সমাবর্তন। ব্রাহ্মমুহূর্তের অপেক্ষায় বসে রইলাম সারা রাত। আর ধক্ ধক্ ধক্ ধক্ শব্দ শুনলাম নিজের বুকের মধ্যে।

ধীরে ধীরে সমাগত হচ্ছে সেই পরম লগ্নটি। আলোর দেবতা অন্ধকারকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছেন। বাইরে কে সুর তুলেছে—

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং, ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্॥"

আমি মন বুদ্ধি অহঙ্কার কর্ণ জিহ্বা নাসিকা চক্ষু আকাশ ভূমি তেজ

বায়ু নই, আমি চৈতন্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সেই শিব বা ব্রহ্ম।

আমাকে হারিয়ে ফেলেছি তখন আমি, শুনছি এক মহানাদ। সৃষ্টির আদিতে যে নাদের সুরু হয়েছে, সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্তে যে নাদ স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই নাদ শুনছি।

কোথা থেকে উঠেছে সেই নাদ! নিজের ভেতর থেকে নয়ত?

চমকে উঠলাম।

ধীর শান্ত কণ্ঠে কে বলছেন—

"তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেন স্বাত্মা হি প্রতিপাদিতঃ।
নেতি নেতি শ্রুতির্ব্রূয়াদনৃতং পাঞ্চভৌতিকম্॥"

সামনে এসে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরলেন।

"চল, সময় হয়েছে। অন্ধকার আলোর এই মহাসন্ধিক্ষণে তোমায় বলে দেব গুটিকতক সঙ্কেত। তারপর মহাযাত্রা সুরু হবে তোমার জীবনে।"

পিছু পিছু বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। সামনেই গঙ্গা। অবিরাম বক বক করে বকে চলেছে। কি বলছে গঙ্গা! কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে ও!

গঙ্গার ওপারে সেই জগত। যে জগতে প্রবেশ করবার জন্যে আমি নবজন্ম লাভ করলাম।

কিছুই দেখা যায় না। আঁধার, নিকষ কালো অন্ধকার। ঐ অন্ধকারের আবরণে যা লুকিয়ে আছে তার চেয়ে বিশাল, তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, তার চেয়ে রহস্যময়, আর তার চেয়ে সুন্দর কিছুই নেই জগতে।

ওরই মাঝে আমার স্থান। ওর মর্মোদ্‌ঘাটন করতে হবে আমাকে।

শুনতে হবে, বুঝতে হবে, যুগ যুগ ধরে ওর অন্তরের অভ্যন্তরে কি মহাবাণী গুমরে উঠেছে।

অজানা অচেনা মৃত্যুর মত অন্ধকার— সেই রহস্যময় জগতের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। ব্রাহ্মমুহূর্তে চাবিকাঠিটি আমার হাতে তুলে দেবেন যিনি, তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে।

এখন সেই পরম লগ্নটি এলেই হয়!

"গঙ্গা স্পর্শ কর।"

করলাম।

"শোন—বিরজাযজ্ঞ সমাপন করে যে আচার তুমি গ্রহণ করেছ, কলিতে একেই 'অবধূতাচার' বলে। শ্রীসদাশিব বলেছেন ঃ"

"অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।"

হে দেবি, কলিতে অবধূতাশ্রমকেই সন্ন্যাসাশ্রম বলে।

"চতুর্থাশ্রমিনাং মধ্যে অবধূতাশ্রমো মহান্।
তত্রাহং কুলযোগেন মহাদেবত্বমাগতঃ ॥"

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। সন্ন্যাসীদের মধ্যে অবধূতাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। আমি কুলাবধূতরূপে শক্তি সহযোগে সাধনা করিয়াই মহাদেবত্ব লাভ করিয়াছি।

অবধূত কাকে বলে?

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি অবধূতো যথা ভবেৎ।
বীরস্য মূর্ত্তিং জানীয়াৎ সদা তপঃপরায়ণঃ ॥
দণ্ডিনাং মুণ্ডনঞ্চৈ বামাবস্যায়াং করেদ্ যথা।
তথা নৈব প্রকুর্যাত্তু বীরস্য মুণ্ডনং প্রিয়ে ॥"

হে দেবি, অবধূত যেরূপে হয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবধূত আপনাকে সাক্ষাৎ বীরের মূর্তি বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ বীরাচারী হইয়া তপঃপরায়ণ হইবেন। প্রতি অমাবস্যায় দণ্ডীদের মত তাঁহাকে মস্তক মুণ্ডন করিতে হইবে না।

"অসংস্কৃতকেশজালো মুক্তালম্বিতমূর্দ্ধজঃ।
অস্থিমালাবিভূষশ্চ রুদ্রাক্ষান্ বাপি ধারয়েৎ ॥
দিগম্বরো বীরেন্দ্রশ্চ অথবা কৌপিনী ভবেৎ।
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ কুর্যাৎ ভস্মবিভূষণম্।"

অসংস্কৃত অর্থাৎ জটা-জুট এবং মুক্ত দীর্ঘ কেশসমূহ আর অস্থিমালা বা রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবেন। বীরেন্দ্র সম্পূর্ণ নগ্ন থাকিবেন বা মাত্র কৌপীন ধারণ করিবেন। অঙ্গে রক্তচন্দন বা ভস্ম বিলেপন করিবেন।

অবধূত শব্দের "অ" কারে কি বুঝায়?

"আশাপাশবিনির্মুক্ত আদিমধ্যান্তনির্মলঃ।
আনন্দে বর্ত্ততে নিত্যমকারস্তস্য লক্ষণম্।"

আশাপাশবিনির্মুক্ত আদি-মধ্য-অন্ত নির্মল এবং নিত্যানন্দে বর্তমান থাকাকে বুঝায়।

"ব" কারে বুঝায়—

"বাসনা বর্জিতা যেন বক্তব্যং চ নিরাময়ম্।
বর্তমানেষু বর্ত্তেত বকারস্তস্য লক্ষণম্॥"

বাসনাবর্জিত, নিরাময়-বস্তুতে বর্তমান থাকাকে বুঝায়।

"ধূ" কারে বুঝায়—

"ধূলিধূসর গাত্রশ্চ ধূতাচিত্তো নিরাময়ঃ।
ধারণাধ্যাননির্মুক্তো—ধূকারস্তস্য লক্ষণম্॥"

ধূলিধূসরিতগাত্র, ধূতচিত্ত, নিরাময়, এবং ধারণা-ধ্যানের অতীতকে যিনি জানেন তাঁহাকে বুঝায়।

"ত" কারে বুঝায়—

"তত্ত্বচিন্তাযুতা যেন চিন্তাচেষ্টা বিবর্জিতঃ।
তমোঽহঙ্কারনির্মুক্তস্তকারস্তস্য লক্ষণম্॥"

তত্ত্ব চিন্তাকারী, চিন্তা-চেষ্টা-বিবর্জিত তমঃ বা অহঙ্কার বিনির্মুক্তকে বুঝায়।

অবধূত চতুর্বিধ—কৌলাবধূত, শৈবাবধূত, ব্রাহ্মাবধূত, হংসাবধূত।

যিনি সংসারে থাকিয়াও শিবসদৃশ মহাসন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মোন্নতি কার্যে রত থাকেন তিনি কৌলাবধূত।

শৈবাবধূত সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ ও পীঠস্থানে ভ্রমণ করেন। জপ-পূজাদি দ্বারা আত্মোন্নতি কার্যে রত থাকেন। শক্তি লইয়া কুল-সাধনাদিও ইনি করিতে পারেন।

ব্রাহ্মাবধূত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করেন। পূর্ণ-জ্ঞান, বৈরাগ্য-প্রাপ্তি পর্যন্ত গৃহস্থভাবেই দিনাতিপাত করেন। কিন্তু স্বশক্তি ব্যতীত শৈবাধূতের ন্যায় শৈববিবাহকৃত পরশক্তি গ্রহণ করিতে পারেন না।

হংসাবধূত স্ত্রী-সংসর্গ ও ধাতু পরিগ্রহণ করেন না। তিনি বিধি-নিষেধ বিবর্জিত। প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্য সংসারে বিহার করেন।

"হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বা ধাতুপরিগ্রহম্।
প্রারব্ধমশ্নন্ বিহরেৎ নিষেধবিধিবিবর্জিতঃ॥"

শিবস্বরূপ হও তুমি। এই মুহূর্ত থেকে তুমি অবধূত হলে। শেষ কথাগুলি শুনে নাও—

"ত্যজেৎ স্বজাতিচিহ্নানি কর্ম্মাণি গৃহমেধিনাম্।
তুরীয়ো বিচরেৎ ক্ষৌণীং নিঃসঙ্কল্পো নিরুদ্যমঃ॥
সদাত্মভাবসন্তুষ্টঃ শোকমোহবিবর্জিতঃ।
নির্ম্নিকেতস্তিতিক্ষুঃ স্যাৎ নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ॥
নার্পণং ভক্ষ্যপেয়ানাং ন তস্য ধ্যানধারণা।
মুক্তো বিরক্তো নির্দ্বন্দ্বো হংসাচারপরো যতিঃ॥
ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্ণাং কুলযোগিনাম্।
লক্ষণং সবিশেষেণ সাধূনাং মৎস্বরূপিণাম্॥"

অবধূত স্বজাতি-চিহ্ন শিখাসূত্রতিলকাদি পরিত্যাগ করিবেন। তিনি গৃহস্থ-কর্ম করিবেন না। সঙ্কল্পশূন্য ও শরীর-পোষণার্থ উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। সর্বদা আত্মভাবে সন্তুষ্ট থাকিবেন। কখনও শোক ও মোহে অভিভূত হইবেন না। তাঁহার কোনও রূপ নির্দিষ্ট আসন বা মঠাদি-স্থান থাকিবে না। সদা ক্ষমাশীল, নিঃশঙ্ক ও নিরুপদ্রব হইবেন। তিনি ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করিবেন না। তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই। এই হংসাচারপরায়ণ যতিমুক্ত বিরাগযুক্ত ও শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইবেন। দেবি, তোমাকে চতুর্বিধ পূর্ণ কুলযোগীর লক্ষণ বিশেষরূপে বলিলাম। এঁরা আমার স্বরূপ।

"ঐ শিবভূমি। দেবাদিদেবের প্রিয় আবাসস্থল। সর্বপ্রথম তিন বৎসর তুমি ঐ শিবভূমি আশ্রয় করে থাক। তিন বৎসর ঐ ভূমিতে তিনটি ব্রত গ্রহণ করে যদি বাস করতে পার, তাহলে তোমার শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ছয় প্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে। সেই ব্রত তিনটি হচ্ছে মৌনব্রত, অজগর ব্রত আর পক্ষীব্রত।

কখনও কোনও কারণে কাকেও ইঙ্গিত করবে না।

অজগর সাপ কখনও খাদ্যের জন্যে চেষ্টা করে না।

পাখীরা পরদিনের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে না।

এই তিনটি কথা মনে রেখ। এখন তোমার কোনও সঙ্কল্প বিকল্প নেই, তবু আজ তোমায় গঙ্গা স্পর্শ করে তিন বছরের জন্যে তিনটি সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে। তারপর শিবভূমির মধ্যে তুমি যাত্রা করবে। তিন বৎসর পরে যখন ফিরে আসবে আবার লোকালয়ে তখন বুঝতে পারবে —কেন তোমায় এই তিনটি ব্রতের সঙ্কল্প গ্রহণ করালাম আজ।"

গঙ্গাজল হাতে নিয়ে সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

তিনি বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁর শেষ বাক্য ক'টি বুকের মধ্যে গুমরে উঠতে লাগল ঃ

"সংকল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ
শত্রুণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায়চ।
অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

॥ সমাপ্ত ॥